হাসপাতাল

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : অজিত গুপ্ত
মুদ্রণ : কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ হইতে
এস, এন, রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০৯ হইতে পি, কে, পাল কর্তৃক মুদ্রিত

ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

এই পুস্তকের রচনাকাল :
৮ই বৈশাখ, ১৩৬১ হইতে ১৮ই ভাদ্র, ১৩৬২

এই পুস্তকবর্ণিত কোন ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে যেমন কোন বাস্তব ঘটনার কিংবা কোন জীবিত বা মৃত নরনারীর সম্পর্ক নেই, তেমনি ঘটনাপ্রসঙ্গে যেসব জায়গা বা প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা করা হয়েছে তাদেরও বাস্তবের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই।

লেখক

॥ নীলস্বপ্ন ॥

হা৷ গেটটা চব্বিশ ঘণ্টা রাত্রি দিন খোলাই আছে।

শু .সই খোলা পথ ধরে চলেছে দিবারাত্র আনাগোনা। মানুষের আর
'ভে র যানবাহনের, ট্যাক্সী, প্রাইভেট কার, এ্যাম্বুলেন্স, রিক্শা ও চলমান
একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। গেটের মুখোমুখি যে চওড়া মেটাল বাঁধানো
যার দুদিকে পথচারীর জন্য ফুটপাত ও মধ্যখান দিয়ে সরল রেখায়
জোড়া ইস্পাতের চকচকে ট্রাম লাইন, সেই রাস্তাটাও যখন গভীর রাত্রে
সময় নিঃসাড় হয়ে আসে, কদাচিৎ কখনও দু-একটি ক্লান্ত পথিকের পদশব্দ বা
দ্রুত ধাবমান দু-একটা সওয়ারীহীন ট্যাক্সীর চাকা ও ইন্‌জিনের শব্দ মাত্র ও
ক্লান্তগতি রিক্শার টুং-টাং ধ্বনি ক্ষণিকের শব্দতরঙ্গ তুলে যায়, তখনও গেটের
পাল্লা দুটো থাকে খোলা। কেবল ঐ সময় গেটের মাথার আলোটা একচক্ষু মেলে
যেন কার প্রতীক্ষায় জাগে।

গেটের ওপাশে প্রকাণ্ড পাঁচতলা মোটা মোটা থামওয়ালা সাদা রংয়ের
বাড়িটা, কক্ষে কক্ষে তার আলো জ্বলে। রাত্রির দীর্ঘ মন্থর প্রহরগুলো গড়িয়ে
চলে। দিনের পর দিন যায়। রাত্রির পর রাত্রি আসে। বিরামহীন প্রহরের
পর প্রহরের আনাগোনা।

এমনি এক কালপুরুষ স্বাক্ষরিত রাত্রি।

সুপ্তিমগ্ন সেই নিষুতি রাত্রির নাড়ীতে নাড়ীতে যেন একটা জীবনের স্পন্দন
ছড়িয়ে গেল। প্রথম উপস্থিতির প্রথমোচ্চারিত ধ্বনি। সৃষ্টিবিস্ময়ের এক সঙ্গীতময়
প্রকাশ। ছড়িয়ে গেল সেই ধ্বনিতরঙ্গ ইথারের বুকে কম্পন জাগিয়ে ঐ সাদা
বিরাট বাড়িটারই কোন এক কক্ষ হতে বাইরের তন্দ্রাবিজড়িত আলো-আঁধা
স্তব্ধতার সমুদ্রে ঢেউ তুলে তুলে। প্রথম উপস্থিতির বাঙ্ময় প্রকাশ। ভঙ্গীতে

হাসপাতালের লেবার রুম: প্রসূতি আগার। ফেলছিল।

ধাত্রীবিদ্যায় বিশারদ ডাঃ চৌধুরীর ফার্স্ট অ্যাসিসটেন্ট ধাটাই তার মনের
ক্লেদাক্ত, রক্তপিচ্ছিল সদ্যোজাত শিশুটিকে পার্শ্বেই দণ্ডায়মান

রবার পূর্বে এগিয়ে এলো টেবিলের ওপরে শায়িত পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে
দুকণ্ঠে বললে, দেখুন তো কি সুন্দর বাচ্চা! সেই বারীন বীণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার

উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স্কা তরুণী মা।

ক্লান্ত বিষণ্ণ অশ্রু-ছলোছলো চোখে বায়েকের জন্ত ডাঃ শর্বরীর হা
নিজের গর্ভ হতে সদ্যোজাত সন্তানটির দিকে তাকালো এবং পরক্ষণেই
পাতা দুটো বুজে এলো বুঝি। নিমীলিত আঁখির কোণ বেয়ে নেমে এলো
দুটি ফোঁটা অশ্রুর ধারা।

এখন তো বুঝতে পারছেন কত বড় অন্যায় করতে চলেছিলেন আপনি।
নিজেকেই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এই নিরপরাধ নিষ্পাপ শিশুটিকে পর্যন্ত হত্যা কর
উদ্যত হয়েছিলেন—

কিন্তু কোন জবাব দেয় না অশ্রুমতী জননী।

হায় রে! কেমন করে জানাবে শর্বরী কি মর্মান্তিক বেদনায় মা হয়ে, গ
সন্তান নিয়ে গঙ্গার জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে চলেছিল সুজাতা।

বিধবার মাতৃত্ব! কোন মূল্যই যে নেই। নেই যে কোন গৌরব ও সম্মান
তোমাদের সমাজে! কলঙ্কধুলায় লুন্ঠিত অপমানিত হওয়ার চাইতে তাই যে সে
মৃত্যুকেই আশ্রয় করে মুক্ত পেতে চেয়েছিল!

কোথায় আছেন আজকের দিনে এমন মহর্ষি, যিনি দেবেন সমস্ত বুক পেতে
অভাগিনী জবালার সন্তানকে। তাই তো সুজাতা গঙ্গার জলে খুঁজতে গিয়েছিল
শান্তি। কিন্তু ধরা পড়ে গেল পুলিসের হাতে। নার্সের হাতে সদ্যোজাত
শিশুটিকে তুলে দিয়ে শর্বরী আবার প্রসূতির পরিচর্যায় মন দিল।

কিন্তু তার নিজের শরীরটাও আজ বড় ক্লান্ত, বড় অবসন্ন মনে হচ্ছে। গত
দুই তিন মাস ধরেই শর্বরী লক্ষ্য করছে অল্পেতেই সে যেন কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে।
সকালে শয্যা ছেড়ে উঠতেই তো ইচ্ছে করে না। মাথাটা ঘোরে, বমি বমি
একটা ভাব। সর্বদা কেমন একটা ঘুম-ঘুম শৈথিল্য দেহের সমস্ত পেশীতে
পেশীতে, কোষে কোষে।

অবর্ণনীয় এক ক্লান্তি!

না। কাল সকালেই ডাঃ চৌধুরীকে বলতে হবে তাকে পরীক্ষা করে
'ব দেখবার জন্ত। কিন্তু কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবে ডাঃ চৌধুরীর সামনে।
খর অন্তর্ভেদী দু চোখের দৃষ্টি। না, না—দাঁড়াতেই হবে। পরক্ষণেই
অন্তু এই সংশয়ের পীড়নের চাইতে নিষ্ঠুর সত্যের—যদি তাই হয়
ভঙ্কাল। বুঝতে যে একেবারেই শর্বরী পারছে না তা নয়।
বর্ণনা করা থাক।) সে নিশ্চিন্ত হোক।
যোগাযোগ নেই। কে যেতে পাঠিয়ে দিয়ে অন্ধকারে তিনতলা
প দাঁড়াল শর্বরী।

রাত্রিশেষের ঝিরঝিরে হাওয়া কপালের দুপাশে বিস্রস্ত চূর্ণ ঘর্মসিক্ত কুন্তলগুলিকে একটা শীতল স্পর্শ দিয়ে গেল। মাথার খোঁপাটা খুলে গিয়ে কাঁধের উপরে ভেঙে পড়েছিল, অলস দুই হাতে সেটা বাঁধবারও ইচ্ছা হয় না আর শর্বরীর।

সামনের ঐ আলো-ছায়া-ভরা মাঠটা। জলজল করে মাথার উপরে জলছে রাতের আকাশ-প্রহরী কালপুরুষ এখনো। আর নিচে, শেষ রাতের শিশির-বিন্দুগুলো নিঃশব্দে ঝরে ঝরে পড়ছে যেন স্তব্ধ রাতের চোখের জল মাঠের বুকে ঘাসের শীর্ষে শীর্ষে।

অন্ধকারে স্তূপ বেঁধে আছে দোতলা, তিনতলা, চারতলা, পাঁচতলা চারপাশের বাড়িগুলো। সার্জিক্যাল অপারেশন থিয়েটারের কাচের জানালাপথে দেখা যাচ্ছে আলোর আভাস। বোধ হয় কোন ইমারজেন্সী অপারেশন চলেছে।

একটা সাদা এ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল 'জি' ওয়ার্ডের গেটের সামনে। আবার বোধ হয় একটা লেবার কেস এলো। আসা-যাওয়ার কি বিরাম আছে।

ফাল্গুনের প্রথম এখনো, কিন্তু শীতের ভাবটা যেন এখনো যাই যাই করেও যায়নি। যাবার আগে আলতো একটা মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা আমেজ যেন।

দাইয়ের কণ্ঠস্বরে চমকে ফিরে তাকায় শর্বরী, সিস্টার দিদিমণি ডাকছেন, চা হয়ে গিয়েছে।

তাহলে তার সন্দেহ মিথ্যে নয়।

ডাঃ চৌধুরীর চেম্বারের সুইংডোরটা ঠেলে করিডোরে বের হয়ে আসতে আসতে আবার যেন কথাটা নতুন করে মনের মধ্যে এসে মাথা তুলে দাঁড়াল।

ডাঃ চৌধুরী পরীক্ষান্তে তাকে কি বললেন সেটা যে শর্বরীর একেবারে ধারণাতীত ছিল তাও তো নয়, তবু কথাটা শোনা মাত্রই সে মুহূর্তের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল কেন?

অপ্রত্যাশিতও তো নয়। তবে!

তবে কি তার এতকালের চেনা পরিচিত সমাজের সংস্কারটাই সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে বিচলিত—মুহূর্তের জন্য বিহ্বল করে ফেলছিল।

না ঠিক তা নয়। অনেকদিন আগেকার এক বান্ধবীর কথাটাই তার মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল।

বিবাহের আগে বীণাকেও ঠিক এমনি পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। এবং শুধু তাই নয়, সেদিন অনায়াসেই বারীন বীণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে দূরে সরে গিয়েছিল।

সেদিনকার বীণার কথাগুলো আজও তার মনে আছে। বীণা বলেছিল, বারীন আমাকে অস্বীকার করলো! কিন্তু কেমন করে করলো বলতে পারিস? বোধ হয় পুরুষ বলেই পারলো!

বীণা আত্মহত্যা করেনি বটে তবে তার খোঁজ আজ পর্যন্ত সে আর পায়নি। বীণা হারিয়ে গেল।

কিন্তু শৈবাল! শৈবালও কি সেই কাপুরুষ বারীনের মতই দূরে সরে দাঁড়াবে!

পরক্ষণেই মনে হয়, না, না—শৈবাল, শৈবাল তা পারবে না। কিন্তু তবু শর্বরীর মন থেকে ভয় যেন যায় না। অকারণেই চোখের কোণ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। ধীরে ধীরে লিফট্ দিয়ে নিচে নেমে গেটের দিকে এগিয়ে চললো শর্বরী।

বেলা তখন দশটা বেজে গেছে।

শর্বরী যখন মস্তবড় পাল্লাওয়ালা লোহার গেটটা দিয়ে বের হয়ে এলো, সমস্ত মুখখানি ব্যেপে যেন তখন তার সর্বস্ব-হারানোর মর্মান্তিক বেদনা ফুটে উঠেছে। তার পরিচিত জনেরা তাকে সেই মুহূর্তে দেখলে নিশ্চয়ই চমকে উঠতো।

গত সাত বছর ধরে ঐ বিরাট পাল্লাওয়ালা লোহার গেটের ভিতর দিয়ে দিনেরাত্রে দুপুরে-সন্ধ্যায় কতবার কত অসংখ্যবার যে ও যাতায়াত করেছে তা কি ওরই মনে আছে। কিন্তু আজ কেন মনে হচ্ছে এই বুঝি এ জীবনে শেষ-বারের মতই অতিক্রম করে এলো চিরপরিচিত ঐ গেটটা। কেন, কেন এরকম মনে হচ্ছে! কেন এ ভয়, কেন এ চাঞ্চল্য!

পরিচিত ঐ গেটটা দিয়ে এই যেন তার শেষ যাত্রা অন্য কোথাও এই পরিচিত হাসপাতালটার বাইরে। এক আধ দিনের নয়, দীর্ঘ সাত বছরের পরিচয়। ঐ গেট হতে শুরু করে গেটের ওপারে যা কিছু দিনের পর দিন ধরে তার সঙ্গে ওর পরিচয় ঘটেছে। জড়িয়ে গিয়েছে ওর দেহ ও মনের সঙ্গে অপূর্ব এক অনুভূতিতে। চারিদিকে প্রাচীর, কোথাও ইটের গাঁথনি, কোথাও লোহার মোটা মোটা শিকের, আর তার মধ্যে দোতলা, তিনতলা, চারতলা, পাঁচতলা সব সাদা ও লাল রংয়ের নানা আকারের বাড়িগুলো এখানে ওখানে ছড়ানো—সব। সব—ও চেনে।

কোনটা তার ইমারজেন্সী, কোনটা সার্জিকেল, কোনটা মেডিকেল, কোনটা ইনফেকসাস, কোনটা পিডিয়াট্রিক, কোনটা অর্থোপেডিক, কোনটা ই. এন. টি কোনটা স্কিন, কোনটা গাইনোকোলজিক্যাল ওয়ার্ড। আউটডোর ইনডোর তার মধ্যেই অপারেশন থিয়েটার, এক্সরে রুম, ডিসপেনসিং রুম, ব্লাডব্যাংক

প্যাথলজিক্যাল ল্যাবোরেটরী ও লেবার রুম। আরো আছে, লেকচার থিয়েটার, অফিস, ছাত্রছাত্রীদের কমন রুম, স্টুডেণ্ট ইউনিয়ন অফিস, মিউজিয়াম, এ্যানাট'ম হল ও লাইব্রেরী।

দীর্ঘ সাত বছর ধরে যেন নাড়ীর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে শর্বরীর সব কিছু—ঐ চারিদিকে ছড়ানো বাড়িগুলোর প্রত্যেকটির পরিচয়।

মাথার উপরে শীতের রৌদ্র যেন অগ্নিকণা ছড়াচ্ছে নিঃশব্দে।

গেট পার হলেই সামনে বড রাস্তা। ট্রাম, বাস, ঘোড়ার গাড়ি, রিক্শা, প্রাইভেট কার ও পায়ে-হাঁটা মানুষের একটা চলমান স্রোত।

গেটের পাশেই টুকরিতে ফল সাজিয়ে বসে আছে ফুটপাতের উপরে সেই ফেরিওয়ালা দুজন, তার মধ্যে একজন হিন্দুস্থানী বুড়ো ও দাড়িওয়ালা বিহারী মুসলমানটি। একটা এ্যাম্বুলেন্স শর্বরীর পাশ কাটিয়ে চলে গেল গেটের ভিতর দিয়ে।

হঠাৎ কি হলো শর্বরীর। যেন সে উদ্গত অশ্রুকে আর রোধ করতে পারে না। তপ্ত গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। বাঁ হাতে মুঠোকরা স্টেথোটা ঘামে ভিজে উঠেছে। বোকার মত কেবলই কান্না আসছে কেন ও বুঝতেই যেন পারে না।

উত্তরমুখী ট্রামগুলোতে এখন আর ততটা ভিড় নেই, কারণ সকলেরই গতিপথ এখনো দক্ষিণমুখো। অফিসমুখো। ডালহাউসী, এস্প্লানেড।

ঢং ঢং করে একটা ট্রাম স্টপেজে এসে দাঁড়াল। উঠে পড়ল শর্বরী ট্রামটায়। ফার্স্ট ক্লাসে মাত্র গোটাদশেক যাত্রী। আর সব ফাঁকা, খালি।

সামনে যে খালি সীট্টা পেল তাতেই বসে পড়ল শর্বরী।

প্রফেসার চৌধুরীর কথাগুলো এখনও যেন গরম সীসের মত পুড়িয়ে দিচ্ছে তার কানের পর্দা দুটো। অবশ্য নিজেও যে শর্বরী টের পায়নি তা নয়। সে নিজেও তো একজন ডাক্তার। সে কি জানত না প্রফেসারের কাছ হতে তাকে কি শুনতে হবে!

ধীরে ধীরে থেমে থেমে কথা বলেন প্রফেসার চৌধুরী! কথা বলবার সময় চোখের পাতা দুটো যেন আপনা হতেই বুজে যায়, উপরের পুরু ঠোঁটটা একটু উল্টে যায়। চকচকে সাদা সুগঠিত দাঁতগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ডাঃ চৌধুরীর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রী শর্বরী এবং তাঁরই সিনিয়ার হাউস ফিজিসিয়ান সে বর্তমানে, বলতে গেলে ফার্স্ট এ্যাসিস্টেণ্ট্। অগাধ স্নেহ ও যত্নে নিজে হাতে ধরে ধরে কাজ শিখাচ্ছিলেন ডাঃ চৌধুরী শর্বরীকে। মনে

পড়ছে তাঁর কথাগুলো।

কথাগুলো বলবার মধ্যেও যেন একটা নিয়মানুবর্তিতা, একটা সংযত গাম্ভীর্য আছে : এই ডাক্তারী শাস্ত্রের মধ্যে একটা অভিনব রস আছে শর্বরী। যেটাকে উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন বিশেষ এক অনুভূতির, বিশেষ এক সাধনার। সে সাধনায় যদি এতটুকু ফাঁকি দাও তবে তুমি নিজেই ফাঁকিতে পড়বে। তোমার সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত সত্তা, সমস্ত বোধশক্তিকে এর মধ্যে একান্ত কেন্দ্রীভূত করতে যদি পারো তবেই জেনো আসবে সত্যিকারের উপলব্ধি, চিকিৎসা-শাস্ত্রে সত্যিকারের জ্ঞান।

আরো মনে পড়ে প্রথম যেদিন এম. বি ডিগ্রী পেয়ে শর্বরী ডাঃ চৌধুরীকে প্রণাম জানাতে গিয়েছিল, ডাঃ চৌধুরী তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন অত্যন্ত ধীরে ধীরে : মনে রেখো শর্বরী। যে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নিজেকে নিযুক্ত করেছো, এই ডিগ্রীটা তার ছাড়পত্র মাত্র। তোমার সত্যিকারের সাধনা হবে এইবারে শুরু। মনে রেখো, এই ডিগ্রীলাভ ও অর্থ উপার্জনটাই এর শেষ কথা নয়। তুমি একজন ডাক্তার। মানুষের সমাজে এক বিশেষ সত্তা আছে তোমার। সেই সত্তার গায়ে যেন কোনদিন এতটুকু কালি না লাগে।

তারপর তাঁর দৈনন্দিন সাহচর্য, কত টুকরো টুকরো কথা, টুকরো টুকরো সহানুভূতি, টুকরো টুকরো কৌতুক, টুকরো টুকরো উপদেশ। পাস করবার পর ছায়ার মতই ঘুরেছে শর্বরী ডাঃ চৌধুরীর পিছনে পিছনে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ; অপারেশন থিয়েটারে, লেবার রুমে, ইন্‌ডোরে, আউটডোরে, রোগীদের শয্যার পাশে পাশে তাঁর কাজের মধ্যে, তাঁর বিশ্রামের মধ্যে, ঘুরেছে দিনের পর দিন কত নিদ্রাহীন রাতে।

প্রখর সূর্যালোকে চারিদিক যেন অত্যন্ত স্পষ্ট—সজীব।

দোকানে দোকানে চলেছে বেচাকেনা। বহু লোকের মিশ্রিত কণ্ঠস্বর একটা গুঞ্জন তুলে চলেছে। একটানা একটা শব্দতরঙ্গ ইথারের বুকে কম্পন জাগিয়ে চলেছে। ট্রামটা ঘর-র ঘর-র শব্দে যেন চিকিয়ে চিকিয়ে চলছে। এতক্ষণে মাত্র শ্রীমানী মার্কেট।

প্রফেসার চৌধুরীর ঘরের স্যুইং ডোরটা ঠেলে যখন শর্বরী বাইরে এসে দাঁড়াল, শৈবালকে আশেপাশে কোথাও দেখতে পেল না।

শেষের দিকে ডাঃ চৌধরী তাকে আর কোন কথাই বলেননি. কেবল

তাকিয়েছিলেন নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে। চশমার পুরু লেন্সের ওধার থেকে বড় বড় চোখের তারা দুটো শুধু ওর মুখের দিকে নিবদ্ধ ছিল।

মাথার রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলো, প্রশস্ত ছড়ানো কপাল, চাপা নাসিকা, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ। বয়েসের অনুপাতে একমাত্র রগের দুপাশের পাকা কেশগুলো ছাড়া সমস্ত শরীরের মধ্যে কোথাও যেন এতটুকু চিহ্নও নেই বার্ধক্যের, প্রৌঢ়ত্বের, ডাঃ চৌধুরীর।

পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি মাত্র লম্বায় মানুষটা এবং রোগাটে গড়ন। কিন্তু ঐ পাঁচ ফুট রোগা দেহের সামর্থ্যের কথা ভাবলে শর্বরীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধার যেন অবধি থাকে না।

কালো আবলুস কাঠের মত রোগা বেঁটে মানুষটিকে দেখলে চট্ করে নজরে পড়বার মত আদপেই নয়। তাছাড়া লোকটা মিশুকেও নয় এবং কথাবার্তাও অত্যন্ত কম বলেন। ছাত্রছাত্রী বা সহকর্মীরা কখনো লোকটাকে অলস ভাবে বসে থাকতে দেখেনি। রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা ছাড়া যেটুকু সময় হাতে পান, হয় কোন মেডিকেল জার্নাল, না হয় কোন মোটা ডাক্তারী বই নিয়ে থাকেন ব্যস্ত।

এগার বছর হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত লোকটি কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায় কারুর সঙ্গেই তাঁর দেখা যায়নি। একক নিঃসঙ্গ। আত্ম সমাহিত।

ছাত্ররা তো নয়ই, সহকর্মীরাও বড় একটা কাছে ঘেঁষে না।

এমনি লোকের সঙ্গে শর্বরী যে কেমন করে একটু একটু করে করে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তার নিজেরই আজ সে কথা স্পষ্ট করে আর মনে পড়ে না।

ফিফথ্ ইয়ারে 'জি' ওয়ার্ডে প্রথম দিনে বেডসাইড্ ক্লিনিকস্। শর্বরী মিডওয়াইফারীর ক্লাস-এ্যাসিস্টেন্ট নির্বাচিত হয়েছে পরীক্ষায় সর্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পেয়ে। অফিস নোটিশ বোর্ডে সবেমাত্র আগের দিন তার নামটা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রিন্সিপ্যালের স্বাক্ষরিত হয়ে একটা নোটিশে।

ছাত্র-ছাত্রীরা তিনতলায় 'জি' ওয়ার্ডের লিফ্টের সামনে ভিড় করে জটলা করছে। লিফ্ট থেকে বের হয়ে এলেন ডাঃ চৌধুরী। পরিধানে ক্রিজহীন মব কালারের স্যুট, নেভিব্লু টাই।

মৃদু কণ্ঠের সেই প্রথম সম্ভাষণ, You all belong to the 5th year class?

সমবেত কণ্ঠে জবাব উচ্চারিত হলো, ইয়েস্ স্যার।

ডাঃ চৌধুরী দ্বিতীয়বার আর বাক্যব্যয় না করে ধীর মন্থর পদবিক্ষেপে ওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে চললেন। ছাত্র-ছাত্রীরা পিছু পিছু চলল।

২৩নং বেড।

সাত মাসের প্রেগ্‌নেনসি—সেই সঙ্গে এ্যানিমিয়া ও জেনারেল এ্যানাসারকা। সাধারণ এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের বাঙালী বৌ। গত আট বছরে পর পর চারটি সন্তানের জন্ম দিয়ে আবার সন্তান ধারণ। এ দেশের মেয়েদের গতানুগতিক স্ত্রীধর্ম পালন ও জবরদস্তি মাতৃত্বের স্বীকৃতি। ব্যক্তিত্বহীন নিরুপায় স্বামী-আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা।

ডাঃ চৌধুরী চলতে চলতে হঠাৎ সেই ২৩নং বেডের সামনেই এসে দাঁড়ালেন, কেমন আছেন? রোগিণীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন।

মৃদু শান্ত কণ্ঠে রোগিণী জবাব দেয়, ভাল।

ঈষৎ বঙ্কিম একটা হাসির রেখা নিঃশব্দে ডাক্তারের ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে ওঠে। তারপরই আশেপাশে দণ্ডায়মান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিঃশব্দে একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন: কে শর্বরী রায়।

আমি স্যার! এগিয়ে সামনাসামনি গিয়ে প্রফেসারের কাছে দাঁড়াতে সাহস হয়নি, ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেই খুব ধীরে কথাটা উচ্চারণ করেই চোখটা নামিয়ে নিয়েছিল শর্বরী। মনে আছে। আজও স্পষ্ট মনে আছে ডাঃ চৌধুরীর সেদিনকার নিঃশব্দ সপ্রশংস দৃষ্টি।

সে ও বিনতা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। বিনতা ওর গায়ে সকলের অজ্ঞাতে একটা আঙুল দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিয়েছিল। ডাঃ চৌধুরীর দৃষ্টি কিন্তু ততক্ষণে অন্য মুখের ওপর গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছে।

এই পেসেন্টের হিস্ট্রী নিয়ে বল কি করবে! You! You Mr. tall gentleman behind!

সকলেই প্রথমটায় ভেবেছিল প্রশ্নটা বুঝি ডাঃ চৌধুরী শর্বরীকেই করেছেন, তাই সকলে তার দিকেই তাকিয়েছিল, কিন্তু প্রফেসারের পরবর্তী কথায় সকলে আবার প্রফেসারের মুখের দিক থেকে ফিরে তাকাল শৈবালের দিকে।

সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লম্বা শৈবালই। শর্বরীর পাশ ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে ছিল। শৈবাল যে শুধু লম্বা, তাই নয়। দেহসৌষ্ঠবও তার অতুলনীয়। টকটকে গোরাদের মত গায়ের বর্ণ। অপূর্ব মুখশ্রী এবং দামী বেশভূষায় সজ্জিত। মস্তবড় ধনী ব্যারিস্টারের একমাত্র ছেলে।

শৈবাল একটু থতমত খেয়ে বলেছিল, আমাকে বলছেন স্যার?

Yes! Mr.—you! Come forward!—হিস্ট্রী নাও!—প্রফেসার বললেন।

বাধ্য হয়ে শৈবালকে এগিয়ে যেতে হলো।

কি নাম আপনার?—শৈবাল অগত্যা এগিয়ে গিয়ে রোগিণীকে প্রশ্ন করে।

সরস্বতী!—রোগিণী জবাব দেয়।

কি কষ্ট আপনার বলুন তো!

বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে—

আর কি কষ্ট হয়?

আর তো কিছু কষ্ট নেই।

শৈবাল ভাবতে থাকে এবারে কি প্রশ্ন করবে। শুধু শৈবাল কেন, প্রথম প্রথম সকল ছাত্রেরই ঐ অবস্থা হয় রোগিণীর পাশে দাঁড়িয়ে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সে। বাকী সকলেও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দতার মধ্যে কেটে গেল।

প্রফেসার আবার বললেন, Have you finished! Any more question you want to ask her!

একটু ইতস্ততঃ করে শৈবাল জবাব দেয়, না স্যার! এবারে examination করবো।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই?—প্রফেসার আবার জিজ্ঞাসা করেন। রে-

শৈবাল নিরুত্তর। ৫৫

আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও পেসেণ্টকে?—প্রফেসারের সপ্রশ্ন দৃষ্টিটা সকলের মুখের উপর দিয়ে ঘুরে গেল একবার। কিন্তু কারো সাড়া না পেয়ে দ্বিতীয়বার যখন তাঁর দৃষ্টিটা ঘুরতে ঘুরতে শর্বরীর মুখের ওপরে এসে নিবদ্ধ হলো, পায়ে পায়ে সে বেডের কাছে এগিয়ে এলো।

কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও?—প্রফেসার কথাটা বলে শর্বরীর মুখের দিকে তাকালেন।

আপনার হাত পা মুখ সব ফোলা দেখছি—কতদিন হলো এরকম হয়েছে?—শর্বরী রোগিণীকে প্রশ্ন করে।

ক্রমে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে শর্বরী রোগিণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সেই দিনই ক্লিনিক্সের পরে ডাক এলো শর্বরীর ডাঃ চৌধুরীর হাসপাতালের নিজস্ব বসবার ঘরে।

সিনিয়ার হাউস স্টাফ্ অজিত সেন এসে বললে, আপনাকে প্রফেসার

ডাকছেন মিস্ রায়।

দুরু দুরু বক্ষে শর্বরী সুইং ডোরটা নিঃশব্দে ঠেলে ভিতরে উঁকি দিল। গায়ের কোটটা খোলা, উপরে একটা সাদা এ্যাপ্রন। প্রফেসার টেবিলের ওপরে রক্ষিত মাইক্রোস্কোপে গভীর মনোযোগের সঙ্গে যেন কি একটা হিস্টোপ্যাথলজির স্লাইড দেখছিলেন। শর্বরীর উপস্থিতি টেরও পেলেন না। মাইক্রোসকোপের পাশেই একটা মোটা প্যাথলজির বই খোলা।

পাঁচ সাত মিনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে শর্বরী। নিজের উপস্থিতিটা সাড়া দিয়ে জানাবার মত সাহস পায় না। প্রফেসারও মাইক্রোস্কোপের আইপিস্ হতে চোখ তোলেন না।

হঠাৎ তারপর একবার মাইক্রোস্কোপ হতে চোখ তুলে বইয়ের দিকে তাকাতে গিয়ে অদূরে দণ্ডায়মান শর্বরীর প্রতি প্রফেসারের দৃষ্টি গেল।

এসো! বোস!—বলেই আবার প্রফেসার বইয়ের মধ্যে ডুব দিলেন।

প্রায় কুড়ি মিনিট কেটে গেল। প্রফেসার বইয়ের পাতার পর পাতা উল্টে চলেছেন। নিঃশব্দে বসে শর্বরী। তারপর একসময় বইটা বুজিয়ে সামনের টেবিলের গায়ে সংযুক্ত ইলেকট্রিক বেলের বোতামটা টিপলেন। দরজার বাইরে কঁ-কঁ আওয়াজ হলো একটা।

বেয়ারা ছুটে এলো।

Like to have some tea?—শর্বরীর দিকে তাকিয়ে প্রফেসার প্রশ্ন করেন।

শর্বরী কোন জবাব দিতে পারে না।

প্রফেসার বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বলেন, চা নিয়ে আয় দুজনের মত।

চা পানের সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসার কথা বলে চললেন। অন্য কোন কথা নয়, কেবল পড়াশুনার কথা। এর পর হতে সকলেরই নজরে পড়েছে প্রফেসার চৌধুরীর শর্বরী রায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিটা! স্বল্পভাষী প্রফেসার চৌধুরী—যাকে হাসপাতালে কেউ কোন দিন এতটুকু কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে দেখেনি। একমাত্র কাজের কথা ছাড়া যাকে কেউ কখনো কারো সঙ্গে অন্য কোন আলাপ করতে পর্যন্ত শোনেনি—শর্বরীর প্রতি দিনের পর দিন সেই লোকের বিশেষ আচরণ হাসপাতালে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অবিবাহিত নিরস রুক্ষ কাজ-পাগলা প্রফেসার চৌধুরীর মত লোকের সাধারণ এক ছাত্রীর প্রতি বিশেষ ব্যবহারটা ক্রমে হাসপাতালে ও হাসপাতালের বাহিরে

একটা আলোচনার সৃষ্টি করে।

শর্বরী কেবল মেধাবী ছাত্রীই নয়, সুন্দরী তন্বী তরুণী! সাধারণ বেশভূষাতেও তাকে এমনি মানায় যে সহজেই দশের মধ্যেও সে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এর আগেও যে মেধাবী ছাত্রী আসেনি কলেজে তাও নয়, কিন্তু প্রফেসার চৌধুরীর এই ধরনের ব্যবহার কখনো কেউ দেখেনি কারো প্রতি ইতিপূর্বে।

বরং সকলেই বলেছে, ডাঃ নির্বাণ চৌধুরীর মনটা রসকসহীন পাথরের মত! কাজ ছাড়া কিছু জানে না। একটা ওয়ার্কিং মেসিন যেন।

কিন্তু যে দুটি অসমবয়সী নরনারীকে কেন্দ্র করে এত আলোচনা, তাদের ভিতরের সত্যিকারের সম্পর্কটা সম্বন্ধে আর কেউ সন্দিহান থাকলেও শর্বরী নিজের দিক থেকে একান্তভাবেই নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ শর্বরী একমাত্র চিকিৎসা-সম্পর্কীয় কোন কথা ছাড়া অন্য কোন কথা কোন দিন গত তিন বৎসরের আলাপেও প্রফেসারের মুখ থেকে শোনেনি।

আজও তিনি তার সমস্ত ইতিহাস শোনবার পর তাকে পরীক্ষা করে কোন কথাই বলেননি, কেবল একটি মাত্র কথা ছাড়া, you are carrying শর্বরী! ব্যস্ আর কোন কথা নয়।

শর্বরী নিজেই কি অনেকটা বুঝতে পারেনি! এখন মনে হচ্ছে, মনে মনে কি তার ঐ সন্দেহই হয়নি! গত দুই মাস ধরে নিজেই কি সে অনুভব করে-নি। তার পরিচিত দেহটার কোষে কোষে গত মাসখানেক ধরে বিশেষ করে যে অনুভূতিটা ক্রমেই আশঙ্ক ও ইচ্ছাকৃত অনিশ্চয়তায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সে তো তার অজানা ছিল না! বিশেষ [illegible] গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা তাকে তো ভুল সংবাদ দিতে পারে না।

হঠাৎ খেয়াল হলো শর্বরীর যে স্টপেজে তার নামবার কথা তার পরেও আরো দুটো স্টপেজ ট্রামটা ইতিমধ্যে পার হয়ে এসেছে। চিন্তাশক্তিটা যেন কেমন জট পাকিয়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। অসংবদ্ধ চিন্তাসূত্রগুলো টুকরো টুকরো, কারো সঙ্গে যেন কারো কোন যোগ নেই।

পরের স্টপেজে নেমে অনেকটা হাঁটতে হবে। উপায় নেই! হেঁটেই চলল শর্বরী। এ পথটা শর্বরীর চিরদিনের অভ্যস্ত পথ, একান্ত পরিচিত। আশেপাশের সব চেনা মুখ, তবু শর্বরী মাথাটা নীচু করেই হেঁটে চলে।

সব কিছু যেন শূন্য হয়ে গিয়েছে। একটা অবলম্বন খুঁজে পাচ্ছে না শর্বরী! বন্ধন যা কিছু ছিল সব আলগা হয়ে গিয়েছে।

এ সময় তো কোন দিনও শর্বরী বাড়ি ফেরে না। হাসপাতালের কাজ সেরে ফিরতে ফিরতে সেই বেলা দেড়টা দুটো বেজে যায়। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করতে থাকে। বাড়িতে গিয়ে কোনমতে চারটি খেয়ে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম নিয়েই রোদ থাকতে থাকতেই আবার বের হয়ে পড়ে শর্বরী। ফিরতে সেই রাত দশটা।

বাইরের ঘরে বাবা নিশ্চয়ই এখনো বসে আছেন, হাতে তাঁর ধরা আজকের বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া সংবাদপত্রটা।

॥ ২ ॥

নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে পঙ্গু শেখরনাথ। গত চার বছর ধরে পঙ্গু হয়ে আছেন শেখরনাথ। অনেক চেষ্টা করেছিল শর্বরী। শহরের বড় বড় ডাক্তার কন্‌সাল্ট্‌ করতে কাউকেই বাদ রাখেনি। কিন্তু কিছুই করা গেল না; পা দুটো শুকিয়ে শুকিয়ে একেবারে হাড়গুলোই অবশিষ্ট এখন। একটা আরাম কেদারার ওপরে চুপচাপ বসে থাকেন সমস্ত দিনটা শেখরনাথ এবং বসে বসে কখনো বই, কখনো সংবাদপত্র পড়েন, কখনো বা শোনেন রেডিও।

নিজ হতে নড়াচড়া করবার কোন শক্তি নেই। বেডপ্যান, ইউরিন্যাল চেয়ারের পাশেই থাকে সর্বদা। দুপুরে হাসপাতাল সেরে বাড়ি ফিরে সেগুলো পরিষ্কার করে দেয় শর্বরীই নিজ হাতে। ছোট বোন আলো নিজের লেখাপড়া ও খেয়াল নিয়েই ব্যস্ত। পঙ্গু বাপের কাছে বড় একটা ঘেঁষতেই চায় না। বললেও মুখভার করে।

শেখরনাথ নিজেও আলোকে বিশেষ পছন্দ করেন না।

একমাত্র ভাই টুটু বা মনোজিৎ, তার [illegible] বা কি। মাত্র তো সবে এই আট বছরে পড়েছে। বেজায় দুরন্ত। বাড়িতে বড় একটা থাকেই না। গত বছরে জোরজার করে শর্বরী স্কুলের কিনডারগার্টেন সেক্‌সনে ভর্তি করে দিয়েছে। কিন্তু তাকে স্কুলে পাঠানো নিয়ে প্রত্যহ সকালে রীতিমত একটা কসরত করতে হয়।

পেনসনের সময় আসবার আগেই পঙ্গু শেখরনাথের বাধ্য হয়েই চাকরি হতে অবসর নিতে হয়েছে প্রায় বছর দুই আগে। ইনভ্যালিড্‌ পেনসন। সামান্য —জরীপ বিভাগে সামান্য আড়াই শত টাকা মাইনের চাকুরে। এখন পেনসন পান যা তাতে করে ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। মাত্র ৯৫টি টাকা।

খুব সময়ে শর্বরী পাস করে রোজগার করতে শুরু করেছিল। হাসপাতাল থেকে যা মাইনে শর্বরী পায় তা মানুষের কাছে অবশ্য বলবার নয়। কারণ

এদেশে একজন মোটর ড্রাইভারেরও মাইনে একজন পাস করা হাউস্ফিজিশিয়ানের মাইনে থেকে অনেক বেশী।

কিন্তু শর্বরীর আসল রোজগার ছিল ডাঃ চৌধুরীকে তাঁর প্রাইভেট সব কেসে এ্যাসিস্ট্ করে যা সে পেত তাতেই।

মাস মাস মাইনে বাদে তিন চার শত টাকা তো শর্বরী ডাঃ চৌধুরীকে তাঁর প্রাইভেট কেসে এ্যাসিস্ট করেই পেত, এবং সে সুবিধা বলতে গেলে শর্বরী তার সিনিয়ারদিগের গোড়া থেকেই পেতে আরম্ভ করেছে, ডাঃ চৌধুরীর তার প্রতি স্নেহে ও অনুগ্রহে।

টাকার নিদারুণ অভাবে সমস্ত সংসারটা প্রায় অচল হয়ে যাবার দশায় পৌঁচেছিল—এমন সময় হঠাৎ একদিন :

বাইরের কেসের অভিজ্ঞতা শর্বরীর সেই প্রথম।

তার আগে সামান্য দু-একদিন শর্বরী অপারেশন থিয়েটারে ডাঃ চৌধুরীর দু-তিনটে এ্যাব্ডোমেন কেসে সেকেণ্ড ও থার্ড এ্যাসিস্টেন্টের কাজ করেছে।

বাবার অসুখটা অনেকদিন ধরে একটু বাড়াবাড়ি চলেছে; নিয়মিত ঔষধপত্র পড়ছে না। পর পর দুই মাসের বাড়িভাড়া বাকী পড়েছে। বাড়িওয়ালা বক্রোক্তি শুরু করেছে। আলোর স্কুলের মাইনেও বাকি মাস চারেকের। প্রত্যেকের জামাকাপড় সব গিয়েছে ছিঁড়ে—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অতি-আবশ্যকীয় ছোট-খাটো চাহিদা। বাঁচতে হলে অতি সাধারণভাবে যা প্রয়োজন তারই তাগিদ।

শর্বরীর সমস্ত চিন্তাকে চব্বিশ ঘণ্টা আচ্ছন্ন করে ছিল।

নিজের দৈনন্দিন রুটিনবাঁধা কাজেও মন বসে না। মন যেন কিছুতেই বসাতে পারে না শর্বরী। একটা অস্বস্তি তাকে পীড়ন করে সর্বদা।

এমন সময় সেদিন ডাঃ চৌধুরী ডেকে পাঠালেন শর্বরীকে তাঁর ঘরে হাসপাতালে।

শর্বরী একটা পেসেণ্টকে ব্লাড্ ট্রান্সফিউশন দিচ্ছিল। কাজ সেরে ডাঃ চৌধুরীর ঘরে গিয়ে ঢুকল। একটা ব্যাল্যান্সড্ বেবী ফুড্ নিয়ে গত দুই মাস ধরে ডাঃ চৌধুরী রিসার্চ করছেন শর্বরী জানে। সেই সম্পর্কেই বই ও খাতাপত্র নিয়ে ডাঃ চৌধুরী মগ্ন ছিলেন, শর্বরী সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ডাঃ চৌধুরীর সামনে তখন শর্বরী অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে।

আমাকে ডাকছিলেন স্যার ?

ও তুমি!—চৌধুরী মুখ তুললেন : বোস।

এরা কিন্তু বসে না। দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি শর্বরী। তুমি যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক! চিন্তিত! যদি তোমার কোন ডিফিকালটি হয়ে থাকে আমাকে খুলে বল! লজ্জার কিছু নেই আমার কাছে। স্পিক আউট্!—

শর্বরী কোন জবাব দিতে পারে না। চুপ করে থাকে।

ডাঃ চৌধুরীর কাছে নিজের অর্থকষ্ট, দৈন্যের কথা কিছুতেই খুলে বলতে পারে না যেন ও। অথচ তাঁকে মিথ্যা কিছু একটা বলে আলোচনাটাকে চাপা দেবার মধ্যেও কেমন একটা বিশেষ কুণ্ঠা অনুভব করে যেন।

আবার ড: চৌধুরী বলেন, এবারে আরো একটু স্পষ্টভাবেই, ব্যক্তিগত কোন কারণ থাকলেও দ্বিধা বা লজ্জা করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই আমার কাছে শর্বরী। ডিফিকালটি মানুষ মাত্রেরই হতে পারে। কিন্তু সেটাকে মনের মধ্যে পুষে রেখে নিরুপায় ও অক্ষমের মত ব্রুড্ করা মানেই নিজের এনার্জি লস্ করা আমার মতে।—একটু থেমে আবার পূর্ব কথার জের টেনে বললেন, তুমি নিজে নিজে চেষ্টা করে হয়ত কোন সলুশনে পৌঁছুতে পা'ছো না। আমার অভিজ্ঞতা তোমার চাইতে অনেক বেশী নিশ্চয়ই স্বীকার করো!

শর্বরী প্রফেসারের দিকে চোখ তুলে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

আমি হয়তো তোমায় সাহায্য করতে পারি। বল—লজ্জা করো না আমাকে—প্রফেসার বললেন।

শর্বরী এবারে মুখ খোলে, আপনার তো অনেক জানাশোনা আছে স্যার। কোথাও আমাকে একটা ভাল চাকরি যোগাড় করে যদি—

এই কথাটা বলবার জন্য এত দ্বিধা করছিলে কেন? বেশ আমার মনে রইলো—বলতে বলতে নিজের এ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়েরীটা খুলে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। ডায়েরীর একটা পাতায় এসে কি যেন ক্ষণকাল ভাবলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, পরশু সেভেনথ, ভবানীপুরে আমার একটা অপারেশন আছে। সাড়ে বারোটায় হাসপাতালের পর। তুমি আমাকে এ্যাসিস্ট্ করবে। আচ্ছা, তুমি যেতে পারো।

কেসটা ছিল ইউটেরাসের ফাইব্রয়েড।

দুরু দুরু চিত্তে শর্বরী প্রফেসারকে এ্যাসিস্ট করলো। এর আগে সম্পূর্ণ একাকী শর্বরী প্রফেসারকে কখনো এ্যাসিস্ট্ করেনি কোন অত বড় অস্ত্রোপচারে। প্রতি মুহূর্তে ভয় আর আশঙ্কা। কখন কি ভুল-ত্রুটি হয়। কিন্তু আশ্চর্য, নির্বিঘ্নে অপারেশন শেষ হয়ে গেল।

অপারেশনে শর্বরী সে কেসে প্রফেসারকে এ্যাসিস্ট্ তো করলই, প্রত্যহ কেসটা ড্রেসিং করবার জন্যও শর্বরীকেই প্রফেসার নিযুক্ত করে দিয়ে এলেন। এবং সেদিন ফিরতিপথে নিজের গাড়িতেই বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন শর্বরীকে তার অনেক আপত্তি সত্ত্বেও, এবং নামবার আগের মুহূর্তে গাড়ি হতে কয়েকটা নোট শর্বরীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তোমার ফিস্।

বাড়িতে এসে শর্বরী নোটগুলো গুণে দেখে : চারশত টাকা।

চোখের জল রোধ করতে পারেনি শর্বরী সেদিন। কৃতজ্ঞতায় বুকটা তার ভরে গিয়েছিল। সেবারে ঐ কেসটা হতে সে প্রায় হাজার টাকা পেয়েছিল। এবং শুধু তাই নয়, তারপর হতে প্রায়ই শর্বরীর ডাক পড়তে লাগল ডাঃ চৌধুরীর কাছে এ্যাসিস্টেণ্ট হিসাবে।

হাসপাতালে এবং হাসপাতালের বাইরে শর্বরী ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। ফলে দু-এক মাসের মধ্যেই একটা চাপা গুঞ্জন কানে আসতে লাগল শর্বরীর। কানে আসতে লাগল দুটো নাম : ডাঃ শর্বরী রায় ও প্রফেসার ডাঃ নির্বাণ চৌধুরী।

এমন কি শৈবাল—শৈবাল পর্যন্ত একদিন হাসপাতাল হতে বের হবার মুখে সন্ধ্যায় ঠিক গেটের বাইরে শর্বরীকে ধরলো।

শর্বরী ট্রামে উঠতে যাবে, মৃদু পরিচিত কণ্ঠে ডাক এলো, শর্বরী।

ফিরে তাকাল শর্বরী। হ্যাঁ। সেই পরিচিত কালো রংয়ের আলো-পিছলে-যাওয়া পালিশ করা সিডনবডি নিউ মডেলের হিলম্যান গাড়িটা!

স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে শৈবালই।

এগিয়ে এলো শর্বরী, শৈবাল!

হ্যাঁ—এসো—

গাড়ির দরজা খুলে শৈবাল আহ্বান জানাল শর্বরীকে।

শর্বরী একটু ইতস্ততঃ করে, কিন্তু পার্ক নার্সিং হোমে একটা কেস সকালে আজ সিজিরিয়ান হয়েছে, এখন একবার এ্যাটেণ্ড করতে যেতে হবে, ডক্টর চৌধুরীকে রিপোর্টটা দিতে হবে ফোনে!

পৌঁছে দেবো, এসো!

অনুরোধ নয় আদেশ।

শর্বরীকে উঠে বসতেই হলো শৈবালের পাশে। শৈবাল গাড়ি ছেড়ে দিল।

মেটাল বাঁধানো মসৃণ রাস্তা ধরে শৈবালের গাড়ি ছুটে চলেছে। শর্বরী আড়চোখে শৈবালের মুখের দিকে তাকাল একবার: গাড়ির ড্যাসবোর্ডের

অস্পষ্ট নীলাভ আলোয় মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না শৈবালের।

শৈবাল!

শৈবালের একটা তীক্ষ্ণ উগ্র রূপ আছে। সহজে সবার চোখেই সেটা পড়ে না। গায়ের রং কটা এবং চোখ-মুখ ও সর্বোপরি দেহের গঠনটা তার সুন্দর পৌরুষোচিত সন্দেহ নেই, কিন্তু সে সৌন্দর্য সহজে কাউকে আকর্ষণ করতে পারে না, বরং এক কথায় বিকর্ষণই করে বলা যেতে পারে সাধারণ মনকে।

একান্তভাবেই শর্বরী নিজের কাজের মধ্যে আত্মসমাহিত থাকলেও শৈবালকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। পর পর রোল নাম্বার থাকার দরুন বরাবর এক ব্যাচেই পড়েছে দুজনে। ঘনিষ্ঠ হবার সেটাও কম সুযোগ নয়।

অহঙ্কারী উদ্ধত প্রকৃতির শৈবাল নিজের আশেপাশে বড় একটা ফিরেও তাকাতো না। বিখ্যাত ধনী ব্যারিস্টারের একমাত্র সন্তান বলে অনেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, মেয়েরা তো বটেই, ছেলেরাও—কিন্তু শৈবাল ধরা দেয়নি কোথাও।

এদিকে শর্বরীর প্রতি আকৃষ্ট বহু ছাত্র ও হাউস-স্টাফরাও তার কাছে পাত্তা পায়নি তার চারপাশে ঘুরঘুর করেও। শৈবাল ও শর্বরী পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বললেও কারো প্রতি কারো কোন আকর্ষণ দুজনের একজনও বোধ করেনি অনেকদিন। শর্বরী থাকে তার বই ও পড়াশুনা নিয়ে, শৈবাল সর্বদাই ব্যস্ত তার গানবাজনা ও হৈ-হল্লা নিয়ে। শৈবাল যে গানবাজনায় ওস্তাদ অনেকেই সে সংবাদ রাখত না। কথাটা জানাজানি হলো এক কলেজ ফাংশনের জলসায়।

গানবাজনার ভক্ত ছোট বোন আলো এসেছিল শর্বরীর সঙ্গে জলসায়।

জলসায় সেদিন শৈবালের সেতার বাজনা ও কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীত শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল আলো। শর্বরী নিজেও কম আশ্চর্য হয়নি।

শৈবাল শর্বরীর সহাধ্যায়ী শুনে আলোই দিদিকে অনুরোধ করলো শৈবালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য।

সে পরিচয়েরই সূত্র ধরে আলো আমন্ত্রণ জানাল শৈবালকে তাদের ওখানে যাবার জন্য। কি জানি কেন সেদিনকার আলোর সে আমন্ত্রণ শৈবাল উপেক্ষা করতে পারেনি। এবং দিন দুই বাদেই একদিন বিকালের দিকে গিয়ে হাজির হলো শর্বরীদের ওখানে। সেটা ছিল রবিবার। তারপর থেকেই মধ্যে মধ্যে শৈবাল যেতো এবং সেই যাওয়া আসার সূত্র ধরে পরস্পর পরস্পরের কাছে ক্রমশ আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো। এবং সেই ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই শৈবাল অকস্মাৎ একদিন আবিষ্কার করলে: বিশেষ রকম ভালো লাগছে তার শর্বরীকে। এবং

সেকথা একদিন সোজাসুজি প্রকাশ করতেও কোন কুণ্ঠা বোধ করলে না।

শর্বরীকে তার ভালো লাগে; খুব ভালো লাগে।

শর্বরী কথাটা শুনে খুব আশ্চর্য হলো না, কারণ সেও ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছিল শৈবালকে তারও ভালো লাগে।

পরস্পর পরস্পরের কাছে আরো নিবিড় হয়ে এলো।

কিন্তু বাধা ছিল এক জায়গায়, সজাত নয় দুজনে।

শৈবাল কায়স্থ, শর্বরী ব্রাহ্মণ।

শৈবালের বাবা বিলাত-ফেরত উগ্র সাহেব। তার দিক থেকে কোন আপত্তি আসবে না শৈবাল জানত, কিন্তু শর্বরীর বাবা শেখরনাথ আবার উগ্র ব্রাহ্মণ। তিনি কিছুতেই মত দেবেন না। কিন্তু সমস্যার কথাটা ভাববার প্রয়োজন হয়নি কারণ আপাততঃ বিবাহের ব্যাপারটা ভাবা কেউ তত প্রয়োজন বোধ করেনি। এমনি করেই দিন যাচ্ছিল কেটে নিবিড় একটা ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যেন স্বপ্নের মতই।

সোজা রেড রোড দিয়ে সেদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে এসে গাড়ির ব্রেক কষল শৈবাল। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি সে; চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে এসেছে স্পীডের মাথায়। শর্বরীও প্রশ্ন করেনি।

এতক্ষণে সর্বপ্রথম শর্বরীই প্রশ্ন করে, ব্যাপার কি বল তো, এখানে এলে কেন?

প্রফেসার চৌধুরীর সঙ্গে তোমার ইদানীংকার ঘনিষ্ঠতা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না শর্বরী!—একেবারে খোলাখুলি ভাবেই কথা বলে শৈবাল।

বিস্ময়ে শর্বরী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল; শৈবাল যে কোনদিন তাকে এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারে এ তার ধারণারও অতীত ছিল যেন। তারা পরস্পর পরস্পরকে চেনে এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্কটাও তো আজ আর একের কাছে অন্যের অবোধ্য কিছু নেই! তথাপি দশজন সাধারণ পুরুষের মতই শৈবালও তাকে ঐ প্রশ্নটা করতে পারল!

ছিঃ শৈবাল! তিনি প্রফেসার, গুরুজন ব্যক্তি! তাঁর সম্পর্কে এ ধারণাও পাপ।

পাপ অন্যায় বুঝি না শবরী! আমি পুরুষ মানুষ—

শৈবাল!

আর কথা কাটাকাটির কিছু নেই। শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে যতটুকু সম্পর্ক থাকা চলতে পারে তার চাইতে বেশী না রাখলেই হয়।

তুমি তো জান আমি তার এ্যাসিস্টেন্ট্ হয়ে আজকাল কাজ করছি!—

যে কাজের সঙ্গে দুর্নামের আশঙ্কা জড়িয়ে থাকে—আমার ইচ্ছা নয় সে কাজ

তুমি আর কর শর্বরী !—

মিথ্যে দুর্নামকে প্রশ্রয় দিতে নেই শৈবাল। মনে রেখো সেটা দুর্বলতারই নামান্তর মাত্র। তাছাড়া তুমি তো জান আমি স্ত্রীরোগের বিশেষজ্ঞ হতে চাই এবং সেদিক থেকে প্রফেসার চৌধুরীর মত একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের এভাবে সাহায্য পাওয়া ভাগ্যের কথা। এত বড় সুযোগ মানুষের জীবনে খুব কমই আসে।

আমি সমস্ত ব্যবস্থা করছি। আমার সঙ্গে তুমি বিলেত চল, সত্যিকারের শিক্ষা যেখানে পাবে।—

শর্বরী মৃদু হাসে।

হাসছো যে।—

ভিত না গড়ে বিলাতে ডিগ্রি নিতে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। সেখানে গিয়ে বার বার অকৃতকার্য হওয়ার চাইতে প্রস্তুত হয়েই আমি যেতে চাই।— তুমি তো জান এবং সে কথা তোমাকে ইতিপূর্বে বলেছি তো।

হ্যাঁ, বলেছো, কিন্তু সেখানে গিয়েও তো তুমি প্রস্তুত হতে পারো সেখানকার কোন কলেজে কাজ করতে করতে।

অত সময় বিদেশে দেবার মত আমার কোথায়, আমার সংসারের কোন কথাই তো তোমার অজানা নেই শৈবাল।

সে ভারটা আমার উপর দিলেই তো পারো!

তা হয় না।

সেই এক কথা। কেন হয় না বলতে পারো? আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়?

সেরকম দিন আসলে নিশ্চয়ই নিজের বলে ভাববো। কিন্তু এখনো তো তুমি সম্পূর্ণভাবেই তোমার বাবার টাকার মুখাপেক্ষী। যাক। শোন পাগলামি করো না! আজেবাজে চিন্তা করে মাথা খারাপ করো না। তোমার শর্বরী জেনো তোমারই আছে।—চল, এবার ফেরা যাক।

কিন্তু—

উহুঁ। আর কোন কথা নয়। বড্ড দেরি হয়ে গেল। নার্সিং হোমে একবার যেতে হবে!—

কিন্তু শর্বরী—

আবার!

॥ ৩ ॥

সেই শৈবাল!

কিন্তু সব দোষ একা শৈবালের ঘাড়েই চাপালে তো চলবে না।

শৈবাল পুরুষ। অবুঝ সে হতে পারে, হতে পারে সে অসহিষ্ণু। কিন্তু সে এত বড় ভুল করলে কেন? সমস্ত দিকটা সে নিজেই বা ভাবেনি কেন?

কিন্তু সে যাই হোক, আর যখন অন্য উপায় নেই, শৈবালকে সব কথা যত শীঘ্র হোক বলতেই হবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় কেমন করে সব কথা শৈবালকে এখন বলবে! কেমন করে তার সমস্ত দৈন্য অকপটে প্রকাশ করে তার দয়া ভিক্ষা করবে সে। কিন্তু ভিক্ষাই বা কেন! আর দৈন্যই বা কিসের, তারা যে পরস্পর পরস্পরকে বিবাহ করবে এ তো কতদিন থেকেই ঠিক হয়ে আছে। কেবল সেই না মত করেনি! শৈবালের সমস্ত অনুরোধকে নানা অজুহাতে ঠেকিয়ে রেখেছে। তবু লজ্জায় কি তার মাথা নুয়ে আসবে না শৈবালের সামনে গিয়ে আজ দাঁড়াতে···নিজের মুখেই উপযাচিকা হয়ে সে কথা বলতে!—তবু বলতেই হবে। না বলে তো আর উপায় নেই। আর তো দেরি করা চলে না।

শর্বরীর পায়ের শব্দে শেখরনাথ চোখ তুলে তাকালেন। অসময়ে পরিচিত পদশব্দ। এ সময়ে তো শর্বরী কখনো ঘরে ফেরে না!

কোনমতে শর্বরী যেন পিতার ঘরের সামনে দিয়ে তার নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

ঘরের মেঝেতে একরাশ লাল নীল কাগজের টুকরো ও খানিকটা ময়দার আঠা নিয়ে ছোট ভাই মনোজিৎ (টুটু) একটা ছেঁড়া ঘুড়ি জোড়া দিতে ব্যস্ত। কি একটা পর্ব উপলক্ষে আজ তার স্কুল ছুটি। টুটু চাইলও না একবার শর্বরীর দিকে।

হাসপাতালের জামাকাপড় নিয়েই শর্বরী শয্যার উপরে এসে শুয়ে পড়ল।

আর সে হাসপাতালে যেতে পারবে না। মুখ দেখাতে পারবে না আর ডাঃ চৌধুরীকে।

পরক্ষণেই সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবতে ভাবতে মনে হয়: কিন্তু পারবেই বা না কেন! কি এমন অন্যায়! কি এমন অপরাধ করেছে সে!

কিন্তু তার বাবা! শেখরনাথ রায়! সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গু শেখরনাথকে মনে পড়ে যায়।

কত আশা শর্বরীর উপরে তাঁর। কত আশা করে তাকে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেছিলেন। মেডিকেল কলেজে তার ছাত্রজীবনের প্রতিটি

মুহূর্তে দিয়েছেন তিনি প্রেরণা, দিয়েছেন সাহস। এখনো প্রতিদিন কত না আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে-নাটিয়ে তার প্রতিটি কেস সম্পর্কে আলোচনা করেন তার সঙ্গে, সেই শেখরনাথ।

পাস করবার পর আলোচনা প্রসঙ্গে কতদিন বলেছেন, আমার টাকা থাকলে তোকে আমি বিলাত পাঠাতাম, মা!

শেখরনাথের বড় ইচ্ছা শর্বরী বিলাত ঘুরে আসে।

বিলাতী ডিগ্রীর চাইতে অবিশ্যি শর্বরীর বেশী ইচ্ছা সেখানকার হাসপাতাল-গুলো দেখবার। সেখানকার চিকিৎসাপদ্ধতি জানবার ও শিখবার। অতি যত্নে সে গোপনে কিছু কিছু জমিয়ে চলেছে অনেকদিন ধরে। বিলাত সে যাবেই। অন্য কারো অর্থসাহায্যে নয়। তার স্বোপার্জিত অর্থে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়।

হঠাৎ খেয়াল হলো পাশের ঘর থেকে শেখরনাথ ডাকছেন তাকে, শর্বরী!—

যাই বাবা!—উঠে বসল শর্বরী।

পায়ে পায়ে এসে পিতার ঘরে প্রবেশ করল।

শরীর ভাল আছে তো মা?—শেখরনাথের মুখে স্নেহের শঙ্কিত ছায়া।

হ্যাঁ!—

এ সময়ে তো কখনো তুমি হাসপাতাল থেকে আস না। তাই ডাকছিলাম.

শরীর ভালই আছে।—শর্বরী যেন পালাতে পারলেই বাঁচে।

সাধারণতঃ পিতা ও কন্যার মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, শর্বরী ও শেখরনাথের মধ্যে ঠিক সে সম্পর্ক ছিল না। বলতে গেলে তিনটি সন্তানের মধ্যে শর্বরীকে তিনি বরাবরই একটু বিশেষ স্নেহ করতেন এবং শর্বরীর ছোটবেলায় একদিন তাকে পড়াতে গিয়ে শেখরনাথ যেদিন প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন অন্যান্য সাধারণ আর দশটি ছেলেমেয়ের চাইতে শর্বরীর বুদ্ধি ও স্মরণশক্তিটা বিশেষরকম একটু প্রখর, সেইদিন হতেই প্রায়ই নিয়মিত একপ্রকার বলতে গেলে শর্বরীর পড়াশুনার ব্যাপারে নিজেই লক্ষ্য রাখতেন। পড়ার বই ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে আরো দশ রকম বই এনে মেয়েকে পড়াতেন এবং পড়তে দিতেন। বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্য-তালিকার গণ্ডীর বাইরে যে বিরাট একটা জ্ঞানসমুদ্র ছড়িয়ে আছে, সে সম্পর্কে শিশুকাল হতেই শর্বরী ক্রমে ক্রমে সচেতন হয়ে উঠেছিল তার বাবার চেষ্টায়ই। এবং দিনের পর দিন ঐ ধরনের পড়াশুনা ও বিবিধ আলোচনার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন বয়েসী দুটি মানুষের মনের মধ্যে অপূর্ব একটি সৌহার্দ্যের ও প্রীতির সেতু গড়ে উঠেছিল। সেখানে তারা পিতা-কন্যা ছিলেন না—ছিলেন পরস্পরের কাছে পরস্পরের বন্ধুর মত। একটি সুরে বাঁধা দুটি যন্ত্র। সন্ধ্যাবেলা অফিসের

কাজকর্মের পর যখন পিতা-পুত্রী পাশাপাশি বসতেন ও জানা-অজানা আলোচনায় মেতে উঠতেন, সমস্ত কিছু যেন দুজনেই যেতেন ভুলে। পয়সার অভাবে নিজে শেখরনাথ ডাক্তারী পড়তে পারেননি কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি তাঁর মনের মধ্যে ছিল একটা বিচিত্র লিপ্সা। সেই অতৃপ্ত কামনা তিনি মেটাতে চেয়েছিলেন কন্যাকে দিয়ে এবং তাকে সেই ভাবেই গড়ে তুলেছিলেন।

ডাক্তারী ছাত্রীজীবনের ছয়টা বছর দিনের পর দিন শর্বরীর নতুন নতুন পৃষ্ঠা মেলে দিয়েছে শেখরনাথের কাছে।

ব্যাঙ আরশুলা কেঁচোর ডিসেকসন হতে শুরু করে এ্যানাটমি হলে মড়া কাটা এবং তার ভিতর দিয়ে মানবদেহের যে বিচিত্র বিস্ময় শুধু যে শর্বরীই অনুভব করেছে তা নয়, শেখরনাথও মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের আলোচনাপ্রসঙ্গে সে অনুভূতির সে অনাস্বাদিত আনন্দের ভাগীদার হয়েছেন।

তারপর পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যেদিন শয্যা নিলেন সেই সময় হতে শর্বরীর জীবনের রুটিনই হয়েছিল প্রতিদিন রাত্রে শয়নের পূর্বে হাসপাতালের খুঁটিনাটি বাপকে বসে শোনানো। বিচিত্র সব রোগীদের কাহিনী! তাদের সুখ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার বিচিত্র সব নতুন নতুন কাহিনী। কোন প্রফেসার কি রকম পড়ান, কার কি মুদ্রাদোষ, কার কি রকম প্র্যাকটিস ইত্যাদি সব গল্প। সে বলে যেতো, শেখরনাথ শুনতেন।

শর্বরীকে দিনের পর দিন ঐ ঘনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়ে শেখরনাথ যতখানি জানতে বা বুঝতে পারতেন, শর্বরী নিজেও হয় তো নিজেকে ততটা বুঝতে পারত না।

নিজের মন দিয়ে শেখরনাথ শর্বরীকে বুঝতে পারতেন। তার মনের এতটুকু কম্পনও শেখরনাথের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে যেতে পারত না।

তাই শেখরনাথ আজ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিলেন, শর্বরীর মনের মধ্যে কোথাও একটা দ্বন্দ্ব চলেছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই তাই আবার বললেন : বোস।

শর্বরী অস্বস্তি অনুভব করছিল কারণ মনের ঐ অবস্থায় ঠিক সে পিতার সম্মুখীন হবার জন্য যেন ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারলে না। পাশের খালি টুলটার ওপরে নিঃশব্দে শর্বরী উপবেশন করলে।

শেখরনাথ নিজেও সকাল হতে একটা কথা ভাবছিলেন।

গতরাত্রে তাঁর বাল্যবন্ধু বিশ্বেশ্বর চাটুয্যে এসেছিলেন। কর্মজীবনে এক সময় শেখরনাথ ও বিশ্বেশ্বরের মধ্যে নিবিড় একটা সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সময়ই একদিন কথায় কথায় বিশ্বেশ্বর বন্ধু শেখরনাথকে বলেছিলেন, তোমার বড় মেয়েটিকে আমার ছেলে অমলের জন্য চাই।

শর্বরীর বয়স তখন মাত্র সাত। অমলের বয়স পনের। অমল তখন স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র।

সে তো খুব সুখের কথা। শেখরনাথ বলেছিলেন।

হ্যাঁ। সম্পর্কটা দৃঢ় করে নেবো। তবে হ্যাঁ, অমল যদি কোন দিন সত্যিকারের মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারে সেই দিনই চাইবো তোমার মেয়েকে। তার আগে নয়। কথা দাও আমার কথা না পাওয়া পর্যন্ত মেয়ের অন্য কোথাও বিবাহ দেবে না।

শেখরনাথ কতকটা কৌতুকের সঙ্গেই হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বেশ তো তাই হবে।—

না। না—কথা দাও—

বেশ। কথা দিচ্ছি।—

দীর্ঘ আঠার বৎসর আগেকার কথা। শেখরনাথ ভুলেই গিয়েছিলেন। এবং সেই আঠার বৎসরে শর্বরী সম্পর্কে তাঁর মনের ইচ্ছাটাও অনেক পরিবর্তিত হয়েছে।

হঠাৎ গতকাল সন্ধ্যায় খোঁজ করতে করতে বিশ্বেশ্বর শেখরনাথের বাসায় এসেছিলেন, দীর্ঘ ব্যবধানের পর দুই বন্ধুর দেখা, সুখ-দুঃখের অনেক কথাই হলো; তারপর একসময় বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন শর্বরীর কথা।

শুনলেন শর্বরী ডাক্তারী পাস করে এখন হাসপাতালেই কাজ করছে।

এবারে বিশ্বেশ্বর বললেন, আমার ছেলে অমলকে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে শেখর। সে মাসখানেক হলো বিলাত হতে ইন্‌জিনিয়ার হয়ে ফিরেছে। এখানে একটা বিলাতী ফার্মে চার শ টাকার মাইনের একটা চাকরিও পেয়েছে। পোস্টটা ভাল, উন্নতির আশা আছে। তাছাড়া নিজের ছেলে বলে বলছি না—he is a jewell! কিন্তু যেজন্য তোমাকে এতকাল পরে খুঁজে বের করেছি—তোমার মনে আছে কিনা জানি না। অনেক বছর হয়ে গেল।

কি বল তো?—

মনে আছে তুমি কথা দিয়েছিলে অমল যদি আমার মানুষ হয় এবং সেদিন আমি তোমার শর্বরীকে চাইলে তাকে তুমি আমায় দেবে! আজ তাই আমি

এসেছি শর্বরীকেই ভিক্ষা চেয়ে নিতে তোমার কাছ হতে—

শর্বরীকে!—প্রশ্নটা নিজেকেই যেন নিজে করলেন শেখরনাথ।

হ্যাঁ শর্বরীকে আমি পুত্রবধূ করতে চাই।—নিজেও গত বৎসর রিটায়ার করেছি এবং তুমি তো জান অমলের মা তার দুই বৎসর বয়সের সময়ই মারা যান। এবারে আমার মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়ে বহুকালের শূন্য ঘর আবার আমি পূর্ণ করতে চাই।

শর্বরীর বিবাহ। এতদিনের মধ্যে কখনো একটিবারের জন্যও তো শেখরনাথের এই কথাটা একবারও মনে পড়েনি। আশ্চর্য!

মেয়ে হয়ে জন্মেছে যখন তার তো বিবাহ দিতেই হবে একদিন না একদিন, তবে একবারও কথাটা তাঁর মনে এলো না কেন? কেমন করে ভুলে ছিলেন তিনি এত বড় কথাটা!

কিন্তু শর্বরীর বিবাহ! কথাটা ভাবতেই সমস্ত মন এমন বিরূপ হয়ে উঠছে কেন? শর্বরীর বিবাহ হবে, সে চলে যাবে তাঁকে ছেড়ে তার স্বামীর ঘরে। এ বাড়িতে শর্বরী আর থাকবে না। যখন খুশি শর্বরীকে তিনি পাবেন না। অদ্ভুত একটা আক্রোশে শেখরনাথের মন যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে।

গতরাত্রে কোনমতে বিশ্বেশ্বরকে শেখরনাথ বিদায় করেছেন কোনপ্রকার কথা বা সম্মতি না দিয়েই। কিন্তু বিশ্বেশ্বর আবার আসবেন। শর্বরীকে তিনি চান, যাবার সময় সে কথাও তিনি বলে গিয়েছেন।

রাত্রে এতটুকুও আহারে রুচি ছিল না শেখরনাথের। সারাটা রাত একটি-বারের জন্যও দু চোখের পাতা এক করতে পারেননি। একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে কেবল ছটফট করেছেন। এবং একটিমাত্র চিন্তাই তাঁর সমস্ত অবচেতনা ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল: শর্বরী চলে যাবে। শর্বরীর বিবাহের দিন এসেছে। তাকে বিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু যতই কথাটা ভেবেছেন গতরাত্রে ততই মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা সর্বস্ব হারানোর ব্যথা তাঁকে পীড়ন করেছে।

না। অসম্ভব। শর্বরীকে তিনি ছাড়তে পারেন না। শর্বরী তো শুধু তাঁর কন্যাই নয়, তাঁর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনা ও আনন্দের জীবন্ত প্রতীক। শর্বরীকে যেতে দেওয়া মানে তাঁর দেহ হতে প্রাণটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। তাঁর সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত চেতনার সঙ্গে শর্বরী জড়িয়ে আছে। শর্বরী বা তিনি তো পৃথক দুজন নন। একাত্মা। এক অনুভূতি।

সারাটা বিনিদ্র রাত্রি বিচিত্র একটা আক্রোশের জালায় শেখরনাথ ছটফট

করেছেন, কখনো আবার অদ্ভুত এক ভয় ও আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠেছেন। কখনো মনে হয়েছে দূরে বহুদূরে কোথাও পালিয়ে যাবেন শর্বরীকে নিয়ে তিনি, আবার কখনও সঙ্কল্প করেছেন ঘরের মধ্যে তালাচাবি দিয়ে সমস্ত জগতের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখবেন তাঁর শর্বরীকে তিনি।

শর্বরীকে তিনি যেতে দেবেন না। কাউকে তিনি দেবেন না। শর্বরী তাঁর, একান্তভাবেই তাঁর।

চিন্তাজর্জর মনে হঠাৎ একটা কথা উদয় হয়েছে, কিন্তু শর্বরী যদি নিজে স্বেচ্ছায় কাউকে বিবাহ করে চলে যায়। যদি তাকে না জানিয়েই শর্বরী কাউকে বিবাহ করে বসে তার নিজের জৈবিক তাগিদে। তবে! তবে তিনি শর্বরীকে ধরে রাখবেন কেমন করে?

শেষ পর্যন্ত অন্য চিন্তা গিয়ে শেষের ঐ চিন্তাটাই তাঁকে পেয়ে বসেছে। এবং সেই দুশ্চিন্তাটাই প্রশ্নের আকারে হঠাৎ আজ প্রকাশ পেল, আচ্ছা মা তুমি কখনো একটা কথা ভেবেছো কিনা জানি না।

কি কথা বাবা।

তোমার বিবাহের কথা।

বিবাহ!—শর্বরী তার বর্তমান চিন্তা পর্যন্ত ভুলে গিয়ে বিস্ময়ে বাপের মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ মা। সমাজে বাস করতে হলে প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর জীবনে একদিন না একদিন ঐ প্রশ্নটি জাগবেই। মানুষের জীবনে ওটা একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতিও বলতে পারো।

বাবা!

না। না—মা! চিরদিন ঐ প্রশ্ন তো তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না। একদিন না একদিন, ওই প্রশ্ন তোমার সামনে এসে দাঁড়াবেই।

কিন্তু ও প্রশ্ন তো এখন আসতেই পারে না বাবা! আপনি অসুস্থ, টুটু এখনো মানুষ হলো না। আলো এখনো ছেলেমানুষ—

শেখরনাথ কিন্তু মেয়ের কথায় চমকে উঠলেন। মনে মনে শর্বরী তাহলে বিবাহের কল্পনা রাখে। কেবল আজ নয়, দুদিন পরে। শর্বরীকে তাহলে চিরদিন তিনি নিজের কাছে ধরে রাখতে পারবেন না।

সমস্ত মনটা যেন শেখরনাথের বেদনায় মুহূর্তে অসাড় হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। একটি কথাও মুখ ফুটে বলতে পারলেন না যেন।

শর্বরী প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল: আপনার খাওয়ার সময় হয়েছে বাবা। কথাটা

বলেই শর্বরী টুল ছেড়ে, উঠে পড়ল পিতাকে দ্বিতীয় উক্তির কোন সুযোগ না দিয়েই।

পিতার আহার্য থালায় সাজাতে সাজাতে আর এক নূতন চিন্তা শর্বরীর মনের মধ্যে এসে ঘুরপাক খেতে থাকে।

গত মাস দুই ধরে যে চিন্তাটা ভীতি ও সংশয়ে তার মনের মধ্যে নিরন্তর তোলপাড় করছিল, সমস্ত সংশয়ের জাল ছিন্ন করে নিষ্ঠুর সত্যে সেটা যেই মুহূর্তে নির্ধারিত হলো, শর্বরীর সমস্ত অনুভূতি কিছুক্ষণের জন্য অসাড় হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত সংশয়ের অন্তে একটা অদ্ভুত বোবা নিষ্ক্রিয়তা। কেমন করে যে অপারেশন থিয়েটার হতে বের হয়ে এসেছে—লম্বা টানা বারান্দাটা অতিক্রম করেছে প্রফেসার চৌধুরীর পিছু পিছু, তারপর এসে যন্ত্রচালিতের মত প্রবেশ করেছে তার ঘরে। প্রফেসারের ইঙ্গিতে তার সামনের চেয়ারটায় বসেছে। কতক্ষণ বসেছিল চেয়ারটায় কিছুই মনে নেই। কেবল মনে আছে প্রফেসার চৌধুরী সেই একটিমাত্র কথা ছাড়া আর কিছুই তাকে বলেননি। হয়তো তাঁর বলবার আরো কিছু ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কিছুই বলেননি।

একসময় তারপর বের হয়েও এসেছে তাঁর চেম্বারের স্থইং ডোরটা ঠেলে। আবার সেই পূর্বের টানা বারান্দা। তারপর সিঁড়ি। সমস্ত সিঁড়ি-পথটা পরিচিত কারো সঙ্গেই দেখা হয়নি। হলেও শর্বরীর নজরে পড়েনি। অন্যমনস্ক চোখের দৃষ্টিতে কিছুই রেখাপাত করেনি।

গেট দিয়ে বের হয়ে এসেছে। কেবল একটি অদৃশ্য শক্তি যেন সমস্তটা পথ শর্বরীকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সব এলোমেলো হয়ে গেল। তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা—একান্ত পরিচিত তার দৈনন্দিন কার্যলিপি সব যেন কে নিষ্ঠুর হাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। সব কিছুর ওপরে যেন একটা অকস্মাৎ সমাপ্তির রেখা পড়লো। জোর করে শর্বরীকে যেন পথের মাঝখানে থামিয়ে দিল।

বাড়িতে এসে ঢোকা অবধি সব ছিল অসংলগ্ন অসংবদ্ধ, হঠাৎ সেই অসংলগ্ন অসংবদ্ধ বিমূঢ় চিন্তাস্রোতে পিতার প্রশ্নগুলো আবর্ত রচনা করলো।

বিবাহ! সত্যি! এ কথাটা তো এতক্ষণে একবারও তার মনে পড়েনি। ঐ পথেই তো তার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা মিলতে পারে। হ্যাঁ। আশ্চর্য। এ কথাটা এতক্ষণ একবারও মনে পড়েনি কেন!

আজই দেখা করতে হবে। সাতটার পর শৈবালের চেম্বারে ভিড় থাকে না।

একান্ত নিরিবিলি।

শৈবাল!

শৈবালকেই এখন সর্বাগ্রে তার প্রয়োজন।

॥ ৪ ॥

হাসপাতালের মেডিকেল আউটডোর। ফিমেল আউটডোর, তার সঙ্গেই বাচ্চাদেরও দেখাবার ব্যবস্থা। বাচ্চাদের মানে এক থেকে সাত বছর পর্যন্ত। বেলা এগারটা প্রায় হলেও রোগীদের ভিড়ের তখনও কমতি নেই।

ফিমেল আউটডোরের সামনেই সরু প্যাসেজটার মধ্যে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে রোগিণীর দল। ঘরের মধ্যে স্থান নেই আর। ঐ ঘরের মধ্যেই রোগী দেখবার ও ভিজিটিং ডাক্তার ও হাউস ফিজিসিয়ানদের বসবার ব্যবস্থা। একটা চৌকো টেবিলের একদিকে ভিজিটিং ফিজিসিয়ান বসে—অন্যদিকে একজন হাউস ফিজিসিয়ান ডাক্তারের নির্দেশমত টিকিট লিখে চলেছে। এক হাত মাত্র ব্যবধানে একটা স্ক্রীন বসানো স্ট্যাণ্ড। তার অন্তরালে একটা লোহার খাটিয়ায় বিস্তৃত এক মলিন শয্যা। একের পর এক রোগিণীরা এসে তার উপরে শয়ন করছে, সম্মুখে দণ্ডায়মান এ্যাটেনডিং নার্স ডাক্তারকে রোগিণীর পরীক্ষায় সাহায্য করছে।

এক প্রৌঢ়া মহিলাকে এনে শয্যাটির ওপরে শোয়ান হলো।

শৈবাল ডাক্তার রোগিণীর ইতিহাস নেয়: কি কষ্ট আপনার বলুন তো?

কষ্ট তো কিছুই নেই বাবা! কেবল কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি পেটটা যেন ক্রমেই ফুলে উঠছে—

মাজার কাপড়টা ঢিলে করে দিন তো মা!—শৈবাল অনুরোধ জানিয়ে নার্সের দিকে তাকায়।

ডাঃ মুখার্জী—ভিজিটিং এগিয়ে এলেন, কি কেস শৈবাল?

ততক্ষণে এ্যাটেনডিং নার্স শৈবালের ইঙ্গিতে রোগিণীর কোমরের কাপড় সরিয়ে দিয়েছিল। ডাঃ মুখার্জী পরীক্ষা করবার জন্য পেটে হাত দিলেন ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে।

পেটটা একটু টিপে প্রশ্ন করলেন, আপনার বন্ধ হয়েছে কতদিন?

হচ্ছিল তো বাবা নিয়মিতই, মাস ছয়েক বন্ধ—সেই থেকেই পেটে একটা চাকার মত—

হ্যাঁ। ছয় মাসই হবে। আপনার সন্তান হবে—নির্বিকার কণ্ঠে ডাঃ মুখার্জী

তাঁর মতামত জানালেন।

বল কি বাবা! এই বয়সে—পঞ্চাশ যে পার হলাম। ঘরভর্তি নাতিনাতনী, ছোট ছেলের বয়সই তো সতেরো! ভদ্রমহিলার চোখের কোল দুটো ছলছল করে ওঠে।

আপনি একবার 'জি' আউটডোরে গিয়ে দেখান।—কই হে নেক্সট্ কেস কই?

ডাঃ মুখার্জী শৈবালের দিকে তাকিয়ে বললেন।

ভদ্রমহিলা আরো কি বলবার চেষ্টা করেন কিন্তু ডাঃ মুখার্জী বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নেন।

শৈবাল আর নার্স পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে পরস্পর মুচকি মুচকি হাসে।

ডাঃ মুখার্জী নির্বিকার ভাবে আবার বলেন, Next case!

দ্বিতীয় কেস—বছর সতেরো-আঠারোর এক তরুণী।

কি কষ্ট আপনার? একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি।

বুকে পিঠে ব্যথা। তরুণী বলে।

ঠিক ঐ সময় দু-চারজন সিনিয়ার স্টুডেণ্ট ও দুজন হাউস ফিজিসিয়ান স্ক্রীনের অবরোধের মধ্যে এসে প্রবেশ করে।

নার্স রোগিণীর কাপড় ঠিক করে দেয় পরীক্ষার পূর্বে প্রয়োজন মত।

বুকে পিঠে দুবার স্টেথো দিয়েই ডাঃ মুখার্জীর কপালে রেখা জাগল, তিনি বললেন, ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে দিন তো নার্স! অতঃপর যত্নসহকারে ও ধৈর্যের সঙ্গে চলে পরীক্ষা।

হাসপাতালের বড় বিলাত-ফেরত ডাক্তার। চেম্বারে গেলে গুণে দিতে হবে বত্রিশটি টাকা। এখানে হাসপাতালের আউটডোরে বিনি পয়সায় দেখানো যায়। মস্ত সুবিধা।

শুধু ডাঃ মুখার্জীই নয়, পরীক্ষান্তে তাঁর নির্দেশে সকলেই একে একে রোগিণীকে পরীক্ষা করে, তারপর শুরু হয় ক্লিনিকস্। রোগ সম্পর্কে চিকিৎসা-সম্মত আলোচনা।

বাকী পরীক্ষার্থিনীর দল অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সত্যি, সোজা কথা তো নয়। একে অল্প বয়স, তার উপরে বুকের ব্যাধি। এবং টি. বি. রোগটাও বড় মারাত্মক কিনা!

যাহোক, এলো তৃতীয়া।

এরও মধ্যম বয়স। সেকেণ্ডারি এ্যানিমিয়া উইথ জেনারেল এ্যানাসরকা। রক্তাল্পতায় হাত পা মুখ ফুলে গিয়েছে। রং ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। এ আর

এমন কি, দু মিনিটও লাগে না। ব্যাধির নির্ণয় হতে ব্যবস্থাপত্র পর্যন্ত দেওয়া হয়ে যায়।

ডাক্তারবাবু, দয়া করে হাসপাতালে যদি ভর্তি করে নেন।—বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে। রোগিণী বলে মিনতি-করুণ কণ্ঠে।

বেড খালি নেই।

দয়া করুন ডাক্তারবাবু!—বড় গরীব!—

আঃ, কেন ফ্যাচ্ ফ্যাচ করছেন। বলছি তো বিছানা খালি নেই।—ডাঃ মুখার্জী জবাব দেন।

একজন টিপ্পনী কাটে, পেয়িং বেডে ভর্তি হবেন তো বলুন। রোজ তিন টাকা করে দিতে হবে।

কোথায় টাকা পাবো বাবা?—দুবেলা দুমুঠো খাওয়াই জোটে না।

রোগিণী ভ্যান্‌ভ্যান্ করেই চলে।

অন্যান্য অপেক্ষার্থীদের মধ্যে আগে দেখাবার জন্য ঠেলাঠেলি চলছে। পুরাতন ও নূতন রোগিণীর দল।

যে ডাক্তারটি পুরাতন রোগীদের ব্যবস্থা দিচ্ছিল তার হাতের মধ্যে একরাশ টিকিট—এক সেকেণ্ড দু সেকেণ্ড করে রোগীর সঙ্গে কথা বলেই ঔষধের ব্যবস্থা দান চলেছে। মিস্ট্ অ্যালকালি, মিস্ট্ আয়রণ এ্যাট্ আরসেনিক্, মিস্ট্ এ্যালবা, মিস্ট্ কারমিনেটিভ্—মিস্ট্ সিডেটিভ্ একস্‌পেকটোরেণ্ট্। বাঁধা ঔষধের বাঁধা নাম মেডিসিন স্লিপে খসখস করে লিখে যাওয়া কেবল বই তো নয়, বড়জোর এক-আধজনকে দয়া করে ছোট স্লিপে লিভার একসট্রাক্ট বা ক্যালসিয়াম ইনজেকশন দু-একটা লিখে দেওয়া।

উপায় কি! যা ভিড়। দু-এক সেকেণ্ডের বেশী সময় কেমন করেই বা দেওয়া যায়।

এর মধ্যেই একজন এ্যাপ্রন পরিহিত অন্য ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার পাশে এসে দাঁড়াল, মুখার্জী সাহেব ব্যস্ত নাকি!

আরে, কে ও তালুকদার। এসো। এসো। কি সংবাদ? এবার কলেজ কাউন্সিলে শুনলাম নাকি আমাদের ডাঃ চাটুয্যে দাঁড়াচ্ছে?

হ্যাঁ। তারপর সঙ্গের লোকটিকে এগিয়ে এনে বলে, একে একটু দেখে দাও তো ভাই।

কে?—

ডাঃ দত্তর ড্রাইভারের বৌ। পায়ের বুড়ো আঙুলটা ফুলেছে, সঙ্গে বোধ হয়

একটু জ্বরও আছে।

ভর্তি করে নিই না।—ডাঃ মুখার্জী বলেন।

কি হে, ভর্তি হবে?

আশেপাশে রোগিণীরা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। তারা তো আর ডাঃ দত্তর ড্রাইভারের বৌ নয়!

তাই নাও!

ওরে রামস্বরূপ, কোকো তৈরি কর। চল হে একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

ডাঃ চাটুয্যে ও ডাঃ মুখার্জী স্ক্রীনের ওপাশে গিয়ে বসলেন।

চলতে লাগলো সেখানে যত আলাপ। পলিটিকস্ হতে শুরু করে যত রকম কেচ্ছা।

শৈবাল ওর মধ্যেই একফাঁকে সরে পড়ে। 'জি' ওয়ার্ডটা ঘুরে এলে মন্দ হয় না। আজ প্রায় দশ দিন শর্বরীর সঙ্গে দেখা নেই। করিডোর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে শৈবাল।

ডেণ্টাল আউটডোরের ক্লার্কটা তারস্বরে ভাঙা গলায় চিৎকার করে চলেছে —মন্দাকিনী দেবী, রাখহরি ঘোষ, বিজন দস্তিদার, ভৈরব জানা, মাধব বল।

শৈবাল হেঁটে চলে কোনোমতে করিডোরে রোগীদের ভিড় ঠেলে ঠেলে।

দৈনন্দিন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্র তো নয়—একটা বারোয়ারীতলা যেন, না আছে কোন শৃঙ্খলা, না আছে কোন কানুন।

অজস্র অর্থব্যয়ের ও ফাইলের অন্ত নেই। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতে শুরু করে স্বাস্থ্য-বিভাগের কেরানীকুল পর্যন্ত স্বাস্থ্যদপ্তরের জন্য মাথা ঘামাচ্ছে।

দোতলায় ডানহাতি অপারেশন থিয়েটার। শৈবাল কাচের দরজাটা ঠেলে এসে অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশ করল।

ইথার, ক্লোরোফরম আর ডেটল। তিনের মিশ্রিত বা একক গন্ধটা যেন অনুভূতি ও চেতনার ওপরে স্নিগ্ধ চন্দনের একটা প্রলেপ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

মস্তিষ্কের মধ্যে থরে থরে অপূর্ব বিস্ময়কর এক সমন্বয়ে যে সংখ্যাতীত স্নায়ু-কোষগুলো আছে—সেই কোষে কোষে ইথার আর ক্লোরোফরমের বায়বীয় পরমাণুগুলি ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে গিয়ে আনে ঘুম।

সব কিছু হতে বিস্মৃতি।

আইওডোফরমের যুগ নেই। টিনচার আইওডিন্, লাইজল ও ডেটলের উগ্র অথচ কেমন একটু মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা ইথার ও ক্লোরোফরমের গন্ধের সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারের বায়ু তরঙ্গে তরঙ্গে একটা মৃদুমন্দ কম্পন তুলে চলেছে যেন।

দেওয়ালের সাদা দুধের মত রং চারপাশে আলোর অবাধ প্রবেশের জন্য পাল্লাহীন বড় বড় জানালাগুলোর ফ্রেমে আঁটা কাঁচগুলোর চকচকে ঝকঝকে অদ্ভুত পরিচ্ছন্নতা হাসপাতালের সমস্ত পরিবেশ হতে যেন পৃথকভাবে চিহ্নিত, স্বতন্ত্র। ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করামাত্রই যেন মনের সমস্ত অনুভূতি হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে।

অপারেশন টেবিলে কোন একটি রোগিণীর অপারেশন চলেছে। পরিধানে সাদা এ্যাপ্রন, মুখে মাস্ক, হাতে আঁটা গ্লাবস ডাঃ মল্লিক অপারেশনে ব্যস্ত। পাশে অনুরূপ পরিধেয়ে আবৃত দুজন এ্যাসিস্টেণ্ট ও তাদের পাশে দুজন নার্স।

রোগীর মাথার দিকে রোগীর মুখে মাস্ক ধরে বসে এ্যানাসথেটিস্ট্। পাশেই তার স্ট্যাণ্ডে নানা ঔষধের ছোট বড় শিশি ও গ্যাস এ্যাপারেটাস্।

একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিল শৈবাল। শর্বরী অপারেশন থিয়েটারে নেই। ডাঃ চৌধুরীর কেস নয় যখন, তখন শর্বরীও থাকবে না। ঘর হতে বের হয়ে এলো শৈবাল।

আবার করিডোর।

চর্মরোগ বিভাগ।

একবার উঁকি দিল শৈবাল দরজাপথে ডিপার্টমেণ্টে।

চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ভাদুড়ী রোগ দেখছেন, আর অনর্গল বকে যাচ্ছেন আশেপাশে ভিড় করে দণ্ডায়মান পঞ্চবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের। একজন রোগী এসে দাঁড়াল সামনে, দু'কষ বেয়ে তার লালামিশ্রিত জেনসন ভায়োলেটের বেগুনী ধারা নেমেছে।

কি ব্যাপার?

আজ্ঞে, এতদিন ওষুধটার ঠিক ব্যবহার হয়নি।

কি রকম?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বেগুনী ওষুধটা পায়ের ঘায়েই লাগিয়েছি, কিন্তু কাল দেখলাম কম্পাউণ্ডারবাবু খাবার শিশিতে দিয়ে দিলেন লেবেল এঁটে 'টু বি টেকেন'। খেয়ে নিলাম—দেখুন না, আজ অনেকটা আরাম বোধ করছি।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

পাশে চর্মরোগ বিভাগের টি. বি. রোগীর মত দেখতে নার্সটিও হি হি করে হেসে উঠলো।

শৈবাল ঘুরে দাঁড়াল।

ওয়ার্ড বয় রামস্বরেশ চিৎকার করছে,—হরিহর জানা কে, হরিহর জানা, হেমাঙ্গিনী ঘোষাল কে, হেমাঙ্গিনী ঘোষাল, ইত্যাদি।

এগিয়ে চলল শৈবাল আবার করিডোর দিয়ে।

বাঁ হাতে গলা, নাসিকা, কর্ণ বিভাগ। তার পাশেই অর্থপেডিক। কেউ কেউ প্লাস্টারে ত্রিভঙ্গ হয়ে, কেউ কোমর পর্যন্ত প্লাস্টার করে স্ট্রেচারে শুয়ে, কেউ হাতে, কেউ বুকে প্লাস্টার নিয়ে একজন রোগী দশজন এটেনডেণ্ট্ সহ ছত্রাকার হয়ে সমস্ত জায়গাটা জুড়ে আছে।

বহু কণ্ঠের একটা মিশ্রিত গোলমাল, বিশৃঙ্খলা—আগে দেখাবার জন্য ঠেলাঠেলি চলেছে।

অতগুলো লোকের চাপে গরমে যেন একটা ভয়াবহ ব্যাপার। কোনমতে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে শৈবাল অপারেশন থিয়েটারটার কাছাকাছি আসতেই একটি নারীকণ্ঠ কানে এলো।

গুড্ মর্ণিং ডাঃ ঘোষ।

গুড্ মর্ণিং—চোখ তুলে তাকাতেই শৈবাল সামনে একেবারে দেখতে পেল 'সস্টার মণিকুন্তলাকে। সার্জিকেলের স্টাফ নার্স।

এদিকে যে আর আসেনই না ডাঃ ঘোষ।

প্রয়োজন হয় না তাই আসি না। ডাঃ শর্বরী রায়কে দেখেছেন?

গোটা আটেকের সময় ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে তাকে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকতে দেখেছিলাম। তারপর আর দেখিনি তো!

ডাঃ চৌধুরী কোথায়?

তাঁর তো বোধ হয় ক্লাস আছে, লেকচার থিয়েটারের দিকে গেলেন ডাঃ সান্ন্যালের সঙ্গে দেখলাম।

হুঁ।—অন্যমনস্ক ভাবে শৈবাল আবার পা বাড়ায় সামনের দিকে।

চললেন নাকি? আসুন না কফি রেডি—

না ধন্যবাদ!

শৈবাল এগিয়ে চলল। সমস্ত বাড়িটায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও শৈবাল শর্বরীর দেখা পেল না।

মাত্র সাড়ে এগারটা। এত সকালে তো শর্বরী কখনো হাসপাতাল থেকে যায় না! এসময় কখনো বের হলে একমাত্র সে বের হয় প্রফেসার চৌধুরীর সঙ্গে। তাঁর তো এখন ক্লাস। তবে এত তাড়াতাড়ি গেল কোথায় শর্বরী!

তিনতলায় মতিশীল ব্লকে সামনের বারান্দায় ডাঃ বোস ছাত্রদের ক্লিনিকস্

দিচ্ছেন।

বয়স ষাটের উর্ধ্বে ডাঃ বোসের। অদ্ভুত বেশভূষা। গোড়ালির উপরে অন্ততঃ বিঘত খানেক ঢাকা পড়েনি, পরিধেয় কেনা বালিশের খোলের মত ক্রিজহীন প্যাণ্ট। গায়ে তদ্রূপ ছোট হাতা ওপেন ব্রেস্ট কোট। টাইয়ের বা বো'র কোন বালাই নেই। স্টীফ হয়ে একটি সরলরেখার মত দাঁড়িয়ে ছেলেদের ক্লিনিকস্ দিচ্ছেন ও মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করছেন।

কানে এলো শৈবালের ডাক্তার বসুর কণ্ঠস্বর : What was my question and what is your answer!

যাকে প্রশ্ন করা হলো সে আবার যেন কি জবাব দিয়ে গেল।

শৈবাল অন্যমনস্কভাবেই দাঁড়িয়ে অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

প্রফেসার বোস আবার বলেন, Have you finished?

ছাত্র কি যেন বলে।

প্রফেসার বোস পুনরাবৃত্তি করেন, Have you finished?

বিচিত্র একটি টাইপ প্রফেসর বোস।

মনে পড়ে শৈবালের একদিন প্রফেসর বোসের ক্লিনিকস্-এর সময় ফিসফিস করে পার্শ্বে দণ্ডায়মান শর্বরীর সঙ্গে একজন মোটা নার্সের চলন নিয়ে হেসে কি যেন বলছিল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে প্রফেসরের সেটা নজরে পড়ে যাওয়ায় তিনি বলেছিলেন, If you don't find any interest here, well, you can go wherever you like!

শর্বরী পরে তাকে বলেছিল, ছিঃ, তুমি দিন দিন যেন কি হয়ে যাচ্ছো শৈবাল!

॥ ৫ ॥

আবার এগিয়ে চললো শৈবাল। ঘুরতে ঘুরতে শৈবাল প্যাথলজী ডিপার্টমেণ্টে ঢুকল।

ডাঃ সেন একটা টেস্ট টিউবে রিএজেণ্ট ও ইউরিন ঢেলে সুগার টেস্ট করছিলেন। পদশব্দে মুখ তুলে শৈবালকে দেখে টেস্ট টিউবটা চোখের সামনে নাড়তে নাড়তে সহাস্যে বললেন, অসময়ে চাঁদের উদয় যে! পথ ভুলে নাকি হে!

বেয়ারা এসে এক পেয়ালা গরম চা এনে ডাঃ সেনের সামনে টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখল।

আর এক কাপ নিয়ে আয়, খেলন—

না থাক ! শৈবাল বলে।

ব্যাপার কি হে ! অমৃতে অরুচি ! বলতে বলতে সিগ্রেট কেসটা মেলে ধরলেন ডাঃ সেন শৈবালের সামনে।

কেস হতে একটা সিগ্রেট টেনে নিয়ে শৈবাল তাতে অগ্নিসংযোগ করলে।

নানা সলুশনের একটা মিশ্র কটু গন্ধ ঘরের বাতাসটা ভারী করে রেখেছে। ঘরের চারিদিকে র‍্যাকের সেল্‌ফে নানা আকারের ছোট বড় সব শিশি, তার মধ্যে লাল নীল হলুদ নানা রংয়ের সব পরীক্ষা করবার সলুশন ও রিএজেণ্টস্। আর সামনের টেবিলে মাইক্রোসকোপ, কাচের বিচিত্র সব পরীক্ষার নানা যন্ত্রপাতি।

হিমোসাইটোমিটার থেকে শ্লাইড চেম্বারে এক ড্রপ্ ব্লাড্ নিয়ে কভার শ্লিপ দিয়ে সেটা ঢাকতে ঢাকতে ডাঃ সেন বললেন, তারপর তোমার বিলেত যাওয়ার কতদূর ? প্যাসেজ পেয়ে গিয়েছো শুনলাম !

হ্যাঁ। সিগ্রেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া উদ্গিরণ করতে করতে মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় শৈবাল।

কভার শ্লিপ শ্লাইড্‌টার ওপরে চাপিয়ে শ্লাইডটা মাইক্রোসকোপের তলায় বসিয়ে আইপিসে একচক্ষু দিয়ে ফোকাস করতে করতে সেন আবার বললেন, জোড়েই যাচ্ছো তো !

দেখি—

একজন ছোকরা হাউস ফিজিসিয়ান ঘরে এসে প্রবেশ করলে।—তেরো নম্বর বেডের ডাঃ বোসের পেসেণ্টর ব্লাড শ্লাইড্‌টা দেখা হয়েছে স্যার ?

না। এইবার দেখে দেবো—কি কেস ?—মাইক্রোসকোপের আইপিসে চোখ রেখেই প্রশ্ন করলেন ডাঃ সেন।

ম্যালিগনেণ্ট্ ম্যালেরিয়া বলেই তো মনে হয়। রাইগার, ভমিটিং, হাই ফিভার।—একটু তাড়াতাড়ি পেলে ভাল হয় স্যার !

ব্যাপার কি হে ! এত তাড়া ?—সেন শুধাল।

একজন ডাক্তারের রিলেটিভ।

নির্দিষ্ট শ্লাইড্‌টা এবারে ট্যাপের নীচে ধরে স্টেন্‌টা ধুয়ে তুলে নিলেন ডাঃ সেন।

মাইক্রোসকোপে শ্লাইড্‌টা দিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, পজিটিভ হে, এম. টি. রিংয়ে ভর্তি শ্লাইড্।

হাউস ফিজিসিয়ান চলে গেল।

ডাঃ সেনও স্লাইড্‌টা একপাশে একটা সিঙ্কের মধ্যে ফেলে দিলেন অবহেলা-ভরে। সামনেই একটা স্ট্যাণ্ডের ওপরে তখনও অন্তত গোটা চল্লিশ স্লাইড্‌ পড়ে আছে।

দেখেছো একবার স্লাইডের বহর। ওর সঙ্গে আছে একগাদা ইউরিন, স্টুল, টি. সি., ডি. সি.—দুজনে কত দেখি—বিরক্তি প্রকাশ পায় সেনের কণ্ঠে।

শৈবাল হাসতে হাসতে বলে, তাতে আর কি। শেষ পর্যন্ত ফরমূলা তো আছেই।

মানে?

ব্লাডে—প্যারাসাইট্—এন্. এফ. ইউরিন—এস্. এ. পি. (সুগার, এলবুমেন, ফসফরাস্)—নিল্, ও স্টুলে—ও. পি. ওভা অর্থাৎ প্যারাসাইট্ ও সিস্ট নিল্ অর্থাৎ নেই।

তাই বুঝি ভাবো?

আমি ভাবতে যাবো কেন? দশজনে ভাবে তাই বললাম।

এতগুলো করে প্রত্যহ স্টুল, ইউরিন, ব্লাড একজনকে বসে বসে পরীক্ষা করতে হলে বুঝতে নিল্ (Nil) কেন হয়!

আরে চটছো কেন? বারোয়ারীমে ঐইসা হোতাই হ্যায়, বিশেষ করে এদেশে—

দেখো ঘোষ, চটো না। তোমাদের কর্তারা চান এক পয়সায় অক্রুর সংবাদ শুনতে। এত বড় একটা হাসপাতাল, তা এখানে না আছে পর্যাপ্ত ওয়ার্কিং হ্যাণ্ড্‌স্, না আছে পর্যাপ্ত সাজ-সরঞ্জাম। কিন্তু এও ঠিক তোমাদের তথাকথিত জনসাধারণ আমাদের সম্পর্কে যতখানি ভাবে ঠিক ততটা নয়। তারা একবারও ভাবে না আমরা মুষ্টিমেয় ডাক্তারের দল কতখানি over-burdened, কতখানি handicapped—

ঐ ডিপার্টমেণ্টের একজন কর্মচারী এমন সময় একগাদা টিকিট এনে ডাঃ সেনের সামনে রাখল।

বিভিন্ন আউটডোর থেকে ভিজিটিংরা রোগীদের রক্ত মলমূত্র থুতু ইত্যাদি পরীক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা তারিখ চায়। নিজ নিজ টিকিটে।

সেন লাল কালিতে টিকিটের ওপর তারিখ লিখতে লাগলেন খস্ খস্ করে একটার পর একটা—কারো পনেরো দিন, কারো কুড়ি দিন, কারো এক মাস পরে তারিখ পড়ে।

এই দেখো না, এত যে সব পরীক্ষার তারিখ দিচ্ছি এর মধ্যে হয়তো কতজনে

পরীক্ষার আগেই অক্কা পাবে, আবার কেউ কেউ হয়তো সেরে যাবে। কারো হয়তো ধৈর্যই থাকবে না দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর রেজাল্ট্‌ জানবার।

তা হোক। তবুও ওদের একটা সান্ত্বনা থাকবে ডাক্তার সাহেবরা চেষ্টা করছেন তাদের রোগ সারাবার, মৃদু হেসে শৈবাল বলে।

যাই বলো মনের দিক দিয়ে সেটাও কিন্তু একটা চিকিৎসা।

শৈবাল ঠিক বুঝতে পারে না সেন কথাটা পরিহাসচ্ছলে বললেন কিনা।

সে উঠে দাঁড়ায়।

চললে নাকি ?

হ্যাঁ। একটু কাজ আছে—

বিয়েটা করেই নিশ্চয় যাচ্ছো ?

সেই ইচ্ছাই তো আছে, কিন্তু একা তো আমার মতে হবে না।—

কতকাল আর পূর্বরাগ চলবে ?

চলুক না। আনন্দকে দীর্ঘস্থায়ী কয়জনে করতে পারে বল। বাঁধা পড়লেই তো চারপাশে গণ্ডি কাটা হয়ে গেল।

দেখো হে আনন্দ যেন আবার তিক্ত না হয়ে ওঠে বেশি টানাটানি করে দীর্ঘস্থায়ী করতে গিয়ে।

শৈবাল ডাঃ সেনের শেষের কথাগুলোর আর কোন জবাব দেয় না। বের হয়ে পড়ে।

॥ ৬ ॥

শৈবালের চেম্বার পার্কসার্কাসে।

রোগীর ভিড়ের চাইতে বন্ধুবান্ধবের ভিড়ই বেশি ; ডাক্তারী করার চাইতে বেশি হয় আড্ডা। কাপে কাপে চা আর প্যাকেট প্যাকেট সিগ্রেট।

টাকা উপার্জনের দিকে শৈবালেরও অবশ্য বেশী লক্ষ্য বা আকাঙ্ক্ষা নেই, কারণ প্রখ্যাতনামা ব্যারিস্টার পিতা দু হাতে অর্থ উপার্জন করেন। এবং একমাত্র পুত্র প্রতি মাসে মাসে যে অর্থটা উড়ায় তার জন্য ব্যারিস্টারের কোন দুশ্চিন্তাও নেই।

রাত আটটা নাগাদ একে একে বন্ধুরা সব বিদায় নেবার পর শৈবাল চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাবে এমন সময় সুইংডোর ঠেলে প্রবেশ করল শর্বরী।

চমকে ওঠে শৈবাল অপ্রত্যাশিতভাবে ঐ সময় শর্বরীকে প্রবেশ করতে দেখে।

একি! শর্বরী! তুমি—

অপ্রত্যাশিতই বটে। ইতিপূর্বে কখনো শর্বরী শৈবালের চেম্বারে আসে নি। পা দেয় নি।

কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে চেম্বারে শর্বরীর আগমনে শৈবাল যতই বিস্মিত হোক, তার চাইতেও বেশী বিস্ময় জাগে তার শর্বরীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঐ মুহূর্তে।

সমস্ত মুখে যেন এক ফোঁটা রক্তও নেই। ফ্যাকাশে মৃতের মুখের মত মনে হয়।

এগিয়ে আসে শৈবাল। শর্বরীর কপালে হাত ছুঁইয়ে দেখতে যায় ও বলে, শরীর অসুস্থ নাকি?

কিন্তু কপালটা সরিয়ে নেয় শর্বরী এবং ক্লান্তকণ্ঠে বলে, না।

তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে থাকে।

আজ সকালে হাসপাতালে খুঁজতে গিয়ে তোমাকে পেলাম না।

হ্যাঁ। ছিলাম না।

আবার স্তব্ধতা।

বলতেই হবে যা বলতে এসেছে শর্বরী। কিন্তু, কেমন করে কোথা হতে সে করবে শুরু। স্বল্পভাষিণী চিরদিনই শর্বরী। কিন্তু এই মুহূর্তের নির্বাক স্তব্ধ শর্বরী তো শৈবালের পরিচিত নয়। সংযত সে কিন্তু এমন মূক তো সে কোনদিনও নয়।

সংশয়ের দোলায় মন দুলতে থাকে শৈবালের। গত তিন বৎসর ধরে একান্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে তার সম্মুখে উপবিষ্টা ঐ মেয়েটির সঙ্গে। নিজে একান্ত নির্লিপ্তা থেকেও দুর্বার এক আকর্ষণে দিবারাত্র টেনেছে ঐ মেয়েটি তাকে।

হঠাৎ শৈবাল বলে, প্যাসেজ পাওয়া গিয়েছে শুনেছো?

না!—

দুটো প্যাসেজই বুক করেছি।

সেই কথাই বলতে এসেছি শৈবাল। যাবার আগে আমাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার।

সত্যি। সত্যি তুমি তাহলে এতদিনে মনস্থির করতে পেরেছো শর্বরী! আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে শৈবাল।

কিন্তু আরো একটা কথা আছে শৈবাল।

আরো কথা আছে?

হ্যাঁ—মেয়েমানুষ হয়েও বলতে হচ্ছে কথাটা—একটু থামে শর্বরী। তারপর

মনের সমস্ত শক্তি একত্রীভূত করে কোনমতে যেন চরম কথাটা উচ্চারণ করে, I am carrying.

কি বললে? চমকে যেন শর্বরীর মুখের দিকে নিজের অজ্ঞাতেই তাকাল শৈবাল।

হ্যাঁ।

তাহলে?

তাই তো যে বিবাহের জন্য এতদিন তুমি আমাকে তাগিদ দিয়েছো কিন্তু আমি কান দিই নি—আজ সেই বিবাহের কথা আমাকে যেচে নিজমুখে পাড়তে হলো! তোমার, আমার ও আমাদের সন্তানের কথা ভেবে এখন যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের বিবাহটা রেজিস্ট্রি করে ফেলতে হবে।

কিন্তু—

কি?

বলছিলাম এ অবস্থায় বিয়ে—

তার মানে?

আমায় ভুল বুঝো না শর্বরী! Please। বিবাহ তোমাকে আমি নিশ্চয়ই করবো এবং সেজন্য আমি নিজে কতখানি আগ্রহান্বিত সেও তুমি জান। কিন্তু এ অবস্থায়—

কি বলছো শৈবাল?

হ্যাঁ। শোন। বিয়েই করি আমরা আর যাই করি, বিয়ের কয়েক মাস বাদে যদি তোমার সন্তান হয়, সমাজ বা আমাদের পরিচিত জনেরা কেউই ঘটনাটা উদারভাবে তো গ্রহণ করবেই না, ঐ সঙ্গে এও বলবে, কতকটা বাধ্য হয়েই, আমরা এ অবস্থায় পড়েছি বলেই আমাদের পরস্পরকে বিবাহ-বন্ধন মেনে নিতে হয়েছে। আড়ালে আমাদের নিয়ে বন্ধুবান্ধবেরা চাপা হাসি হাসবে। না, সে আমি সহ্য করতে পারবো না। তার চাইতে let us finish that first and then!—

শৈবাল! আর্তনাদের মতই ডাকটা শোনা যায় যেন শর্বরীর।

অবুঝ হয়ো না শর্বরী। বুঝে দেখো। আমি কিছু অন্যায় বলছি না। সান্যালকে বলবো, আমার এই চেম্বারেই—

না! ছিঃ! অবিমিশ্র ঘৃণায় ও বিরক্তিতে শর্বরীর কণ্ঠস্বরটা যেন বুজে আসতে চায়।

শর্বরী! ভেবে দেখো কোনো অন্যায় প্রস্তাব করিনি আমি। বন্ধুবান্ধবদের

কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু আজ যদি এখন আমরা বিবাহ করি তুমি বা আমি কেউ কি বহু আকাঙ্ক্ষিত ঐ আনন্দের ব্যাপারটাকে পরিপূর্ণ খুশির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবো ? অদৃশ্য কাঁটার মত এই ক্ষতটা কি থেকে থেকে আমাদের উভয়কেই পীড়ন করবে না আমাদের মিলনের আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ?

তোমার কথা বলতে পারি না : কিন্তু আমার দিক দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো শৈবাল।

তাই বা কেন বলছো ? নিজের কথাটাই বা ভুলে যাচ্ছো কি করে ? কই এতদিন এত সাধ্যসাধনা করেও তো তোমায় বিবাহে রাজী করাতে পারিনি। আজ যে নিজে যেচে এসেছো সেও একান্ত বাধ্য হয়েই নিজের তাগিদেই নয় কি ? তাতে করে আমারও তো পরে মনে হতে পারে ঠিক এমনটি না হলে এত সহজে তুমি এগিয়ে আসতে না। তোমাকে পাওয়াটাও আমার একটা দৈবাৎএর ব্যাপার।

শর্বরী জবাব দিতে পারে না শৈবালের কথার। চুপ করেই থাকে।

সত্যিই তো। এতদিন মত দিতে পারেনি তো সে।

কিন্তু কেন ? কেন মত দিতে পারেনি ? সংসারের কথা ভেবেই না মত দিতে পারেনি। আর আজও নেহাত অনন্যোপায় বলেই না এমন নির্লজ্জের মতো তাকে এগিয়ে আসতে হলো।

এমনি করে ভিক্ষুকের দৈন্যে শৈবালের সামনে কোনদিন এসে দাঁড়াতে হবে কখনো স্বপ্নেও কি শর্বরী ভেবেছে। আর ভেবেছে কি এমনি করে শৈবাল তাকে জানাবে প্রত্যাখ্যান !

শর্বরী।

শর্বরী সাড়াও দেয় না, মাথাও তোলে না। মুখ নিচু করে বসেই থাকে পাষাণপ্রতিমার মতো।

আর দেরি করা ভালো না। ও কাঁটা তুলে ফেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসো আমরা বিয়েটা রেজেষ্ট্রি করে নিই।

কাঁটা ! তার সন্তান এখন কাঁটা ! তাকে তাই হত্যা করতে হবে। ভ্রূণ-হত্যা। স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় হত্যা। ক্রিমিন্যাল এভরসন, হোমিসাইড্ ! হ্যাঁ, তাই বৈকি।

কাল রাত্রেই না মেয়েটিকে শর্বরী উপদেশ দিয়েছিল ! মেয়েটি তার অবৈধ সন্তানকে গর্ভে নিয়ে গঙ্গার জলে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল বলে ! আপন গর্ভজাত সন্তানকে কোন পরিচয় দিতে পারবে না বলেই না সন্তানকে ও সেই

সঙ্গে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিল মৃত্যুকে বরণ করে অভাগিনী জননী!

শর্বরী তাকে ছি ছি করেনি! বলেনি তাকে এ শুধু অন্যায় ও পাপই নয়, দুর্বলতা! অন্যায়ের কাছে ভীরু অপরাধীর মত মাথা নত করা!

আর সেই তাকে আজ সেই অন্যায় ও ভীরুতাকে মাথা নত করে মেনে নিতে হবে!

তাহলে সেই কথাই রইলো শর্বরী। পরশুই রাত্রে—

শর্বরী বসে থাকে। শৈবালের কোন কথাই যেন তার কানে যাচ্ছে না। সে যেন বধির। সামনের দেওয়ালের গোল ঘড়িটা ঢং ঢং করে রাত্রি নয়টা ঘোষণা করল।

সহসা শর্বরী যেন তার সমস্ত সংশয় ও দুর্বলতাকে জয় করে বলে উঠলো, না।

না কেন। তুমি নিজেও তো একজন ডাক্তার শর্বরী! তুমি তো জান কোন ভয় বা আশঙ্কার কারণ নেই। আধ ঘণ্টার ব্যাপার মাত্র।

সে কথা নয়। নিজের গর্ভস্থ সন্তানকে এভাবে নষ্ট করতে পারবো না শৈবাল। তার চাইতে চল আমরা কাল-পরশুর মধ্যেই বিবাহটা রেজেষ্ট্রি করে ফেলি!

আহা! সে তো হবেই। বিবাহ তো আমাদের হবেই। কিন্তু আগে ঐ কাঁটাটা সরিয়ে তারপর। তাছাড়া আরো একটা কথা দেখো শর্বরী। যদি ওটা নষ্ট না করো তাহলে এ অবস্থায় তোমার বিলাতে যাওয়াও তো সম্ভব নয়।

আমি এখানে থাকবো, তুমি একাই যাবে।

এত আশা করে আছি দুজনে একসঙ্গে যাবো। তাই কখনো হয়।—লক্ষ্মীটি! আমার কথা শোন। অমত করো না।—লোকে সারাটা জীবন ধরে এই ব্যাপার নিয়ে ইঙ্গিত করবে। না, সে অসহ্য!

কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি! পরস্পর আমরা পরস্পরের কাছে তো ঠিক থাকবো। আমরা তো জানবো আমাদের এই সন্তানের জন্মের ব্যাপারটার মধ্যে কোন অন্যায় পাপ বা মিথ্যা ছিল না!

তবু মানুষের মুখকে তুমি চাপা দিতে পারবে না!—

শৈবালের ঈদৃশ একগুঁয়েমিতে কেন না জানি শর্বরীর সমস্ত দেহ ও মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। নিজেকে সে আর সংযত রাখতে পারে না। বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠেই বলে ওঠে, বার বার তো তোমায় আমি সাবধান করেছি শৈবাল কিন্তু কোন কথায় তুমি আমার কান দাওনি—

কিন্তু এরকম যে একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছে, তোমারও আরো আগে

আমাকে জানানো উচিত ছিল না কি?

জানাবো কি! ভাল করে নিজেই বুঝতে পেরেছি কি! কুণ্ঠায় ও লজ্জায় শর্বরীর গলার স্বরটা যেন জড়িয়ে আসে।

তা এখনই বা স্থিরনিশ্চিত হলে কি করে! সন্দেহ তোমার মিথ্যেও তো হতে পারে!

না, না—মিথ্যে নয়। প্রফেসর চৌধুরী—কথাটা শেষ করতে পারে না শর্বরী। থেমে যায়।

বল কি! শৈবালের বিস্ময়ের যেন অন্ত থাকে না। প্রফেসর চৌধুরীকে দিয়ে তুমি নিজেকে কী পরীক্ষা করালে! লজ্জা করলো না?

সে সময় তাও বুঝি আমার ছিল না। গত একটা মাস কি ভাবে যে আমার কেটেছে যদি জানতে।

ছি, ছি! এ তুমি কি করলে, বল তো শবী! সারা সংসারে এখন আর কারোরই ব্যাপারটা জানতে বাকী থাকবে না! কাল তুমিই বা হাসপাতালে মুখ দেখাবে কি করে, আর আমিই বা সকলের সামনে বের হবো কি করে!

প্রফেসর চৌধুরীকে তুমি চেন না শৈবাল। তাই ওকথা বলছো। কিন্তু আমি তাঁকে চিনি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। শর্বরীর কণ্ঠস্বরটা সহসা কেমন যেন স্পষ্ট ও সতেজ মনে হয়।

হুঁ! মানুষ চেনা যদি এত সহজ হতো শবী! এ জগতে কোন্ মানুষ যে কি পারে, আর কোন্ মানুষ কি পারে না যদি জানতে—

শৈবালের মনের অসন্তোষ যেমন ধাপের পর ধাপ বেড়েই চলে, তেমনি ঐ সঙ্গে একটার পর একটা সিগ্রেট সে পুড়িয়ে শেষ করে চলে।

নিজেকে কোনদিন কখনো কোন কারণে কারো কাছে এতখানি নিচে টেনে নামাতে হবে, এ শর্বরীর যেন চিন্তারও অগোচর ছিল। বিশেষ করে যার কাছে সে জানত তার দাবী স্বতঃসিদ্ধ, সেখানে ভিক্ষুকের দৈন্য নিয়ে দাঁড়াবার পর এই ধরনের জবাবদিহির মত মর্মান্তিক ব্যথা বোধ হয় আর কিছু নেই।

সত্যিই আর দাঁড়াতে পারছিল না শর্বরী। তাই শেষ কথা কটা কোন মতে উচ্চারণ করে গেল, তাহলে তুমিই একটা তারিখ ঠিক করে এই সপ্তাহের মধ্যেই কোর্টে নোটিশ দিও। আমি চললাম। এবং কথাগুলো শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা না করে সোজা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মনের মধ্যে যত অনিচ্ছা ও অসন্তোষই থাক শর্বরীর সেদিনকার শেষ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত কোন যুক্তিই শৈবাল মনের মধ্যে এনে দাঁড় করাতে পারল না। এবং পরের দিন হাসপাতালে শর্বরীর সামনাসামনি দুবার গিয়েও বোধ হয় তাই কোন কথাই বলতে পারলে না শেষ পর্যন্ত। অবশেষে কি ভেবে তার পরদিন গিয়ে রেজেষ্ট্রি অফিসে নোটিশ দিয়ে এলো। এবং তার দিন দুই পরে তাদের রেজেষ্ট্রি মতে বিবাহ হবে স্থির হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ঘটে গেল। এবং ঠিক হলো, বিবাহে তাদের সাক্ষী থাকবে শৈবালের কলকাতার কেউ পরিচিত বন্ধু নয়, পাটনায় তার এক বন্ধু চাকরি করতো তাকে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছিল—সে। আর শর্বরীর দিকে সাক্ষী থাকবে তার এক বান্ধবী—শিক্ষয়িত্রী; ওদের মীনুদি, মীনাক্ষী।

কাল ওদের বিবাহ। রাত্রে হোটেলে একটা নৈশ ভোজ হবে, ওদের দুজন সাক্ষীকে নিমন্ত্রণ করে দুজনে শৈবালের গাড়িতেই বিকালের দিকে তার চেম্বারে এসে উঠলো।

একান্ত তার নিজের অনিচ্ছাতেই এবং বিশেষ করে শর্বরীকে প্রতিরোধ করবার মত সত্যিকারের কোন যুক্তি খুঁজে না পাওয়ার জন্য ও কিছুটা নিজের পৌরুষের ভ্যানিটিতে আঘাত লাগবার জন্য গত চার-পাঁচ দিন ধরে অনুক্ষণ যে নিরুপায় অর্থহীন অসন্তোষের আগুনটা মনের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলছিল সেটা আর শৈবাল যেন কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। শর্বরী তাদের প্রেমের চাইতে চিরন্তন সমাজ সংস্কারকেই প্রাধান্য দিল এবং সে যে শর্বরীর কাছে হেরে গিয়েছে এটাই তাকে যেন আরো পীড়ন করছিল ভিতরে ভিতরে বেশী করে।

চেয়ারে বসে একটি সিগ্রেট ধরিয়ে শৈবাল বললে, নিশ্চিন্ত হয়েছ তো এবারে। উঃ মেয়েজাতটা চিরদিন একটু বেশী রকম অসহিষ্ণু জানতাম কিন্তু তুমিও যে তার ব্যতিক্রম নও—

চিরন্তন নারীমনের সহজাত দুর্বলতার জন্য শৈবালকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসা সত্ত্বেও যে সে তার প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারছিল না সেই কারণেই শর্বরীও এই কটা দিন নিজের মনে অনুক্ষণ একটা লজ্জা ও দৈন্যের পীড়ন অনুভব করেছে। এবং এই বিবাহের ব্যাপারে বাবার সঙ্গে যে তার একটা বোঝাপড়া অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে তাও সে জানত। কাজেই মনের অবস্থা তারও খুব প্রসন্ন ও শান্ত ছিল না। তাই শৈবালের ঐ আকস্মিক বক্রোক্তিতে সে যেন হঠাৎ তীব্র একটা কশাঘাত খেল। রুক্ষ কণ্ঠেই সে বলে উঠলো, কি! কী বললে?

হ্যাঁ তাই! নইলে আজকের দিনে সামান্য ঐ কারণে তোমার অসংযত জেদাজেদি—

কি বললে। সামান্য কারণ! পুরুষ বলেই কথাটা হয়তো তোমার মুখে আটকাল না শৈবাল।

তাছাড়া আর কি! তুমি জান বরাবর আমার জীবনের স্বপ্ন কি। নিজের নার্সিংহোম ও রিসার্চ ল্যাব্রেটারী করে সেখানে দুজনে কাজ করবো, সর্বক্ষণ তুমি থাকবে আমার পাশেপাশে বলেই এ সময়টা তুমি সন্তান নিয়ে বিব্রত থাক আমি চাই নি। নইলে সন্তান আমিও চাই। অথচ সেই দিক দিয়ে তুমি আমাকে বিচার করতে পারলে না। তুচ্ছ একটা মেয়েলী সংস্কারের লজ্জাটাই হলো তোমার কাছে বড়—

শৈবাল।

হ্যাঁ—আর আমার তোমার প্রতি দুর্বলতাটা তুমি জান বলেই সেই তুচ্ছ সংস্কারের জন্য আজ তুমি আমাকে এভাবে ফোর্স করতে পর্যন্ত—

শৈবালের কথায় শর্বরীর যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটে মুহূর্তে। এবং সঙ্গে সঙ্গে শৈবালের শেষের কথায় ঘুরে দাঁড়াল, কি বললে, ফোর্স। তোমাকে আমি ফোর্স করে—কথাটা শর্বরী শেষ করতে পারে না। বুকের ভিতরটা যেন তার দুঃসহ লজ্জায় ও অপমানে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে তখন।

শৈবালও যে তখন বুঝতে পারছে না তা নয় কিন্তু সেও তখন ক্ষিপ্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়, তা নয় তো কি। নিজেও কি তুমি সে কথাটা বুঝতে পারছো না!

প্রচণ্ড ও আকস্মিক একটা লজ্জা, অপমান ও অভিমানের ঝাপটায় মুহূর্তে সৌজন্যের শেষ প্রাচীরটুকুও যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল পরস্পরের মধ্যে। দু চোখের দৃষ্টি শর্বরীর জলে ঝাপসা হয়ে এল। বেদনা-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শর্বরী বললে, ভালোই করলে শৈবাল তোমার মনের সত্যকার রূপটা আমার চোখের সামনে মেলে দিয়ে। এক পক্ষে এ ভালোই হলো যে জীবনভোর একটা ভুলের বোঝা দুজনে বয়ে বেড়ানোর চাইতে গোড়াতেই সব নিষ্পত্তি হয়ে গেল। মিথ্যে আর তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। আচ্ছা, আমি চললাম। শর্বরী সত্যিসত্যিই দরজার দিকে অতঃপর এগিয়ে গেল। শৈবাল ডাকল, শর্বরী!

হ্যাঁ। তোমাকে আমি সমস্ত দায়িত্ব হতে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি শৈবাল চিরদিনের মতই। বলতে বলতে আরো এগিয়ে যায় শর্বরী।

তা বৈকি! থাক। অতখানি ঔদার্য ও সৌজন্য এখন আর তোমার না দেখালেও চলবে। তারপর দশজনের কাছে দশ কথা আমার নামে বলে বেড়াও

আর কি ! মেয়েমানুষ তোমাদের আর চিনতে বাকী নেই। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে শৈবাল বলে।

শৈবালের আকস্মিক নিষ্ঠুর শেষের কথাগুলো উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আচমকা চাবুক খাওয়ার মতই ঘুরে দাঁড়াল শর্বরী, কি ? কি বললে, আমি দশজনের কাছে দশ কথা বলে বেড়াবো তোমার নামে !

শৈবালের মাথার মধ্যেও তখন যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। সে সমান তেজের সঙ্গে প্রত্যুত্তর দেয়, হ্যাঁ—তুমিই বলে বেড়াবে। তোমরা মেয়েরা সব পারো। তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু দোষ কি যত কিছু একা আমারই ছিল। কচি খুকীটি তো একেবারে তুমি নও—

কুৎসিত ক্লেদাক্ত একটা অনুভূতি ও প্রচণ্ড ঘৃণায় শর্বরীর সমস্ত শরীর ও মন যেন ঘিনঘিন করে ওঠে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, থাম, থাম—ছি ছি। লজ্জায় ঘৃণায় মাটির সঙ্গে যে আমার মিশে যেতে ইচ্ছা করছে। শৈবাল! তুমি! তুমি শেষ পর্যন্ত কিনা এমন কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে। শেষের দিকে অশ্রুতে শর্বরীর চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে যায়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নেয় শর্বরী। এখানে চোখের জল ফেলাও অপমান।

একপ্রকার টলতে টলতেই শর্বরী ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়াল।

শৈবালও তখন যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শেষ আঘাত হানতেও সে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না। বলে, যাচ্ছো তো, কিন্তু যা হয়ে গেছে সে ফেরাবে কেমন করে ?

ঘুরে দাঁড়াল শর্বরী অকম্পিত স্থির দৃষ্টি তুলে শৈবালের দিকে।

ভয় নেই। মনে করবো আজ থেকে সবটাই আমার জীবনের একটা দুর্ঘটনা মাত্র। কাউকেই কিছু জানাবো না। এত বড় মিথ্যাকে আর যেই স্বীকার করুক, জেনো, আমি কোনদিনই করবো না।

তাই নাকি ! কিন্তু তোমার গর্ভের সন্তান !

সন্তান, সে যদি পারে তো আমার পরিচয়েই বেঁচে থাকবে। তোমার পরিচয় নিয়ে তার দাঁড়াবার আগেই যেন তার—হ্যাঁ তার মৃত্যু হয়, যেন তার মৃত্যু হয়।

আর দাঁড়াল না শর্বরী। খোলা দরজাপথে এগিয়ে গেল দৃঢ় অকম্পিত পদবিক্ষেপে।

কোথা হতে মুহূর্তে কি ঘটে গেল, এবং শর্বরী ঘর ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র পরিস্থিতিটার গ্লানি ও আক্ষেপে মুহূর্তে শৈবালের মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা

নাড়া দিয়ে উঠল। উত্তেজনার মুখে অকস্মাৎ রাগের মাথায় এ সে কি করে বসল। ক্ষণপূর্বের সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা ‍দুর্নিবার লজ্জায় তাকে ছি ছি করে উঠলো। হঠাৎ সে যেন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, এবং সঙ্কোচ ও লজ্জায় কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ অনড় হয়ে বসে থেকে সহসা সে চেয়ার হতে উঠে পড়ে খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল, শর্বরী! শোন! শোন—ফের! ফের। দাঁড়াও!

শর্বরী তখন টলতে টলতে সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমস্ত দেহটা তার তখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

সে সিঁড়ির উপর থেকে শৈবালের ডাক শুনেও যেন শুনতে পেল না।

শৈবাল দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চেঁচাতে লাগল, শর্বরী! শোন! শোন! দাঁড়াও!

তবু শর্বরী দাঁড়ায় না। দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে।

ঝড়ের বেগেই কোনমতে সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে ঠিক একেবারে দরজার কাছাকাছি এসে শৈবাল শর্বরীর পথ রোধ করে দাঁড়াল, শর্বরী!

এবং সাগ্রহে শর্বরীর ডান হাতটা চেপে ধরে শৈবাল।

ধীরে ধৃত হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মৃদু ধীর শান্ত কণ্ঠে শর্বরী বললে, না শৈবাল! আর তা হয় না।

শর্বরী!

না। এ ভালোই হলো শৈবাল; এই ভালো হলো যে এত সহজে সত্যের চরম মীমাংসা হয়ে গেল।

তবু শৈবাল বলে, শর্বরী শোন!

না! দুঃখ করো না শৈবাল! তুমি আমাকে না চিনতে পারলেও তোমাকে আজ আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু আগে এ কথাগুলো বললে মিথ্যে তোমাকে আজকের এই কষ্টটা পেতে হতো না। তাছাড়া এখন বুঝতে পারছি ভবিতব্যকে কেউ এড়াতে পারে না।

শর্বরী আবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

শর্বরীর একান্ত শান্ত ব্যবহার, তার কথাবার্তা, বিশেষ করে ঐ মুহূর্তে তার কণ্ঠস্বর শৈবালকে সত্যিই বিচলিত করে তোলে।

দীর্ঘ গত তিন বৎসর ধরে শৈবাল একান্ত ঘনিষ্ঠভাবেই ঐ মেয়েটিকে দেখছে। কিন্তু স্বল্পভাষিণী ঐ মেয়েটির চরিত্রের মধ্যে যে একটা ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা আছে, যেখানে সে দুর্ভেদ্য, সেটার পরিচয় পূর্বে শৈবাল কোন দিন

আজকের মত বুঝি পায়নি।

তাই সে আবার ডাকে, শর্বরী !—

শর্বরী আবার ফিরে দাঁড়াল, বল !

সত্যিই তা'হলে তুমি চলে যাচ্ছ ?

মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় শর্বরী, হ্যাঁ !

তাহ'লে আমাদের শেষ !—

হ্যাঁ।

শৈবাল যেন মরিয়া হয়ে ওঠে, কিন্তু তোমাকে যদি আমি না যেতে দিই !

তুমি কি শর্বরীকে ভুলে গেলে শৈবাল। কিন্তু আমার কথা যদি শোন তবে যাবার আগে এইটুকুই তোমায় বলে যাই, জোর-জবরদস্তি করবার চেষ্টা আর করো না, তাতে কেবল কাদাই ছিটোবে। তার চেয়ে ভুলে যাবার চেষ্টা করো আজকের ঘটনাটা। মনে করো এটা দুঃস্বপ্ন—

কিন্তু তোমার গর্ভে যে সন্তান তার পরিচয় ?

নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তাছাড়া এই তো একটু পূর্বে বলে এলাম তোমাকে, তার পরিচয়ের জন্য কোনদিন তোমাকে টানাটানি করবো না। সে যদি পারে তো তার নিজের পরিচয়েই বাঁচবে।—আচ্ছা চলি—

শর্বরী অচঞ্চল পদে বাকী সিঁড়িগুলো একের পর এক অতিক্রম করে চলে গেল।

নির্বাক নিশ্চল শৈবাল দাঁড়িয়ে রইলো একাকী খোলা দরজার সামনে।

॥ ৮ ॥

গত চার-পাঁচ দিন অহোরাত্র যে চিন্তা ও ভাবনার ঝড় বইছিল শর্বরীর মনের মধ্যে, সব যেন থেমে গিয়েছে। শর্বরী ফুটপাত ধরে হেঁটে চলে। শৈবালের সঙ্গে এই বিবাহের ব্যাপারে আলোচনার শুরু হতেই শৈবালের কথায়-বার্তায় যে দৈন্য নিজের মধ্যে অহরহ তাকে কাঁটার মত ক্ষত-বিক্ষত করছিল তা হতে যেন সে মুক্তি পেয়ে বেঁচে গেল।

অনেকখানি নেমে এসেছিল শর্বরী। তার আগত সন্তানের দুশ্চিন্তার চাইতে গত করেকদিন ধরে শৈবালের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে তার কথাগুলোই শর্বরীর মনের মধ্যে তোলপাড় করে ফিরছিল। শুধু মাত্র তুচ্ছ হতেও তুচ্ছ বলতে গেলে প্রায় অর্থহীন মনগড়া কলঙ্কের ভয়েই শৈবাল তাদের সন্তানকে হত্যা করতে চেয়েছিল, বিশেষ করে যে সন্তানের জন্য সমভাবে উভয়েই দায়ী

এবং এখন যার যাবতীয় দায়িত্বটুকু ও কলঙ্ক যদি রটেও শর্বরী সানন্দে স্বেচ্ছায়ই বহন করতে রাজী ছিল, কথাটা সর্বতোভাবে জেনেও শৈবাল এমন করে রূঢ়তম আঘাত তাকে দিতে পারলো। আশ্চর্য। সেই শৈবাল। প্রেমকে শৈবাল স্বীকৃতি দেবে কিন্তু প্রেম শ্বেতকমলের মতই হবে শুভ্র। কিন্তু সেই প্রেমের পূর্ণ পরিণতি বা বিকাশ কি সেই প্রেমজাত সন্তানের মধ্যেই নয়? তবে কেন বুঝলো না শৈবাল সে কথাটা। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় শৈবাল চিরন্তন পুরুষ, পুরুষের প্রেম আর নারীর প্রেম তো একবস্তু নয়। তাই এমনি করে বুঝি অপমানিত করতে পারলো সে তাদের এতদিনের প্রেমকে, এত বড ভালবাসাকে তাদের। আর বোধ হয়, সেই কারণেই সেদিন যে কথাটা সে স্বীকার করতে পারেনি আজ অন্তরের আক্রোশে উচ্চারিত হয়েছে সেই স্পষ্টোক্তিটা এত সহজে।

আশ্চর্য! শৈবাল নিজের দিকটাই শুধু দেখলে। শর্বরীর কথাটা একবারও কি তার মনে এল না! দুঃখ বেদনা কলঙ্কের যে সমভাগ নেওয়ার জন্যই শর্বরীও প্রস্তুত ছিল, সেটা শৈবালের চোখেই পড়ল না।

এতদিনকার ভালোবাসা, জানাজানি, প্রীতির সম্পর্ক তুচ্ছ একটা স্বার্থের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে গেল এত সহজে। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে শর্বরী ফুটপাত ধরে হেঁটে চলল।

আশেপাশের চলমান জনতা, পথের ধারে আলোকিত বিপণী, যানবাহনগুলো শর্বরীর মনের মধ্যে কোন রেখাপাত করে না।

মুক্তি দিয়ে এল সে শৈবালকে চিরদিনের মতোই। এবার সে একা। সম্পূর্ণ একা। যে আকস্মিক পরিস্থিতিটা কয়েকদিন পূর্বে তাকে মূহ্যমান ও বিহ্বল করে ফেলেছিল এবং যা হতে মুক্তি পেতে চেয়েছিল সে বিবাহবন্ধনের মধ্য দিয়ে শৈবালকে সাথী করে, নূতন করেই আবার সেটা শর্বরীর মনের মধ্যে এসে উদয় হয়, শৈবালের চেম্বার হতে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সেই বিবাহের সকল সম্ভাবনাকেই স্বেচ্ছায় চিরতরে একেবারে মুছে দিয়ে এসে।

আজ তার যে সন্তান ভ্রূণের আকারে গর্ভের মধ্যে অবস্থান করছে, জৈবিক নিয়মে ক্রমে সে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়। তাকে সে স্বীকৃতি দেবেই শৈবালকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে একমাত্র তার নিজের সন্তান বলেই। মনস্থির সে করছে। শৈবালের দ্বারস্থও আর সে হবে না এবং হত্যার দ্বারাও নিজেকে সে ছোট করবে না। কিন্তু তারপর? সমাজ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব— সমাজ আর তার চিরদিনের সংস্কার! পিতৃপরিচয়হীন সন্তান! শুধু সেই

সন্তানেরই ব্যর্থতা নয় সেই সঙ্গে সেই সন্তানের মাতৃত্বেরও দুরপনেয় কলঙ্ক। অযাচিত দৈন্য ও দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট, ব্যর্থতায় ক্লিষ্ট হাজার হাজার পথ-ভিক্ষুকের সন্তানকেও সমাজ মেনে নেবে কিন্তু মেনে নেবে না তার আজকের অনাগত সন্তানকে। কিন্তু কেন, কেন? সামান্য দুটো মন্ত্রোচ্চারণ হয়নি বলেই কি তাদের এত বড প্রেমজ সন্তানের জন্মটাই ব্যর্থ। কোন স্বীকৃতি দেবে না সমাজ! প্রজননের সমস্ত স্বীকৃতিই কেবল তুচ্ছ কয়েকটা মন্ত্রের মধ্যেই। এই অন্ধ কুসংস্কার নিয়েই মানুষ চিরদিন মনের ভালবাসা আর স্বীকৃতিকে করবে অস্বীকার, করবে অপমান! কিন্তু ঐ সমাজের দায়িত্ব ছাড়াও আর একটা কথা মনে পড়ে ঐ মুহূর্তে শর্বরীর, তার বাপ—শেখরনাথ।

শেখরনাথ যখন কৈফিয়ত চাইবেন, কি কৈফিয়ৎ সে দেবে?

তিনি যখন জানতে চাইবেন তার সন্তানের পিতৃপরিচয়। কি পরিচয় সে দেবে!

কে সন্তানের পিতা। কে তার সন্তানের পিতা!

তবে কি আবার সে শৈবালের কাছেই ফিরে যাবে?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ জানায, না! না। না—প্রচণ্ড ঘৃণায় শরীরটা যেন ঘিনঘিন করে ওঠে।

হ্যাঁ, বলতে হবে। বাবার কাছে সবই খুলে বলতে হবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে সামনাসামনি সে বলতে পারবে না। যা বলবার সে লিখেই জানাবে।

শৈবাল তার কেউ নয়। কোন সম্পর্কই নেই তার শৈবালের সঙ্গে।

কিন্তু আর হাঁটতে পারছে না শর্বরী, ক্লান্ত শরীর যেন পথের উপরেই এলিয়ে পড়তে চায়।

ঠুং ঠাং শব্দ করে একটা খালি রিকশা চলছিল। সেই রিকশাটাই ডেকে থামিয়ে উঠে বসল শর্বরী। রাত প্রায় পৌনে এগারোটায বাসার সামনে রিকশা হতে এসে নামল শর্বরী। সমস্ত পাড়াটা যেন এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। চারিদিক-নিঝুম হয়ে এসেছে।

রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজার কড়া নাড়ল শর্বরী।

একটু পরে দরজাটা খুলে গেল। খোলা দরজার উপরে দাঁড়িয়ে ছোট বোন আলো।

সেই সকালে বের হয়েছিস, কোথায় ছিলি রে দিদি? বিকেলের দিকে আমার এক বান্ধবীর আত্মীয়াকে তোদের হাসপাতালে লেবার ওয়ার্ডে ভর্তি করতে গিয়েছিলাম। শুনলাম তুই আজ মোটেই হাসপাতালে যাস্ নি—

শর্বরী কোন জবাব দেয় না। আলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় নিঃশব্দে।

দিদির অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় একটু যেন বিস্মিত হয়েই সদর দরজাটায় খিল তুলে দিয়ে আলো শর্বরীকে অনুসরণ করে।

চেয়ারের ওপরে বসে ছিলেন শেখরনাথ। তাঁর কানে আলোর সমস্ত কথাগুলোই গিয়েছিল। শর্বরীরই একটা 'ডায়েট' সম্পর্কীয় মোটা বই নিয়ে পড়ছিলেন। আলোর কথাগুলো শুনেই বইটা বন্ধ করে শর্বরীর পদশব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন।

ঘরের সামনে শর্বরীর পদশব্দ পেয়েই ডাকলেন, শর্বরী!

শেখরনাথকে শর্বরী উপেক্ষা করতে পারলে না। মন্থর পায়ে খোলা দরজাপথে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই কিন্তু শেখরনাথ চমকে উঠলেন। কয়েকটা মুহূর্ত একটি কথাও বলতে পারলেন না। নীরবে শুধু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই রইলেন।

সর্বস্ব হারানোর বেদনা যেন শর্বরীর সমগ্র মুখখানা ব্যেপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শর্বরীও কোন কথা বলে না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

কাছে আয় তো মা!—বহু কষ্টে যেন শেখরনাথ কথাটা উচ্চারণ করলেন।

এগিয়ে এসে শর্বরী শেখরনাথের পাশে খালি চেয়ারটার ওপরে বসল। কোলের উপরে ন্যস্ত শর্বরীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন শেখরনাথ।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

আজ বুঝি হাসপাতালে যাস্ নি মা?—

না।—

ঘণ্টাখানেক আগে শৈবাল এসেছিল তোর খোঁজে।—তার কথাবার্তায় মনে হলো সে যেন বড় চিন্তিত!

বাবা?—

হঠাৎ কন্যার ডাকে শেখরনাথ যেন চমকে ওঠেন। কন্যার মুখের দিকে তাকালেন বাপ।

কি রে?—

তোমার কাছে কোন দিন কোন কথা আমি গোপন করিনি বাবা। কেবল একটা কথা—কথাটা শর্বরী শেষ করতে পারে না। হঠাৎ বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন তার কণ্ঠ রোধ করে ফেলে।

আজকে তোকে বড্ড পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে মা। আজ থাক। কাল শুনবো

তাছাড়া আমি তো আমার মেয়েকে জানি। আমার মেয়ে কোন অন্যায়ই করতে পারে না।

না বাবা! আজই আমাকে সব বলতে হবে। সব শুনে যদি তুমি আমাকে ক্ষমা করো তো ভাল। নচেৎ—

পাগলী! যা, আজ বিশ্রাম নে গিয়ে। সব কথা তোর কাল শুনবো।

কিন্তু বাবা!

না। কোন কথা নয়—যা শু'গে যা!—

একপ্রকার জোর করে ঠেলেই যেন শেখরনাথ কন্যাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

ঘরে এসে শর্বরী পরিধেয় বস্ত্রটাও বদলাল না। শয্যার ওপরে গা এলিয়ে দিল। ঘরের আলোটা পর্যন্ত জ্বালল না। অন্ধকার ঘরে শয্যার ওপরে চোখ বুজে পড়ে রইলো।

আলো এসে ঘরে প্রবেশ করল, দিদি!

শুতে যা আলো। আমি কিছু খাব না।

এক কাপ চা করে দিই—

না!--

কিছুই খাবি না!

কেন বিরক্ত করছিস আলো। যা শুতে যা!

আলো চলে গেল। পদশব্দে তার বোঝা গেল।

অন্ধকার ঘর। টেবিলের ওপরে রেডিয়াম্ ডায়েল টাইমপিসটার সাংকেতিক সময়ের অক্ষরগুলো মিটমিট করে জ্বলছে।

বাবাকে সে জানে। বিয়েটা তাদের হয়ে গেলে চিরন্তন ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার ও মর্যাদাকে ভুলে গিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে যদিও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করতে পারতেন কিন্তু বিয়েতে সে স্বেচ্ছায় অস্বীকৃতি জানিয়ে এসেছে শুনলে বাবা তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। হয়ত এই গৃহে তার আর স্থানও হবে না। তবু, তবু তাকে সব বাবাকে জানাতেই হবে। তারপর সে নেবে তার রাস্তা। কারো সাহায্যই সে চায় না। উঠে বসল শর্বরী।

সুইচ্ টিপে টেবিল ল্যাম্প জ্বালল। চেয়ারটা টেনে নিয়ে টেবিলের সামনে বসে রাইটিং প্যাডটা খুলল। তারপর কলম দিয়ে রাইটিং প্যাডের ওপরে খসখস করে লিখে চলল।

রাত যখন তিনটে, একমাত্র বিবাহের সম্ভাবনার ব্যাপার যেটা স্বেচ্ছায় সে চিরদিনের মত ভেঙে দিয়ে চলে এসেছে সেইটুকু বাদ দিয়ে নিজের অবস্থার সব কথাই খুলে চার পৃষ্ঠা ব্যাপী এক চিঠিতে লিখে শেষ করে খামের মধ্যে ভরে উপরে বড় বড় করে লিখলো, 'বাবা'।

হঠাৎ ঐ সময় টেবিলের একপাশে রক্ষিত ফোনটা বেজে উঠলো ক্রিং ·· ক্রিং।

আঃ! এত রাত্রে আবার কে? রিসিভারটা তুলে নিল শর্বরী, হালো!

কে শর্বরী! আমি ডাঃ চৌধুরী কথা বলছি!—

প্রফেসর চৌধুরী! শর্বরী তটস্থ হয়ে ওঠে।

বলুন স্যার!

এইমাত্র হাসপাতাল থেকে ফোন করছিল সারাদিন তুমি নাকি হাসপাতালে যাও নি?

না স্যার—

শরীর সুস্থ তো? না কি!

হ্যাঁ স্যার—এমনিই একটু রেস্ট নেবো বলে—মিথ্যা কথাই বললে শর্বরী প্রফেসারকে ফোনে।

আমার ২ নং কেবিনের কেসটার হিমারেজ হচ্ছে, একবার যাও, গিয়ে দেখো। প্রয়োজন বোধ করলে আমাকে রিং করবে। অবশ্য তুমি যদি না যেতে পারো তাহ'লে—

না স্যার—আমি এখুনি যাচ্ছি।

ফোনটা রেখে চটপট কাপড় বদলে শর্বরী বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিল। যাবার আগে চিঠিটা বাবার ঘরে রেখে যেতে হবে।

পা টিপে টিপে বাবার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে শর্বরী ভিতরে প্রবেশ করল। সারাটা রাত শেখরনাথের শিয়রের পাশে শয়নঘরে স্বল্পশক্তির একটা সবুজ বাতি জ্বলে। মৃদু সবুজ আলোয় ঘরটির মধ্যে যেন একটা শান্ত ঘুমের স্বপ্ন জড়িয়ে আছে।

শয্যার ওপরে শুয়ে শেখরনাথ। বুক পর্যন্ত আজ বোধ হয় তাঁর শয়নের পূর্বে কেউ বেডকভারটা টেনে দেয়নি, ওটা যে তারই নিত্য রাতের কাজ। প্রতি রাত্রে শয়নের পূর্বে শর্বরীই যে বেডকভারটা দিয়ে শেখরনাথের বুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে যায় সন্তর্পণে। কি শীত কি গ্রীষ্ম, গায়ে একটা বেডকভার না দিয়ে

শেখরনাথ ঘুমুতে পারেন না, চিরদিনের অভ্যাস। প্রচণ্ড শীতেও শেখরনাথ ঐ একটিমাত্র বেডকভার ছাড়া কিছু গায়ে দেন না।

ঘুমিয়ে আছেন শেখরনাথ।

মাথার কাছে হাতের নাগালের মধ্যে ত্রিপয়ের ওপরে কাচের গ্লাসে জল। ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙে জলপানের অভ্যাস শেখরনাথের বহুকালের। কাচের গেলাসটার পাশেই চিঠিটা নিঃশব্দে রেখে দিল শর্বরী। চিঠিটা রেখে ঘুমন্ত বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ও। চোখের কোল দুটো কেন না জানি নিজের অজ্ঞাতেই ঝাপসা হয়ে আসে, প্রাণপণ শক্তিতে দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে শর্বরী। বাবা কাল জেগে উঠে চিঠিটা পড়ে তার সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক কি ভাবে নেবেন কে জানে। তারপর নিঃশব্দে পা টিপে টি: যেমন ঘরে প্রবেশ করেছিল তেমনি নিঃশব্দে আবার পা টিপে টিপেই ঘর হ: বের হয়ে গেল শর্বরী।

ভৃত্য ভোলাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সে হাসপাতালে যাচ্ছে এবং দরজা বন্ধ করতে বলে শর্বরী রাস্তায় এসে নামল।

এত রাত্রে ট্যাক্সী বা রিকশা কিছুই পাওয়া যাবে না। কুন্দনলালের রিকশাটা যদি না পাওয়া যায় তো হেঁটেই যেতে হবে সেই হাসপাতাল পর্যন্ত।

ফাল্গুনের রাত্রির শেষ প্রহর। একটা ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা ভাব। নির্জন গলিপথ দিয়ে জুতোর শব্দ জাগিয়ে হেঁটে চলে শর্বরী।

নিঃশব্দ গলিপথ। কোন বাড়ি হতে একটা ছোট শিশুর হঠাৎ-ঘুম-ভাঙা কান্নার শব্দ শোনা যায়। হঠাৎ বোধ হয় তৃষ্ণায় ঘুম ভেঙে পাশে হাতড়ে মাকে পায়নি তাই কাঁদছে ঘুমের ঘোরেই সহজাত প্রবৃত্তিতে। কে যেন শর্বরীর গতি রোধ করে সহসা। অন্ধকার নির্জন গলির মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে যায় শর্বরী নিজের অজ্ঞাতেই। ছোট্ট অসহায় এতটুকু এক শিশু। কি আশ্চর্য মানুষের মন! মনে পড়ে গত রাত্রে যে শিশুটিকে সে প্রসব করিয়েছে। ঠিক এই সময়েই। সন্তোজাত। কি নরম তুলতুলে যেন এক স্তবক ফুল। ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছিল, ফুলের নরম পাপড়ির মত ছোট্ট দুটি ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে। সমস্ত দেহটা কি এক অপূর্ব পুলকানুভূতিতে প্রথম বর্ষার স্পর্শে কদম ফুলের মতো শিহরিত হয়ে ওঠে কথাটা মনে পড়তেই সহসা।

থির থির করে কেঁপে ওঠে। সে কম্পন শুধু তার দেহেই নয়, ফাল্গুন-রাত্রির শেষ প্রহরের স্তব্ধতায় যেন সঞ্চারিত হয়ে যায় তার দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে। মাটির বুকে অঙ্কুরোদ্গমের মতো, কুঁড়ির বুকে স্ফুটনের

বেদনার মতো একটা শিহরণ, একটা আবেগ যেন শর্বরীর দেহের রোমকূপে-কূপে সঞ্চারিত হয়ে যায় কি এক আনন্দে।

ঘুম ভেঙে মা বোধ হয় ক্রন্দনরত শিশুটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছেন কিন্তু অভিমানে এখনো থেকে থেকে ফোঁপাচ্ছে সদ্যজাগা শিশুটি।

হঠাৎ শর্বরীর খেয়াল হল চুপটি করে পথের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে। শিশুটির কান্না থেমে গিয়েছে। আবার চলা শুরু করে।

পথের মোড়ে একটা রিকশার আড্ডার কুন্দনলাল রিকশাওয়ালা শর্বরীর পরিচিত। তাকে জাগিয়ে তার রিকশায় যেতে হবে। দ্রুতপদে হেঁটে চলে শর্বরী।

॥ ৯ ॥

কুন্দনলাল রিকশাওয়ালা শর্বরীর বিশেষ পরিচিত। মধ্যে মধ্যে এমনি রাত্রে হঠাৎ হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে শর্বরীর, এবং সেসব ক্ষেত্রে শর্বরী গলির মোড়ে রিকশার আড্ডা থেকে কুন্দনলালকে ডেকে তুলে তারই রিকশায় চেপে হাসপাতালে গিয়েছে। কুন্দনলাল শর্বরীকে একটু খাতিরও করে। একবার বছরখানেক আগে কুন্দনলালের এক ভাইকে হাসপাতালের ফ্রি-বেডে ভর্তি করিয়ে তাকে চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ করে দিয়েছিল শর্বরী।

কুন্দনলাল নিজেও হাঁপানির রোগী। নিজেও কতদিন মধ্যে মধ্যে এসে শর্বরীর কাছ হতে ঔষধের ব্যবস্থা ও ইনজেকশন নিয়ে গিয়েছে। সাধারণতঃ বেশী রাত পর্যন্ত খাটে না কুন্দনলাল। রাত দশটার মধ্যেই শেষ ভাড়া খেটে আড্ডায় ফিরে এসে, নিজে হাতে যাহোক কিছু পাকিয়ে নিয়ে রিকশাটার উপরেই শুয়ে ঘুম দেয়। তবে ঘুম তার খুব পাতলা।

রিকশার আড্ডাটা একটা করোগেটেড্ সেডের মধ্যে। টিনের কবাট দুটো রাত্রে মাত্র ভেজানো থাকে। এবং দরজা দুটো মুখোমুখি লাগে না। বেশ খানিকটা ফাঁক থাকে।

শর্বরী যখন শেডের সামনে এসে দাঁড়াল, ভিতরে কে যেন খং খং করে কাশছে টের পাওয়া গেল। বুঝতে পারে শর্বরী নিশ্চয়ই হাঁপানির রোগী কুন্দনলাল।

দুই দরজার ফাঁকে মুখ দিয়ে শর্বরী ডাকে মৃদুকণ্ঠে, কুন্দনলাল! কুন্দনলাল!

কুন্দনলালই কাশছিল। জবাব দেয়, কৌন হো!

একটু বাইরে আসবে কুন্দনলাল!

আরে!—

গায়ে চাদর জড়িয়ে কুন্দনলাল দরজা খুলে বের হয়ে এলো: কৌন! আরে ডকটার মেমসাব্‌—হাসপাতাল যায়গী মাঈ!

হ্যাঁ। আমাকে একটু হাসপাতালে পৌছে দেবে চল কুন্দনলাল!

ঠুং ঠুং ঘন্টি বাজাতে বাজাতে কুন্দনলাল রিকশা টেনে নিয়ে চলে। নির্জন রাস্তা। পথের দুপাশে নিঃসঙ্গ আলোগুলো একচক্ষু মেলে স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মত একপায়ে দাঁড়িয়ে যেন ঝিমুচ্ছে।

ইস্পাতের ট্রাম লাইন সোজা চলে গিয়েছে যেন পাশাপাশি চওড়া দুটি সরল রেখা। দুপাশের দোতলা তিনতলা বাড়িগুলো স্তূপের মতই যেন জমাট বেঁধে আছে। ঘুমে আচ্ছন্ন মহানগরী!

সারাদিনের কোলাহল ও কর্মক্লান্তির পর চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে যেন সব কিছু।

ঠুং ঠুং চলমান কুন্দনলালের হস্তধৃত ঘন্টিটা জাগিয়ে চলেছে একটানা একটা মিষ্টি শব্দতরঙ্গ রাত্রির ঘুমন্ত স্তব্ধতার বুকে।

শর্বরীর মনের মধ্যে আবার একান্ত অজান্তেই যেন ক্ষণপূর্বের চিন্তাধারাটা এসে আবর্ত রচনা করে ফিরতে থাকে।

বাবা যখন আর ঘণ্টা দুই বাদে ঘুম ভেঙে জলপান করবার জন্য হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা নিতে যাবেন, তখুনি হয়তো নজরে পড়বে তাঁর ত্রিপয়ের ওপরে রক্ষিত শর্বরীর চিঠিটা। পিতা শেখরনাথকে শর্বরীর মতো আর ভাল করে কে চেনে? অদ্ভুত একটা আভিজাত্য আছে তাঁর চরিত্রে। সে জানে। অনমনীয় ইস্পাতের মতো একটা শক্ত-কঠিন দৃঢ়তা। ইস্পাত-কঠিন সেই দৃঢ়তায় তাঁর সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ এতটুকু আঁচড়ও কাটতে পারবে না। একদিকে তাঁর নিজস্ব নীতি-বোধ, অন্যদিকে দুনিয়ার যা কিছু। শর্বরীকে শেখরনাথ যদি না ক্ষমা করেন তাহলে তাকে বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে আসতেই হবে। কত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে যে শেখরনাথ শর্বরীকে শেষের দুই বৎসর বিশেষ করে ডাক্তারী পড়িয়েছেন, সে কথা ঘুণাক্ষরে কখনো তিনি প্রকাশ না করলেও শর্বরীর নিজের তা অবিদিত নেই। সবে তো মাত্র বছর দুই হলো প্রফেসার চৌধুরীর চেষ্টায় ও সাহায্যে শর্বরীর আয় বৃদ্ধি হওয়ায় সংসারে সচ্ছলতা দেখা দিয়েছে। এই সচ্ছলতায় শেখরনাথ যে কত পরিতৃপ্ত হয়েছেন শর্বরী তা ভাল করেই জানে। তথাপি এও ঠিক, অবশ্যম্ভাবী সেই দারিদ্র্যের মধ্যে শেখরনাথকে এই পঙ্গু অবস্থায় শর্বরীকে ত্যাগ করবার জন্য নতুন করে পড়তে হলেও শর্বরীকে তিনি ক্ষমা করবেন না। কিন্তু তার নিজের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে তার নিজেরই

চাকরি থাকবে কিনা তাই বা কে জানে? এবং তখন হয়তো নিজেকেই চরম দৈন্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

না! তার জন্য আর ভাববে না শর্বরী। ঐ হীন বিবাহবন্ধনকে মেনে নেওয়ার চাইতে সব কিছু নিন্দা, কলঙ্ক, দৈন্যের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ানোও সহস্রগুণে শ্রেয়। হ্যাঁ, সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছে। সামনে তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি। রাত্রির তপস্যায় তাকে সিদ্ধি পেতেই হবে। সমস্ত কলঙ্ককে জয় করে মেরুদণ্ড খাড়া করে মাথা সোজা করে তাকে দাঁড়াতই হবে। তবু—তবু সে স্বীকার করে নিতে পারবে না শৈবালের সঙ্গে বিবাহবন্ধন। সে আর তার অনাগত সন্তান। নিজের দেহের কোষ হতে যে রক্তপিণ্ডের কোষে কোষে জীবনের রস সিঞ্চিত হচ্ছে সে তো শুধু তার সন্তানই নয়, তার প্রতীক, তার প্রতিভূ, তার সত্ত্বা, তার জীবনের অবিভাজ্য এক অংশ। তার সন্তান। হ্যাঁ, সে ও তার সেই সন্তান নিজস্ব পরিচয়েই সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবে। কেন সে পারবে না তার প্রেমজ সন্তানের মাতৃত্বের দাবীতে দাঁড়াতে!

হঠাৎ চমক ভাঙল। চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। বিরাট পাল্লা-খোলা গেটটার ভিতর দিয়ে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের মধ্যে রিকশা প্রবেশ করছে। ইমারজেন্সী রুমের আলোটা সামনের পোর্টিকোর মধ্যে এসে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঁ-হাতি সাদা রঙের ইমারজেন্সী ব্লকটা ও ডানদিকে মোটা থামওয়ালা বিরাট হাসপাতালের প্রথম যুগের উঁচু পাঁচতলা ফ্যাকাশে হলদে রংয়ের বাড়িটা ও তার সামনে উঠবার ধাপে ধাপে উঠে-যাওয়া সিঁড়ি—তারই নিচে ব্লাড ব্যাংক অতিক্রম করে রিকশাটা বাঁ-হাতি 'জি' ওয়ার্ডের সামনে এসে দাঁড়াল।

ব্যাগ থেকে দুটো টাকা কুন্দনলালকে দিয়ে এগুতে যাবে শর্বরী, কুন্দনলালের ডাকে ফিরে তাকায়।

ডাক্তার মেমসাব্!

কিরে?

এত্না যাস্তি দিয়া কিউ মাঈজী?

ঠিক আছে, নাও।—

শর্বরী আর পিছনপানে তাকাল না। এগিয়ে চলল। লম্বা একটা প্যাসেজ। তারপরই দোতলায় উঠবার প্রশস্ত সিঁড়ি। তার একপাশে লিফটের ঘর।

এ বাড়িটায় পা দিলেই ডেটল ইথার ক্লোরোফরম প্রভৃতির একটা মিশ্র গন্ধ বাতাসে পাওয়া যায়। সব চুপচাপ নিঝুম! স্বল্পশক্তির প্যাসেজের আলোটা একটা রহস্যঘন আলোছায়ায় যেন লুকোচুরি খেলছে এখানে ওখানে।

তিনতলায় সোজা উঠে গেল শর্বরী। প্রশস্ত একটা প্যাসেজ—তার একপাশে লেবার রুম, অন্যপাশে একলামসিয়া রুম। লেবার রুমের আলো কাচের সার্সী ভেদ করে দরজার প্যাসেজে আভাস ছড়াচ্ছে।

লেবার রুম থেকে একটা এনামেলের ট্রে হাতে রাত্রের ডিউটির স্টাফ্ নার্স মাধবী বের হয়ে সামনেই শর্বরীকে দেখে বললে, এই যে মিস্ রয় এসে গিয়েছেন।

হ্যাঁ। ২নং কেবিনের পেসেণ্ট কেমন আছে?—

উপরে অপারেশন থিয়েটারে পেসেণ্টকে নিয়ে গিয়েছে, আর. পি. ও ডাঃ অধিকারী আছেন।

ডাঃ সলিল অধিকারী ডাঃ চৌধুরীর সিনিয়ার হাউস ফিজিসিয়ান।

শর্বরী আর কালক্ষেপ করে না। চারতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

অপারেশন থিয়েটারের পাশের ছোট অ্যাণ্টিরুমটায় প্রবেশ করে শর্বরী অ্যাপ্রনটা পরে হাতটা ধুয়ে গ্নাবস্ এঁটে নিল। একজন নার্স মুখে মাস্কটা এঁটে দিল ঘাড়ের পিছনে ফিতে বেঁধে।

অপারেশন থিয়েটারে শর্বরী এসে প্রবেশ করল।

অপারেশন টেবিলের ওপরে লিথোটমি পজিসনে ঢাকা রোগিণীর দেহের নিম্নাঙ্গের অনাবৃত স্থানটুকু কেবল দেখা যাচ্ছে। ডাক্তার অধিকারী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষায় ব্যস্ত। মাথার সামনে অ্যানাস্থেটিস্ট।

শর্বরী এসে পাশে দাঁড়াল: ব্লিডিং এখনও বন্ধ হয়নি?

না।

হিমোস্ট্যাটিক সিরাম দিয়েছেন?—শর্বরী প্রশ্ন করে।

একটা কোয়াগুলেণ্ট ও সিরাম দুই-ই দেওয়া হয়েছে।

পালস্ রেসপিরেশন কেমন?

ভাল নয়!—জবাব দিল অ্যানাস্থেটিস্ট ডাঃ ঘোষাল।

প্লাজমা রেডি করুন। কোরামিন কতক্ষণ আগে দিয়েছেন?—আবার প্রশ্ন করে শর্বরী।

আধঘণ্টাটাক হবে।—

পেথিডিন দিয়েছেন?

হ্যাঁ।

সিনক্যালটন একটা রেডি করুন।

কিন্তু ঝাড়া দু'ঘণ্টা পরিশ্রম ও ধস্তাধস্তি করেও রোগিণীকে বাঁচানো গেল না

শেষ পর্যন্ত কোন মতেই।

ক্রমে ক্রমে সিঙ্ক করে ভোর পৌনে ছটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস নিল রোগিণী। পূর্বেই রোগিণী অত্যন্ত অ্যানিমিক্ ছিল, হিমারেজের শক্ সামলাতে পারল না।

কেসটা ইললিগ্যাল ইনকমপ্লিট এভরশন। ২৩।২৭ বৎসরের একটি বিধবা বৌ। কনভিসন রাত বারোটা থেকে দ্রুত খারাপের দিকে যেতে থাকে।

রক্তাক্ত গ্লাবস্ হাত হতে খুলে সিঙ্কে শর্বরী হাত ধুচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে নার্স মিস মিত্র।

লেবার ওয়ার্ডের দাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির।

কিরে শ্যামা?—প্রশ্ন করে নার্স।

দোতলায় ১৩নং বেডের পেসেণ্ট আফিম খেয়েছে দিদিমণি।

সে কি!—চকিতে শর্বরী সাবান-মাখা হাতেই ঘুরে দাঁড়ায়।

১৩নং বেডে সেই মেয়েটি ছিল। অবৈধ সন্তানের জননী। গত রাত্রে শর্বরী যাকে প্রসব করিয়েছে, সুজাতা।

সেখানে কে আছে?

ডাঃ সেন আছেন। আপনাকে ডাকছেন এখুনি, একটিবার চলুন।

পেসেণ্ট কোথায়?

এই মাত্র অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল।

দ্রুত স্খলিত পদে শর্বরী ঘর হতে বের হয়ে গেল কোন মতে হাতটা ধুয়ে।

সেই মেয়েটি। সুজাতা বোস।

এবার আর তার আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় কেউ বাধা দিতে না পারে সেইজন্য সে মস্ত একদলা আফিম কখন একসময় সবার অলক্ষ্যে গলাধঃকরণ করেছে।

অপারেশন থিয়েটারে এসে প্রবেশ করল শর্বরী।

টেবিলের ওপরে সুজাতাকে শুইয়ে তখন স্টমাক পাম্প দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। পাম্প চালিয়ে পাকস্থলীর কালো বিষ মন্থন করা হবে।

কি ব্যাপার সেন?—শর্বরী প্রশ্ন করে উৎকণ্ঠার সঙ্গে।

কে! মিস রায়! আসুন—কনভিসন খুব গ্রেভ। সন্ধ্যার দিকে বোধ হয় খেয়েছে—

সত্যিই তাই। ফিব্‌ল্, ইম্‌পারসিপ্‌টিব্‌ল্—ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ নাড়ীর গতি। পিউপিল—কনীনিকা পিন্ পয়েণ্ট্, কনট্রাকটেড্। ঠাণ্ডা নেতান ঘর্মাক্ত নীলাভ প্রাণ-স্পন্দনহীন দেহ। অবশ শিথিল সুজাতা। গভীর বিষ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

ওয়ার্ডের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ গ্রোনিং শুনে ভিতরে ঢুকে দেখি এই

অবস্থা। বুকের ওপরে হাতে-ধরা একটা চিঠি। ডাঃ সেন বললেন।

চিঠি? কই দেখি?

আমার অ্যাপ্রনের পকেটেই আছে দেখুন—

আচ্ছন্নের মত শর্বরী ডাঃ সেনের অ্যাপ্রনের পকেট হতে একটা চিঠি বের করে নিল। ভাঁজকরা একটুকরো কাগজ।

মেয়েলী হস্তাক্ষরে গোটা গোটা পেনসিলে লেখা।

সংক্ষিপ্ত পত্র।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা,

আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। স্বেচ্ছায় আমি আফিম খেয়ে মরছি। শেষ অনুরোধ রইলো আপনাদের সকলের কাছে, আমার সন্তানটিকে কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেবেন এবং আমার নামে পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে পাঁচশত টাকা আছে, যে অনাথ আশ্রম আমার সন্তানটিকে স্থান দেবে তারাই পাবে। ইতি

সুজাতা বোস।

আফিমের কাজ বহু পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বহুবার স্টমাককে পাম্প্ করে করেও সম্পূর্ণ বিষ মন্থন করা গেল না। দেহের কোষে কোষে ও রক্তের মধ্যে বিষ তার শেষ কামড় বসিয়েছে।

সুজাতার ঘুম আর ভাঙল না।

ভোরের প্রথম আলো অপারেশন থিয়েটারের কাচের সার্সী পথে এসে উঁকি দিল। ডাঃ সেন একটা কালো কম্বল দিয়ে মৃতদেহটা ঢেকে দিলেন নিঃশব্দে।

সুইসাইড্ কেস। মর্গে পাঠাতে হবে। পোস্টমর্টেম হবে, তবে সৎকার। ঘণ্টা তিনেক ধরে দুটো সিরিয়াস্ কেস নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি করে শর্বরী নিজেকে অতিশয় ক্লান্ত বোধ করছিল। একে সারাটা রাত ঘুম হয়নি, সমস্ত দিনটা তার আগে মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছে, তারপর এই পরিশ্রম। শরীর যেন আর বইছে না। পরিশ্রান্ত দেহকোষগুলো এখন বিশ্রাম চায়। বাড়িতে ফিরে দীর্ঘ চার-পাঁচ ঘণ্টা একটানা ঘুমুতে পারলে অনেকখানি ক্লান্তি হয়ত কমতো। কিন্তু এতক্ষণে বাড়িতে শেখরনাথ হয়ত তার চিঠিখানা পড়েছেন। সেখানেও প্রবেশদ্বারে তালা পড়েছে কিনা এতক্ষণে তাই বা কে জানে। এত তাড়াতাড়ি বাবাকে সব কথা না জানালেও হয়ত চলত কিন্তু কেন

যেন মন কিছুতেই তাতে সায় দিল না। চরম ও অনিবার্য যা তাকে যত শীঘ্র স্বীকৃতি দেওয়া যায়, তার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া বা চরম নিষ্পত্তি যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় ততই মঙ্গল। যা বলতে হবেই, তাকে আর বৃথা গোপন রেখে সময়ক্ষেপে ফল কি! যা ঘটবার ঘটে যাক! ভীরুতাকে অহেতুক প্রশ্রয়দানের মধ্যে কোন গৌরব নেই।

॥ ১০ ॥

শর্বরী প্রস্তুত হলো হাত ধুয়ে বাড়িতে ফিরে যাবার জন্ম।

তীর যখন একবার তূণ হতে নিক্ষিপ্তই হয়েছে তবে আর মিথ্যা সঙ্কোচ কেন?

ফাল্গুনের সত্ত ঘুমভাঙা প্রভাত। শহর ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে। মানুষের কর্মব্যস্ততা চারদিকে শুরু হয়ে গিয়েছে।

উত্তরমুখো একটা ট্রামে উঠে বসল শর্বরী।

যাত্রীদের ভিড় এখনো শুরু হয়নি। সমস্ত প্রথম শ্রেণীটা একপ্রকার খালি বললেও চলে। চলমান গাড়ির জানালাপথে ভোরের শিরশিরে হাওয়ায় ক্লান্ত চোখের পাতা দুটো যেন আপন হতেই বুজে আসতে চায়।

কিন্তু ঘুমলে তো এখন চলবে না শর্বরীর। বাড়িতে পৌঁছেই তাকে এখুনি শেখরনাথের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে হয়ত। ঐ শেষ ঘাঁটিটা পার হতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য অনুভূতি মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। বলতে গেলে জীবন্মৃত—পঙ্গু বাপ তার। ভাগ্যের নিষ্ঠুর ফলাফলকে তিনি বুক পেতে নিয়েছিলেন একমাত্র শর্বরীর মুখের দিকে চেয়েই না। শেষ জীবনের এই চরম দুঃখের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা শর্বরীই তাঁর। শর্বরী সেটা ভাল ভাবেই জানে।

তার স্বীকারোক্তি যতই দুঃসাহসিক ও সত্য হোক না কেন, পঙ্গু পিতার বক্ষে কি শেলাঘাত করবে না! শর্বরীর ঐ স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে শর্বরীকে কেন্দ্র করে তাঁর এতদিনের স্বপ্ন কি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে না। কেন শর্বরী তাঁকে এমন নিষ্ঠুর আঘাত হানলো? কিন্তু তাই বলে শেখরনাথের সঙ্গে প্রতারণা! এত বড় দুঃসাহস শর্বরীর নেই।

ট্রাম থেকে নেমে ক্লান্ত শ্লথ পা দুটোকে কোনমতে টানতে টানতে শর্বরী গৃহদ্বারে এসে পৌঁছল। সদর দরজাটা খোলাই আছে।

একবার ক্ষণেকের জন্ম ইতস্ততঃ করলে শর্বরী এবং পরক্ষণেই ঠিক যা অনুমান

করেছিল তাই হলো, ঢুকে পড়ল দরজাপথে।

শর্বরী!—তীক্ষ্ণ একটা শরের মত শেখরনাথের ডাকটা শর্বরীর কানে এসে বাজলো। থমকে দাঁড়াল শর্বরী।

আবার ডাক এলো, শর্বরী!

শর্বরীর জুতোর শব্দেই শেখরনাথ বুঝতে পেরেছিলেন শর্বরী হাসপাতাল হতে ফিরেছে। শর্বরীর জুতোর শব্দ কেন, তার খালি পায়ের শব্দও যে শেখরনাথ কোনদিন ভুল করেন না। আসামী যেমন কাঠগড়ার সামনে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়, শর্বরীও তেমনি পায়ে পায়ে পিতার বসবার ঘরে এসে প্রবেশ করল।

ইজিচেয়ারটার উপর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে অর্ধশায়িত ভাবে উপবিষ্ট শেখরনাথ। পাশেই চেয়ারের হাতলের ওপরে শর্বরীর চিঠিটা।

শেখরনাথ তাহ'লে তার চিঠিটা পড়েছেন।

পিতার মুখের দিকে তাকাতেও শর্বরীর সাহস হয় না। যে সাহসে ভর করে গত রাত্রে অকপটে সমস্ত কিছু জানিয়ে শর্বরী পিতাকে চিঠিটা লিখেছিল, তার কণামাত্রও যেন আর এই মুহূর্তে অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে কোথাও।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল স্তব্ধতার মধ্যে।

তোমার চিঠিটা আমি পড়েছি।

শর্বরী নিশ্চুপ। চোখের দৃষ্টি নিচের দিকে নিবদ্ধ।

সব কথা অকপটে আমায় জানিয়ে তুমি আমার মেয়ের মতই কাজ করেছো। কিন্তু তোমার চিঠির সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তোমাকে জিজ্ঞাস্য একটা আছে আমার। আগাগোড়াই তোমার চিঠিতে ছেলেটির নাম গোপন করে গিয়েছো, এবং লিখেছো তুমি ইচ্ছা করেই নামটা গোপন করেছো, কেননা তার কাছে তুমি তোমার দাবী ন্যায্য হলেও পেশ করতে চাও না।

শর্বরী নিশ্চুপ পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

কিন্তু একবারও কি এর পরিণামটা তুমি ভেবে দেখেছো? আবার কথা বললেন শেখরনাথ শান্ত কঠিন গলায় অধোবদনে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

শর্বরী তবু জবাব দেয় না।

আমার কথার জবাব দাও!

আমি আমার যা কিছু বলবার ছিল—

তাহলে তুমি বলবে না নামটা তার?

বাবা!—

আমার কথার জবাব দাও—

আমাকে ক্ষমা করুন বাবা। আমি—

তাহ'লে আমারও শেষ কথা শোন শর্বরী! নাম তার জানাতে আমাকে আপত্তি থাকে আমি জানতে চাই না। তবে—হয় তুমি তাকে বিবাহ করে গৌরবে মাথা উঁচু করে আমার ঘরে এসে ঢুকবে, নচেৎ জেনো তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকলো না আজ হতে।

বাবা!

তুমিও যেমন তোমার যা বলবার ছিল জানিয়েছো তেমনি জবাবে আমারও তোমাকে যা বলবার ছিল বললাম। এখন তুমি তোমার পথ বেছে নিতে পারো।—তুমি আমার একটিমাত্র সন্তান হলেও এ অবস্থায় জেনো, তোমাকে আমি গ্রহণ করতে পারতাম না।

এক মুহূর্ত চুপ করে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল শর্বরী। ভাল-মন্দ সমস্ত বোধশক্তিই যেন জমে পাথর হয়ে গিয়েছে তার ঐ মুহূর্তে।

তারপর ধীরে ধীরে এক সময়ে কথা বললে শর্বরী, তাহ'লে আমি যাই বাবা।

তাহ'লে নামটা তার তুমি বলবে না? শেষবারের মতই আর্ত করুণ কণ্ঠে যেন শেখরনাথ চিৎকার করে উঠলেন, তাহলে এই তোমার শেষ সিদ্ধান্ত!

চিঠিতেই তো আমি আমার শেষ কথা আপনাকে জানিয়েছি বাবা।—

এগিয়ে এসে নত হয়ে শর্বরী পিতার পদধূলি নিতে গেল। কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিলেন শেখরনাথ, না! তুমি আমায় ছুঁয়ো না।

মাটিতেই মাথা রেখে শর্বরী তার শেষ প্রণাম জানাল। তারপর মন্থর পদে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

একটা সুটকেসের মধ্যে কয়েকটা জামাকাপড় ভরে নিল ক্ষিপ্রহস্তে শর্বরী। বাক্সের মধ্যে যে টাকা ছিল তা থেকে গোটা পঞ্চাশেক টাকার নোট তুলে নিয়ে বাকী টাকা বাক্সেই রেখে দিল। টেবিলের ওপরে স্ট্যাণ্ডে শেখরনাথের একটা বাস্ট্ ফটো ছিল, সেটাও সুটকেশে ভরে নিল।

দরজা দিয়ে বের হতে যাবে, পাশের ঘর হতে ছোট ভাই টুটু ছুটে এলো। দু হাতে শর্বরীকে জড়িয়ে ধরে আবদার জানালো, তোমাকে কিছুতেই দু'দিন থেকে ধরতে পারছি না দিদিভাই। আমাদের ক্লাবের সরস্বতী পূজোর চাঁদা এবারে পাঁচ টাকা চাই।

ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার নোট বের করে টুটুর হাতে দিল শর্বরী।

এক কথাতেই পাঁচ-পাঁচটা টাকা চাঁদা পাওয়া যাবে টুটু ভাবতেই পারেনি। অপ্রত্যাশিত চাঁদাটা পেয়ে টুটু তখন লাফ দিয়ে চলে যেতে ব্যস্ত। পলায়নপর টুটুর হাতটা ধরে ফেলল শর্বরী।

এই পাগল, শোন্!

কি ?—

দিনরাত কেবল খেলা আর ক্লাব নিয়ে থাকলেই হবে! পড়াশুনা একেবারে বুঝি শিকেয় তুলেছিস ?—

ছোড়দিটা বুঝি বলেছে তোমার কাছে ?—দাঁড়াও না, ও যখন ক্লাস করে এসে চিতপাত হয়ে ঘুমোবে ওর বিনুনীটা যদি কাঁচি দিয়ে—

ছি, এইসব বুঝি শেখা হচ্ছে! ও না তোমার ছোড়দি!

ছোড়দি না স্পাই! স্পাইয়ের কি শাস্তি জান ? বুলেট্! সত্যি দিদিভাই, এবার জন্মদিনে আমার কিন্তু একটা বন্দুক চাই!

শর্বরীর চোখে এতক্ষণে জল এসে পড়ে।

বন্দুক জন্মদিনে তোমাকে একটা নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবো টুটু—

পাঠিয়ে দেবে মানে! তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

অনেক দূরে—

তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো!

আমার সঙ্গে কোথায় যাবি ভাই। এখানে বাবা আছেন, ছোড়দি রইলো—

উঁহুঁ! তুমি না থাকলে আমি এ বাড়িতে থাকতেই পারবো না!

আমি যাচ্ছি কাজে। তুই আমার সঙ্গে কোথায় যাবি ?

কেন, আমিও কাজ করবো।

তুই বুঝি ডাক্তারীর কিছু জানিস ?

তুমি শিখিয়ে দিও না। ভারী তো ডাক্তারী। ও আমি দু দিনেই শিখে নেবো। জান দিদিভাই, সেই যে কবিতাটা মুখস্থ করতে বলেছিলে, কাল দুবার পড়েই মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। শুনবে—

দিদির অনুমতির কোন অপেক্ষা না রেখেই টুটু গড়গড় করে বলতে শুরু করে :

বল বীর—

বল উন্নত মম শির।

শির নেহারি আমারি, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।

বল বীর—

টুটু আমাদের খুব ভাল ছেলে। টুটুর মত ছেলে হয় না।—বলতে বলতে পরম স্নেহে শর্বরী টুটুর রুক্ষ এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলগুলো একবার নেড়ে দেয়।

হঠাৎ পাশের ঘর হতে শেখরনাথের গলার স্বর শোনা গেল, টুটু!—

যাই বাবা!—দাঁড়াও তুমি দিদিভাই। বাবা ডাকছেন কেন এক্ষুণি শুনেই আসছি—

টুটু পিতার ঘরের দিকে চলে গেল।

এই সুযোগ। শর্বরীও আর দেরি করে না। দ্রুতপদে বারান্দা পার হয়ে একেবারে সদর দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায় রাস্তায়।

ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত এসে শর্বরী দাঁড়াল আবার।

যেখানেই হোক কোথাও গিয়ে আপাতত: উঠতে হবে। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়! ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে মীনুদি, মীনাক্ষীর কথা।

মেডিকেল কলেজে প্রবেশের আগে পর্যন্ত একই কলেজে ওরা পড়তো। আই. এস. সি. পাস করে ও চলে এলো ডাক্তারী পড়তে, মীনাক্ষী এম. এ. পাস করে এক বেসরকারী কলেজে কলকাতাতেই অধ্যাপিকার কাজ নিয়েছিল।

কিন্তু মীনাক্ষী এখন টি. বি. রোগী। ডাক্তারের পরামর্শ মত এখন ছয় মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতেই বিশ্রাম নিচ্ছে। সংসারে এক বুড়ী বিধবা পিসী ছাড়া তাঁর কেউ নেই। আমহার্স্ট স্ট্রীটে নিজেদেরই বাড়ি মীনুদিদের।

হাত-ইশারায় একটা ট্যাক্সী ডেকে শবরী উঠে বসল।

ড্রাইভার শুধায়, কোথায় যাবো?

আমহার্স্ট স্ট্রীট।—

ট্যাক্সী গন্তব্যপথে ছুটে চলে।

ট্রামে-বাসে ইতিমধ্যেই অফিস-যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গিয়েছে। কর্মব্যস্ত জগতের নাড়ীতে নাড়ীতে গতির বেগ।

॥ ১১ ॥

প্রাতরাশ শেষ করে দোতলার খোলা বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে মীনাক্ষী ঐদিনকার সংবাদপত্রটা ওল্টাচ্ছিল।

মীনাক্ষী কিন্তু মানতে চায় না তার বুকে কালব্যাধি এসে বাসা বেঁধেছে। জ্বর নেই, কাশি নেই—শরীরের ওজনও যে বিশেষ কিছু কমছে তাও নয়। প্রথম দিকে শুরুতে কিছুদিন ধরে একটা পিঠের উপর বাঁ দিকে ব্যথা বোধ করত। শর্বরীই সব শুনে জোর করে বুকের ব্যাধিতে বিশেষজ্ঞ ডাঃ ঘোষকে দিয়ে মীনুকে

পরীক্ষা করায়। অভিজ্ঞ ডাঃ ঘোষ স্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করেই বুকের একটা এক্স রে প্লেট্‌ নিতে বললেন। রঞ্জন-রশ্মির কাছে ফাঁকি ধরা পড়ে গেল। এপেক্সে ফোকাস্‌। ঔষধপত্রের নিয়ম বেঁধে দিল শর্বরী। ডাঃ ঘোষ বলেছিলেন ছুটি নিয়ে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যেতে, মীনু হেসেই উড়িয়ে দিল। জোর করেই মীনু কাজ করে যেতে লাগল। ফলে ক্রমেই শরীরটা বিদ্রোহ জানাতে শুরু করলে, অগত্যা শর্বরীর জিদে বাধ্য হয়েই মীনাক্ষীকে ছুটি নিতে হয়েছে। তবে সে কলকাতা ছেড়ে গেল না। কলকাতাতেই থেকে গেল।

জুতোর শব্দে খবরের কাগজ হতে মুখ তুলে মীনাক্ষী সামনে স্যুটকেশ-হাতে ঐ সময় শর্বরীকে দেখে বিস্মিত হল।

এ কি শবী! তুই—এ সময়ে? হাসপাতাল নেই! হাতে আবার স্যুটকেশ—ব্যাপার কি?—

স্যুটকেশটা মাটিতে একপাশে নামিয়ে রেখে একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে শর্বরী বললে, অতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করলে জবাব দিতে পারবো না। আগে এক কাপ চা দিতে বল্‌ দেখি তোর সরলাকে।

মীনাক্ষী ঝি সরলাকে ডেকে চা দিতে বলল।

শুধু চা-ই খাবি, না আরও কিছু খাবি রে?

পেলে মন্দ হত না। কারণ কাল সকাল থেকে কয়েক কাপ চা ছাড়া গত চব্বিশ ঘণ্টায় পেটে সলিড্‌ কিছুই পড়েনি।

বলিস কি! দাঁড়া—

মীনাক্ষী উঠে গিয়ে আবার সরলাকে ডেকে চায়ের সঙ্গে কিছু খাবারও দিতে বলে দিয়ে ফিরে এলো।

চা ও খাবার খেয়ে সত্যিই শর্বরী দেহ ও মনে যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করে।

কথা শর্বরীই শুরু করে প্রথমে, তোর এখানে যদি আমি কিছুদিন থাকি, তোর আপত্তি আছে মীনুদি?

আপত্তি! আপত্তি থাকতে যাবে কেন? কিছুদিন ছেড়ে চিরটাকালই থাক না।

চিরটাকাল প্রয়োজন হবে না। তবে কটা দিন থাকতেই হবে। কিন্তু আরো কথা আছে।—

কি?—

তোর এখানে যে কটা দিনই থাকি না কেন, থাকবো মীনুদি একটা মাত্র শর্তে!

শর্ত।—

হ্যাঁ। ফ্রি লজিং ফুডিং নয়। পেইয়িং গেস্ট হিসাবে যদি থাকতে দিস তবেই থাকবো।

জবাবে মীনাক্ষী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, অগত্যা। তোকে তো আমি জানি। টাকা দিয়ে যদি তুই আনন্দ পাস, দিস। তবে জানিস, এতে করে আমাকে আঘাতই দেওয়া হবে।

ব্যাপারটা ঠিক তা নয় মীনুদি! পারতপক্ষে কারো কাছে হাত না পাতাই ভাল। সৌজন্য বল, বন্ধুত্ব বল, তার মধ্যে অর্থের দেনাপাওনা আনতে নেই। কারণ তাতে করে অতি বড় বন্ধুত্ব বা সৌজন্যের মধ্যেও চিড় খেতে পারে। আমায় কিন্তু ভুল বুঝিস না ভাই, মীনুদি।

মীনাক্ষী জবাব দেয় না, চুপ করেই থাকে।

তোর নিশ্চয়ই কৌতূহল হচ্ছে মীনুদি, কলকাতায় আমার বাসা এবং আত্মীয়-স্বজন থাকতেও এখানে এলাম কেন হঠাৎ থাকবার জন্য। কারণ অবশ্যই একটা আছে। তবে সময়মত সবই তোকে বলবো। এখন কোন প্রশ্ন করিস না।

বেশ!

তোর ঘরেই আমি থাকতে পারি অবিশ্যি যদি তোর কোন অসুবিধা না হয়।

অসুবিধা আবার কি। কিন্তু জানিস তো তুই, কি রোগ বুকে আমার বাসা বেঁধেছে '—জেনেশুনে একই ঘরে।

হেসে ওঠে শর্বরী।

হাসছিস্ যে?

জানিস না! ডাক্তাররা সর্বক্ষণ রোগ আর রোগীদের ঘেঁটে ঘেঁটে ইমিউন হয়ে যায় সর্বরোগের ব্যাপারেই।

থাম্। আর বড়াই করতে হবে না।

বড়াই নয় রে, সত্য কথা। রোগের সঙ্গে ডাক্তারের একটা হৃদ্যতা ও আন্ডার-স্ট্যাণ্ডিং না থাকলে চিকিৎসাশাস্ত্রই যে মিথ্যে হয়ে যায় রে। জবাবে হাসতে হাসতেই কথাগুলো উচ্চারণ করে শর্বরী। তারপর একটু থেমে বলে, দাঁড়া ভাই—সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন একটা আগুনের হলকা বয়ে যাচ্ছে। স্নানটা সেরে নিই।

সুটকেশ হতে শর্বরী তার শাড়ি ও জামা বের করে নিল। এবং দ্বিতীয় আর কোন বাক্যব্যয় না করে সোজা বাথরুমের দিকে চলে গেল। আর মীনাক্ষী কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো পথের দিকে।

বহুক্ষণ ধরে শাওয়ারটা খুলে স্নান করল শর্বরী। দীর্ঘ স্নানে শর. যেন এতক্ষণে অনেকটা ঠাণ্ডা হলো। এই কয়দিনের নিরন্তর টানাপোড়েন ও মনের মধ্যে যে একটা চিন্তার গ্লানি জমে উঠেছিল সেটা যেন ঠাণ্ডা আর্দ্র হয়ে জুড়িয়ে গেল। সত্যি-সত্যিই যেন শর্বরী অনেকটা সুস্থ বোধ করল।

স্নান সমাপনান্তে শর্বরী বাইরে এসে দেখে মীনাক্ষী ইতিমধ্যেই সরলাকে দিয়ে কিছু গরম গরম লুচি ভাজিয়ে টেবিলের ওপরে এনে সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু শর্বরী সে খাদ্যবস্তু স্পর্শও করলো না। বললে ঘুমে তার সমস্ত শরীর ভেঙে আসছে। সে আর দাঁড়াতে পারছে না।

শর্বরী মীনাক্ষীর কোন বাধাই মানলে না। তারই ঘরে তার শয্যার এক পাশে একটা ক্যাম্প্‌খাট পেতে নিজের শয্যা বিছিয়ে নিল তাড়াতাড়ি কোনমতে, তারপর গা ঢেলে দিল সেই শয্যায়। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে তার দু চোখের পাতা এলো বুজে এবং একটানা ঘুম দিল বেলা বারোটা পর্যন্ত।

॥ ১২ ॥

শর্বরী যে সামান্য কয়েকটা কথায় রাগ-অভিমান করে অকস্মাৎ অমন ভাবে চলে যাবে, শৈবাল যেন সত্যি-সত্যিই ভাবতে পারেনি। কথার পিঠে কয়েকটা ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ আক্রোশের বশে রূঢ় কথা না হয় শৈবাল বলেই ফেলেছে, তাই বলে সেই মুহূর্তের কয়েকটা তার মুখের রূঢ় কথাই সত্য হবে, আর এই দীর্ঘদিনের তাদের পরস্পরের সম্পর্কটা মিথ্যে হয়ে যাবে।

বেশ! এতই যখন রাগ-অভিমান তার, যাক চলে সে যেখানে তার খুশি! ফিরে এলো শৈবাল ঘরের মধ্যে আবার।

কি অন্যায় জিদ! কি এমন অন্যায় অসম্ভব কথা বলেছিল শৈবাল! বিবাহের কয় মাসের মধ্যেই তাদের সন্তান হলে তাদের দুজনার দিকেই কি দশজনে চেয়ে হাসাহাসি করত না!

বিবাহ করবে না এমন কথা তো নয়, বিবাহ করবেই বলেছিল যখন তখন এ কি ব্যবহার! আর শুধু কি সন্তানকে নিয়েই তাদের লোকে হাসাহাসি করত, তাদের চরিত্রের ওপরে ইঙ্গিত করতে কসুর করত না! এই সামান্য ব্যাপারটা শর্বরী বুঝলে না, বুঝতে চাইল না। তার অসঙ্গত জিদটাই হলো বড়। যুক্তি তর্ক সব ভেসে গেল।

হঠাৎ শৈবালের নজরে পড়ল সামনের টেবিলের ওপরে শর্বরীর ফটোটা। নতুন করে সমস্ত স্মৃতিকে জড়িয়ে যেন আবার শর্বরী মনের সামনে এসে

শর্ত।— ও দিনের কত মধুর স্মৃতি। মনটা যেন কেমন করে ওঠে শৈবালের।

হ্যাঁ যা মনে পড়ে। টুকরো টুকরো হাসি গল্প গান। এই সুদীর্ঘ কয় বৎসরের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার কত কথা।

টুকরো টুকরো মান অভিমান। প্রথম প্রথম পরস্পরকে পরস্পরের দেখবার জন্য সেহ ব্যাকুল প্রতীক্ষা। চুরি করে পরস্পরের দিকে চাওয়া। অন্যের অলক্ষ্যে চোখের কোণে হাসা। ইচ্ছা করে পরস্পরকে পরস্পরের আলতো ভাবে স্পর্শ করা।

মনে পড়ে তাদের সেই প্রথম ঘনিষ্ঠতার দিনগুলো।

মধ্যে মধ্যে শৈবাল ক্লাস কামাই করে পালাত। শর্বরীকে বললে কিন্তু সে শুনতো না। শর্বরী কখনো কোন দিন কারো কোন লেকচার মিস করেনি।

একদিন শর্বরী ক্লাস করছে, কৌশলে বাইরে থেকে একটা স্লিপ শৈবাল ক্লাসে পাঠিয়ে দিয়েছে। একটু পরেই শর্বরী বাইরে বের হয়ে এলো।

করিডরে থামের পাশে দাঁড়িয়ে শৈবাল প্রতীক্ষায়।

স্লিপটা হাতে শর্বরী তাড়তাড়ি সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছে, চাপা কণ্ঠে পিছন থেকে ডাকে শৈবাল, শবী!

চমকে ফিরে দাঁড়াল শর্বরী।

এ কি তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ—

তোমার বলে ভীষণ মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, স্টুডেন্ট্‌স কেবিনে শুয়ে আছো—

যাবো ভাবছিলাম। তুমি না এলে সত্যিই যেতাম।

ওঃ, মিথ্যে কথা বলে আমাকে ক্লাস থেকে নিয়ে এলে।

না হলে যে তুমি আসো না। চল—

কোথায়?

আপাততঃ কোন রেঁস্তরাতে—

ক্লাস কামাই করে?

ওসব শুনতে চাই না, যাবে কিনা বলো!

সত্যি তুমি এমন জুলুম করো! তারপরই শৈবালের মুখের দিকে চেয়ে বলেছে, থাক আর মুখ গোমড়া করতে হবে না। চল—

এমনি একটা আধটা নয়, কোন উপরোধই শৈবালের সে উপেক্ষা করেনি, সে ন্যায়ই হোক, বা অন্যায়ই হোক, সেই শর্বরী আজ তাকে এইভাবে উপেক্ষা করে চলে গেল। কোন যুক্তি মানলো না। কোন কথা শুনলো না।

শৈবাল আর স্থির থাকতে পারে না।

গাড়ি নিয়ে ছুটলো শর্বরীদের ওখানে। কিন্তু আশ্চর্য! সেখানে গিয়ে শুনল শর্বরী তখনো গৃহে ফেরেনি! হতাশ হয়ে ফিরে এলো শৈবাল।

সারাটা রাত শৈবাল ঘুমোতে পারলে না। ছটফট করে। কখনো শয্যায় গিয়ে শোয়, আবার কখনো অস্থিরপদে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে। একটার পর একটা সিগ্রেটই কেবল ধ্বংস হয়। অ্যাসট্রেটা সিগারেটের ধ্বংসাবশেষে স্তূপাকার হয়ে উপচে পড়ে।

কখনো রাগ কখনো অভিমান। কখনো তৃষ্ণা কখনো বিতৃষ্ণা, কখনো দুঃখ কখনো লজ্জা, বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে। এবং সারাটা রাত ছটফট করে বিনিদ্র কাটিয়ে পরের দিন আবার সকালেই হাসপাতালে ছুটে যায় শৈবাল। না, এমনি করে শর্বরীকে সে কিছুতেই চলে যেতে দেবে না।

কিন্তু বেলা দশটা পর্যন্ত শর্বরীর অপেক্ষায় হাসপাতালে বসে থেকেও যখন শর্বরীর দেখা মেলে না, তখন শৈবাল হাসপাতালে খোঁজ করতে গিয়ে শোনে গতরাত্রে তিনটের সময় শর্বরী হাসপাতালে এসেছিল, ভোর ছটায় আবার চলে গিয়েছে।

ছুটলো আবার শৈবাল গাড়ি নিয়ে শর্বরীদের বাসার দিকে।

গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে সোজা শৈবাল শর্বরীদের বাসায় গিয়ে প্রবেশ করল।

সমস্ত বাড়টা যেন অদ্ভুত শান্ত! থমথম করছে।

এ বাড়িতে শৈবাল যথেষ্টই পরিচিত, তাই সোজা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলে শর্বরীর ঘরের দিকে, কিন্তু শেখরনাথের ঘরের খোলা দরজা বরাবর আসতেই শেখরনাথের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়ায়।

কে?—

আমি শৈবাল।

শর্বরী এখানে নেই!

শেখরনাথের কণ্ঠস্বর ও কথাগুলো কেমন যেন বেতালা বাজে শৈবালের কানে। প্রথমটায় ঠিক ও বুঝে উঠতে পারে না ব্যাপারটা কি! শর্বরী এখানে নেই কথাটার মানে কি? তবে কি শর্বরী কাল রাত্রে তার চেম্বার থেকে ফিরে আর বাড়িতেই ফেরেনি! সোজা কি হাসপাতালে গিয়েছিল! কিন্তু তাই বা কি করে হবে! হাসপাতালে তো এইমাত্র শৈবাল শুনে এলো রাত তিনটের পর

শর্বরী হাসপাতালে গিয়েছিল! তবে ?—

একটু ইতস্তত: করে শৈবাল প্রশ্ন করে, শর্বরী তো হাসপাতালেও নেই। শুনলাম বাড়ি থেকেই নাকি সে কাল রাত্রে হাসপাতালে গিয়েছিল—

জানি না। এ বাড়ির সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই।

অদ্ভুত গম্ভীর কণ্ঠে কথাগুলো বললেন শর্বরীর পিতা শেখরনাথ। কথাগুলো যেন তীব্র একটা বিস্ময়ের কশাঘাত করে শৈবালকে। কয়েকটা মুহূর্ত সে কোন কথাই বলতে পারে না। বোবার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এ বাড়ির সঙ্গে শর্বরীর কোন সম্পর্ক নেই! আর কেউ না জানুক, শৈবালের তো অবিদিত নেই শর্বরী শেখরনাথের জীবনে কতোখানি। কি অদ্ভুত একটা স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্ক পিতা ও পুত্রীর মধ্যে, শুধু প্রীতি ও স্নেহ বললেই বোধ হয় সবটা বলা হয় না, অনির্বচনীয় একটা আকর্ষণ আছে যেন ঐ অসমবয়সী পিতা ও পুত্রী দুটি পুরুষ ও নারীর মধ্যে।

আবার শেখরনাথ কথা বললেন, বললাম তো এখানে সে নেই! এখান থেকে যাও।

এখান থেকে যাও! একান্ত রূঢ় কঠিন ও অপ্রত্যাশিত হলেও সুস্পষ্ট যাবার নির্দেশ। অতএব আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

শৈবাল বের হয়ে এলো। এবং সোজা গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিল।

এখনো চোখের উপর ভাসছে আরাম চেয়ারটার উপরে পরিচিত অর্ধশায়িত ভঙ্গীতে উপবিষ্ট পঙ্গু শেখরনাথের ছবিটা। নিম্নাঙ্গ তো পঙ্গু পাথর হয়ে গিয়েছেই, উর্ধ্বাঙ্গ, মুখখানাও যেন নিষ্প্রাণ ভাবলেশহীন পাথরের মত খোদাই করা মনে হলো।

শৈবাল সামনে দাঁড়ানো সত্ত্বেও একটিবারের জন্যও চোখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। শৈবাল যে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেন গ্রাহ্যই করলেন না তিনি ব্যাপারটা।

কিন্তু সত্যিই ব্যাপারটা কি!

তবে কি তাদের সমস্ত কথা শেখরনাথ জেনেছেন! কিন্তু জেনেই যদি থাকেন,—এও নিশ্চয়ই জেনেছেন, শৈবালের বিবাহে আপত্তি ছিল না। পরক্ষণেই মনে হয় শর্বরী যদি সে কথা—মানে তাদের বিবাহের সম্ভাবনার কথাটা বাদ দিয়ে বাকী কথাগুলো তাকে বলে থাকে। যার ফলে যা অনিবার্য তাই ঘটেছে, তাকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। বিবাহকে বাদ দিয়ে শেখরনাথ তাঁর কন্যার মাতৃত্বকে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি।

না, না—তাও কি সম্ভব! শর্বরী মুখে তাকে যাই বলে আসুক, এমনি করে নিশ্চয়ই তাকে অপমানিত করেনি। এত বড় পাগলামি সে নিশ্চয়ই করেনি। রাগ ও উত্তেজনার সামান্য একটু কথা-কাটাকাটির জন্য এত বড় ভুল সে নিশ্চয়ই করবে না।

দু দিন বাদে মাথা ঠাণ্ডা হলে নিশ্চয়ই সে তার ভুল বুঝতে পারবে।

গাড়ি চালাতে চালাতে সতৃষ্ণ নয়নে আশেপাশে ও সম্মুখের জনারণ্যের মধ্যে অসংখ্য নরনারীর মুখের আদলে শৈবাল কেবলই যেন একটি পরিচিত মুখের সন্ধান করতে লাগলো। আর শর্বরী তখন মীনাক্ষীর ঘরে শয্যার ওপরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

॥ ১৩ ॥

কখনো সংশয়, কখনো আশঙ্কা, কখনো অনুতাপ, নানাবিধ মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দেখতে দেখতে সাত-সাতটা দিন কেটে গেল শৈবালের। শর্বরীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। প্রত্যহ সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় হয়ত শর্বরীর সঙ্গে দেখা হবে এই আশায় আশায় হাসপাতালে গিয়ে সমস্ত হাসপাতালটা বার বার ঘুরে এলো। কিন্তু শর্বরীর দেখা পাওয়া গেল না।

অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছে কিন্তু কেউ বলেনি যে, সে শর্বরীকে দেখেছে হাসপাতালে। অফিসে খোঁজ নিয়েছে, যদি সে ছুটি নিয়ে থাকে, না, কোন সংবাদ নেই। অফিসও কিছু জানে না।

দু-চারজন পরিচিত বন্ধুবান্ধব, যাদের ওখানে শর্বরী মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করত সেখানে গিয়েও তার সন্ধান পায়নি। কেউ শর্বরীর কোন সংবাদ জানে না।

আবার একদিন ইতিমধ্যে অনেক দ্বিধা, অনেক সঙ্কোচে শর্বরীর বাসা পর্যন্ত গিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ গলির মধ্যে টুটুর সঙ্গে দেখা।

টুটু তখন হাফ্ প্যান্ট্ ও গায়ে ইউনিফর্ম চাপিয়ে ক্লাবে খেলতে চলেছে।

টুটুবাবু যে, শোন! শোন না!

এখন শোনবার সময় নেই শৈবালদা। দেরি হয়ে গিয়েছে।

শোন টুটুবাবু! একটা কথা। তোমার দিদি বাসায় আছে?

দিদি! দিদি তো সাত দিন হলো অনেক দূরে চলে গেছে।

অনেক দূরে! কোথায়?

তা তো জানি না। দিদি বলেছিল অনেক দূরে।

ঠিকানাটা তার এনে দিতে পারো?

ঠিকানা দিদির জানি না। যান না, ছোড়দি বাসায় আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করুন গে!

টুটু আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

শৈবাল কিছুক্ষণ গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে ট্রাম রাস্তায় যেখানে তার গাড়িটা পার্ক করে রেখে গিয়েছিল, সেখানে ফিরে এলো; বাড়ি পর্যন্ত যেতে সাহস হলো না। বাইরের ঘরেই পঙ্গু শেখরনাথ বসে আছেন, যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আবার।

কিন্তু আশ্চর্য। গেলই বা কোথায় শর্বরী! হঠাৎ এভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলই বা কোথায়? তবে কি সে কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেল। মনের মধ্যে অস্বস্তিটা যেন ক্রমেই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। চলতে থাকে একটা পীড়ন লজ্জা আত্মগ্লানি ও অনুশোচনার অন্তর্দাহ।

হাসপাতালে যেতে হবেই। শৈবালও হাসপাতালে যায়। সেই একঘেয়ে রুটিনবাঁধা জীবন। আউটডোর আর ইনডোর, রোগী দেখে তাদের অনুযোগ অভিযোগ, ডাক্তারবাবু দেড় মাস হয়ে গেল ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু কই কোন উপকারই তো পাচ্ছি না। একটু দয়া করে ভাল ওষুধ দিন না ডাক্তারবাবু।

কেউ আবার বলে, ডাক্তারবাবু আমার রক্তটা একবার পরীক্ষা করলে হতো না। রোগ আমার শরীরের ভিতরে, রক্ত না পরীক্ষা করলে কি ধরা পড়বে? কেউ বলে, অনেক দূর থেকে আসছি ডাক্তারবাবু, দশ দিনের মত দয়া করে ওষুধ দিয়ে দিন। কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করে, রোগটা কি ডাক্তারবাবু? অন্ত নেই অনুযোগ, অভিযোগ আর দাবীর। কত রকমের কত কথাই যে শুনতে হয়।

কারও কথায় শৈবাল হয়ত কানই দেয় না। কাউকে হয়ত দেয় কয়েকটা ঔষধের নাম লিখে, কাউকে হয়ত খিঁচিয়ে ওঠে, রক্ত পরীক্ষা করতে হবে না হবে সে আমি বুঝবো। কাউকে বলে, রোগের নাম শুনলেই সব বুঝে ফেলবেন?

একঘেয়ে কাজ দিনের পর দিন। কোথাও যেন সাড়া নেই। সব যেন মিথ্যে বলে মনে হয়। ক্লান্তিতে দেহ-মন অবসন্ন নির্জীব হয়ে আসে।

চেম্বারেও যেতে হয়। সেখানে কোন রোগীর পদার্পণ হোক আর নাই হোক, যেতে হবেই।

রূপোপজীবিনীদের মত সময়মত সেজেগুজে দোকানে বসতে হবেই। রোগী আসুক চাই নাই আসুক।

চেম্বারের নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেও চেয়ার ছেড়ে ওঠে না। অদ্ভুত এক শৈথিল্যে দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘোরানো চেয়ারটার উপর বসে থাকে।

চেম্বারের সুইংডোরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বাইরে কোন পদশব্দ পেলেই চকিত হয়ে ওঠে। কিসের প্রতীক্ষায় চোখের দৃষ্টি যেন উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। কিসের যেন এক প্রত্যাশা। কিন্তু সে প্রত্যাশার কই কোন সাড়াই তো মেলে না!

অপরাধবোধে পীড়িত মন থেকে থেকে শুধু প্রশ্ন করে, গেল কোথায় শর্বরী। তুচ্ছ একটা কথায় অভিমান করে কেমন করে এতদিনকার সকল সম্পর্ক সহসা ছিন্ন করে দিয়ে চলে গেল শর্বরী!

এতকালের জানাজানি ও গড়ে-ওঠা প্রীতির মধ্যে কি কোন সত্যই ছিল না। সবই কি মিথ্যা ভুয়ো বালির বাঁধের উপরেই খাড়া হয়ে ছিল। সামান্য একটা ঝড়ের ঝাপটায় সব মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! ভীরু মন যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে বার বার।

প্রথমটায় সে শবরীর কথায় রাজী হতে পারেনি। কারণ, বিবাহের প্রস্তাবে নিজেকে হঠাৎ কেমন যেন তার ছোট মনে হয়েছিল। তার পৌরুষের ভ্যানিটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সত্য।

হ্যাঁ। অস্বীকার সে করতে পারে না। কিন্তু তা'লেও শেষ পর্যন্ত বিবাহে তো সে সম্মতিই দিয়েছিল। দিতে চেয়েছিল তো স্বীকৃতি তার অনাগত সন্তানকে।

তবে। তবে কেন শর্বরী তাকে ত্যাগ করে গেল। ত্রুটি না হয় তার হয়েই ছিল। তাই বলে কি তার ক্ষমা নেই!

এলোমেলো অসংলগ্ন কত কথাই শৈবালের মনে হয় আজ। শর্বরীকে কেন্দ্র করে কত দিনের কত তুচ্ছ খুঁটিনাটি কথা। এবং মাত্র সাত-আট দিনের অদর্শনে আজ বুঝতে পারে শৈবাল, শর্বরী তার জীবনের কতখানি অধিকার করে ছিল। শর্বরী চলে যাওয়ায় আজ তার অনেকখানিই যেন খালি হয়ে গিয়েছে।—শূন্য ফাঁকা হয়ে গিয়েছে তার চারিদিক, সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎটাই যেন।

॥ ১৪ ॥

শুধু সেই দিনই বেলা বারোটা পর্যন্ত নয়; পর পর সাত দিন দিবারাত্র শর্বরী কেবল বেশীর ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিল।

মীনুদির বাড়ি থেকে কোথাও বের হলো না।

ভিতরে ভিতরে যে সে কতখানি পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছিল তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি।

দীর্ঘ সাত দিন ধরে বেশীর ভাগ সময়ই দিনে রাত্রে ঘুমিয়ে যেন সেটা সেপ্রথম উপলব্ধি করলে। মীনাক্ষীও তাকে বাধা দেয়নি।

অনেকদিনকার বান্ধবী শর্বরী তার, শর্বরীকে সে ভাল করেই চিনত। অত্যন্ত মিতবাক শর্বরীর চরিত্রের মধ্যে যে একটা ইস্পাতের মতই ঋজু কঠিন দৃঢ়তা ছিল সেটা তার অবিদিত ছিল না। সাধারণ আর দশজন এদেশের মেয়েদের মত ভাবপ্রবণতা বা নাটুকেপনা শর্বরীর চরিত্রে ছিল না। অত বড় দুঃখেও যেমন তার চোখ দিয়ে কেউ কখনো জল ঝরতে দেখেনি, তেমনি অতি বড় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেও তাকে দেখেনি সে।

চিরদিনের কাজ-পাগল, কর্মব্যস্ত শর্বরী। সেই শর্বরীকে সাত-সাতটা দিন ও রাত্রে নিদ্রা যেতে দেখে মীনাক্ষী একটু আশ্চর্যই হয়েছিল। তাছাড়া আর একটা কথা, দিন তিনেক আগেই মাত্র শর্বরী এসে তাকে জানিয়েছিল শৈবালের সঙ্গে তার রেজেষ্ট্রি ম্যারেজ হবে এবং তাকে সে ব্যাপারে অন্যতম সাক্ষী থাকতে হবে। তবে কি শর্বরী তার সঙ্গে রসিকতা করেছিল সেদিন! তিন দিনের মধ্যে তারপর আর দেখা নেই এবং হঠাৎ ফিরে এলো সে সুটকেশ হাতে এখানে থাকবার জন্য। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায় মীনাক্ষীর, অথচ মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারে না শর্বরীকে।

যাহোক ঐ ধরনের শৈথিল্য ও নিষ্ক্রিয়তা কখনোও মীনাক্ষী শর্বরীর মধ্যে ইতিপূর্বে দেখেনি। তাই মনে মনে নানাকারণে বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেও তাকে কোনরূপ প্রশ্ন করতে সাহস পায় না।

নিজে থেকে মুখ না খুললে তার কাছ থেকে কোনরূপ জবাব পাওয়া দুঃসাধ্য। অতএব চুপ করে অপেক্ষাই করে মীনাক্ষী।

ঠিক সাত দিন পরে শর্বরী সন্ধ্যার দিকে ঘুম থেকে উঠে সোজা বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করল। ঐ সন্ধ্যাতেই স্নান করে জামাকাপড় পরে যখন সে বাইরের টানা বারান্দায় মীনাক্ষী যেখানে বসে বসে চা পান করছিল সেখানে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল।

সামনেই একটা বেতের টিপয়ের উপরে চায়ের সরঞ্জাম তখনও রয়েছে।

টিপটে চা আছে? মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে শর্বরী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। কিন্তু বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। সরলাকে বল না আরো কিছু গরম চা দিয়ে যেতে।

শর্বরী উঠে গিয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিচে রান্নাঘরে ব্যস্ত সরলাকে ডেকে চা দিয়ে যেতে বলল।

মীনাক্ষী চায়ের কাপে মধ্যে মধ্যে চুমুক দিচ্ছে।

শর্বরী নিজের চেয়ারে চুপচাপ বসে।

খানিক পরে সরলা এসে টিপটে নতুন করে চা দিয়ে গরম জল ঢেলে দিয়ে গেল। তার অল্পক্ষণ বাদে নিজের জন্য কাপে চা ঢালতে ঢালতে মীনাক্ষীকে প্রশ্ন করে শর্বরী, তোমাকে চা আর দেবো মীনুদি ?

না।

বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করে জমাট বেঁধে উঠছে। ভাল করে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। শর্বরীর মুখ দেখা যাচ্ছে না ভাল করে।

হঠাৎ একসময় মীনাক্ষী প্রশ্ন করে, কোথাও বেরুবি নাকি ?

হ্যাঁ, একটু বেরুবো ভাবছি।

কখন ফিরবি ?

খুব বেশী দেরি হবে না।

একটা কথার জবাব দিবি শর্বরী ?

বল।

তোর ব্যাপারটা কি বল্‌ তো ?

কেন! কি আবার!

সাত দিন কোথাও বের হলি না। কেবল পড়ে পড়ে ঘুমোলি। হাসপাতাল কি ছেড়ে দিয়েছিস নাকি ?

ছেড়ে দিইনি তবে ছেড়ে দেবো ভাবছি। অদ্ভুত শান্ত শর্বরীর কণ্ঠস্বর। কোন দ্বিধা বা জড়তা মাত্র যেন নেই।

ছেড়ে দিবি মানে। এবারে তাহলে প্রাইভেট্‌ প্র্যাকটিস্‌ শুরু করবি নাকি!

পেট চালাবার মত যা হোক একটা কিছু করতে হবে বৈকি। প্রাইভেট প্র্যাকটিস্‌ বা চাকরি যা জোটে!

কেন, হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিই বা করবি কেন ?

একদিন না একদিন হাসপাতালের চাকরি ত ছাড়তেই হবে। চিরদিন কিছু আর হাসপাতাল আমাকে Provide করবে না।

কেন, হাসপাতালের কর্তৃপক্ষেরা তেমন কিছু বলেছে নাকি ?

না।

তবে! অন্য কোথায়ও চাকরি বা প্রাইভেট প্র্যাকটিসের কথাই বা ভাবছিস কেন ?

ভাবতে হবে বৈকি! আর সময় থাকতে ভাবাই ত ভাল মীনুদি!

মীনাক্ষী বুঝতে পারে শর্বরী অত সহজে ধরা দেবে না। অমনি করে প্রশ্ন করলেও সেও তাকে এড়িয়েই যাবে। তাই এবারে সোজাসুজিই মীনাক্ষী তাবে প্রশ্ন করে।

তুই যেন কি লুকোচ্ছিস শর্বরী ?

শর্বরী কোন জবাব দেয় না তবু। কেবল প্রত্যুত্তরে হেসে ওঠে মৃদু।

হাসছিস যে ?

হাসবো না ত কি কাঁদবো!

দেখ্‌ শর্বরী, আমার কাছ থেকে তুই নিজেকে লুকুতে পারবি না। সত্যি করে বল ত কি ব্যাপার তোর ? আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না। এই সাত দিন তুই আমার এখানে পড়ে পড়ে ঘুমোলি, একবার বাড়িতে গেলি না, হাসপাতালে গেলি না পর্যন্ত।

বাড়ি ছেড়ে চিরজন্মের মত আমি চলে এসেছি, শান্ত কণ্ঠে বলে শর্বরী।

বাড়ি ছেড়ে চিরজন্মের মত চলে এসেছিস মানে ?

বিস্ময়ে মীনাক্ষী যেন একেবারে বোবা বনে যায়। শর্বরীদের সংসারের কোন খবরই ত মীনাক্ষীর অবিদিত নেই। তার পঙ্গু বাপ শেখরনাথ। একটি বোন, ছোট একটি ভাই। শেখরনাথের পেনসনের টাকা কটাই বা। সবই ত চলে শর্বরীর রোজগারে। তাছাড়া মীনাক্ষী জানে শর্বরীর কাছে তার পঙ্গু বাপ কতখানি।

শর্বরী চুপ করে ছিল।

মীনাক্ষী তাই আবার পূর্বের প্রশ্নটাই করে, কি রে, জবাব দিচ্ছিস না যে ?

বললাম ত।

শর্বরী, আমার কাছে সব খুলে বল্‌।

যা বলবার তা ত বললাম। সত্যিই বাড়ি ছেড়ে আমি চলে এসেছি! বাবা আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে বলেছেন!

তোর বাবা! মানে মেসোমশাই বলেছেন!

হ্যাঁ।

মিথ্যে কথা! সত্যি বল ত ব্যাপারটা কি ?

তুমি বিশ্বাস না করলে কি করবো বল মীনুদি! তবে জেনো সত্যিই আমি সেখান থেকে আজ বিতাড়িত!

হুঁ। আর তোদের বিয়ে ?

বিয়ে!

হ্যাঁ।

হলো না।

হলো না মানে?

মানে আবার কি, হলো না। হবে না।

মুহূর্তকাল অতঃপর চুপ করে থাকে শর্বরী।

আবার প্রশ্ন করে, আমার কাছেও তুই গোপন করবি শর্বরী। সব কথা খুলে বলবি না!

তুমি আপনা হতেই একদিন হয়ত সব বুঝতে পারবে মীনুদি।

কিন্তু—

না। বিয়ের কথা থাক। তবে বাড়ি ছেড়ে চলে আসার ব্যাপারে এটুকু তুমি বিশ্বাস করতে পারো যে, নিজেকে পাছে গ্লানির মধ্যে টেনে নামিয়ে অপমান করতে হয় বলেই এতদিনকার নিজস্ব গৃহও আজ আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। তুমি ত জান মীনুদি। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু আত্মগ্লানি সইতে পারি না। চিরদিন বাবার কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছি যে, পুরুষ বা নারী যেই হোক, অন্যায় জুলুম, অবিচারেরর আত্মগ্লানিকে যে মাথা পেতে সহ্য করে তাকে সেই অপমানের কলঙ্ক হতে কেউ রক্ষা করতে পারে না।

কিন্তু আমি তো তোর বাবাকে জানি শর্বরী। তোকে তিনি অন্যায়ভাবে দোষারোপ করে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করবেন, সেও ত বিশ্বাস করতে পারছি না! বিশেষ করে—।

বাধা দিয়ে শর্বরী মৃদু হেসে জবাব দিল, মানুষের আত্মঅহমিকটা বড় সাংঘাতিক বস্তু মীনুদি! না হলে আমার বাবা পর্যন্ত আমার অপরাধের একটা দিকই দেখলেন, অন্য দিকটায় একটিবারের জন্য চোখ ফেরাতেও চাইলেন না। তুমি হয়ত ভেবেছো মীনুদি, এই সাতটা দিন কেবল বুঝি আমার ঘুমিয়েই কেটেছে। কিন্তু তা নয়। এই সাতটি দিন আমার নিজেকে আমি যাচাই করেছি। এবং এইটাই বুঝেছি, বাবা যখন আমাকে ক্ষমা করতে পারলেন না, জগতে কেউই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। তবে এও ঠিক আমি যা সত্য বলে জেনেছি সেই পথই আমার একমাত্র পথ। এবং এও আমি দেখতে চাই আবহমানকাল ধরে যা চলে আসছে তার মূলে কেবল চিরাচরিত সংস্কারই বাসা বেঁধে আছে, না অন্য কিছু! না—না মীনুদি, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে যে, একমাত্র সংস্কারই হবে সত্য, আর মানুষের অন্তরের যে স্বতঃস্ফূর্ত সত্য তা হয়ে যাবে মিথ্যে, একেবারে মূল্যহীন।

সহসা হাত বাড়িয়ে শর্বরীর একখানা হাত গভীর আগ্রহে চেপে ধরে মীনাক্ষী। বললে, লক্ষ্মী ভাই! সব কথা আমাকে খুলে বল্! এমনি করে সংশয়ের মধ্যে আর আমাকে রাখিসনে।

বলবো মীনুদি। অন্ততঃ তোমাকে সব কথাই আমি বলবো। আর কেউ না বুঝলেও আমি জানি অন্ততঃ তুমি আমাকে না বুঝলেও বুঝবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এখন আমাকে একটু উঠতে হবে। আমি একটু বাইরে যাবো।

চেয়ার থেকে উঠে সিঁড়ির দরজার দিকে এগুতে এগুতে হঠাৎ থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে শর্বরী বললে, একটা কথা মীনুদি, তোমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়নি! কেউ যদি আমার খোঁজে এখানে আসে, আমি যে এখানে আছি বলো না কিন্তু—

শর্বরী কথাটা শেষ করে আবার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

কিন্তু কখন ফিরবি ?

বেশী রাত হবে না।

॥ ১৫ ॥

শর্বরী সরু গলি-পথটা অতিক্রম করে ট্রাম রাস্তায় এসে পড়ল। ট্রাম রাস্তা ধরে একটু এগুতেই একটা খালি ট্যাক্সী পেয়ে হাত-ইশারায় ট্যাক্সীটা থামিয়ে উঠে বসল।

কোথায় যেতে হবে ?—ট্যাক্সীওয়ালা ঘুরে প্রশ্ন করে।

থিয়েটার রোড।

প্রফেসার চৌধুরীর নার্সিং হোম থিয়েটার রোডে। একতালায় চেম্বার ও দশটি বেডের নার্সিং হোম এবং দোতালায় প্রফেসার থাকেন।

রাত্রি প্রায় পৌনে আটটায় শর্বরী ট্যাক্সী থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নার্সিং হোমের গেটের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। দারোয়ানের কাছে সংবাদ নিয়ে জানতে পারল প্রফেসার উপরেই আছেন।

ব্যাচিলার লোক প্রফেসার চৌধুরী। উপরের তলায় বেশ বড় সাইজের তিনখানা ঘর নিয়ে থাকেন একটি কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড নিয়ে। কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ডটি একটি প্রৌঢ়। সে-ই প্রফেসারের খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য সব কিছুর দেখাশোনা করে। রঘুনাথ। লোকটি যেমন বিশ্বাসী, তেমনি ধর্মভীরু। প্রফেসারকে সে সত্যিই ভালবাসে। প্রায় পনের বৎসর প্রফেসারের সঙ্গে আছে।

বাকী দুটো ঘরের মধ্যে একটা লাইব্রেরী ও বসবাসের ঘর, অন্যটায় ছোট-খাটো একটা ল্যাবরেটরি। তৃতীয় ঘরটিতে শয়ন করেন প্রফেসার চৌধুরী।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর চেম্বার বন্ধ করে সেই যে প্রফেসার উপরে ওঠেন, খুব বিশেষ কাজ না পড়লে কখনো বড় একটা নামেন না, এবং কারো সঙ্গে দেখাও করেন না।

দারোয়ানকে শর্বরী বলল, ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে সে একটিবার দেখা করতে চায়।

মাথা নেড়ে দারোয়ান জবাব দেয়, সাহেব এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।

শর্বরী বললো, সে একটা শ্লিপে তার নাম লিখে দিচ্ছে, দারোয়ান একবাব সাহেবের কাছে নিয়ে যাক।

কিন্তু রাত্রে এ সময় সাহেব কারো সঙ্গে ত দেখা করেন না। দারোয়ান তবু আপত্তি জানায়।

এমন সময় দেখা গেল ভৃত্য রঘুনাথ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। রঘুনাথ শর্বরীকে দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলতে দেখে প্রশ্ন করে, কি হয়েছে দারোয়ানজী ?

দারোয়ান শর্বরীকে দেখিয়ে রঘুনাথকে বললে, এই মাঈজী সাহেবের দেখা করতে চায়। ক দন

রঘুনাথ ইতিপূর্বে শর্বরীকে দেখেছে সাহেবের নার্সিং হোমে দু-তিনং তাকে সে চিনতও, কিন্তু ঐ সময় কালো একটা ভেইলে শর্বরীর মুখটা চ থাকায় তাকে চিনতে পারল না। বললে, এ সময় ত সাহেব কারো সঙ্গে দেখ করেন না। জরুরী কোন কেস যদি থাকে নাম-ঠিকানা রেখে যান। আমি দিয়ে দেবোখন। শর্বরী মাথার ভেইলটা সামান্য একটু সরিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকল, রঘুনাথ!

গলার স্বরে এবারে রঘুনাথ শর্বরীকে চিনতে পারে। বলে, কে, দিদিমণি!

আমি এসেছি একবার সাহেবকে খবর দেবে ?

একটু ইতস্ততঃ করে রঘুনাথ এবারে বলে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি খবর দিচ্ছি।

রঘুনাথ উপরে চলে গেল।

শয়নঘরের সংলগ্ন সংকীর্ণ ব্যালকনীতে একটা বেতের আরাম-কেদারার উপরে বসে ছিলেন প্রফেসর চৌধুরী। সামনের একটা ছোট ত্রিপয়ের উপরে ভ্যাট্ ৬৯-এর একটি বোতল, একটি সোডাসাইফন, অর্ধ-নিঃশেষিত একটি পেগ্ গ্লাস, একটি অ্যাসট্রে ও সিগারেটের একটি টিন ও লাইটার।

বিশেষ জরুরী কেস বা একান্ত অনুরোধ কারো না এড়াতে পারা ছাড়া ঐ

সময়টা ডাঃ চৌধুরী বড একটা কোথাও বের হন না। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, ঐ খোলা সংকীর্ণ ব্যালকনীতে বসে নিয়মিত ড্রিংক করা তাঁর বহুদিনের অভ্যাস।

আজও সন্ধ্যার পর চেম্বারের কাজকর্ম সেরে এসে কিছুক্ষণ হলো জামাকাপড ছেড়ে গায়ে একটা কিমোনো চাপিয়ে নিত্যকারের মত ব্যালকনীতে বসেছিলেন। রঘুনাথ বোতল, সোডাসাইফন, গ্লাস ইত্যাদি সামনের ত্রিপয়ের ওপরে রেখে মিনিট পনের মাত্র গিয়েছে। পদশব্দে ডাঃ চৌধুরী মুখ তুলে তাকালেন, কিরে রঘু?

হাসপাতালের সেই ডাঃ দিদিমণি এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

চমকে উঠলেন ডাঃ চৌধুরী, কে। শর্বরী!

যিনি আপনার সঙ্গে কাজ করেন।

গত সাত দিন ধরে প্রফেসার শর্বরীর কোন সংবাদ পাননি। ভিতরে ভিতরে শর্বরীর এই একটানা সাত দিনের অদর্শনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেও মুখে বা হাবভাবে কখনও সেটা প্রকাশ পায়নি। একটু ভেবে আশ্চর্যই হয়েছিলেন সাত দিন ধরে শর্বরীর কোনরূপ সংবাদ না পাওয়ায়। সাত দিন আগে মাঝরাতে তাঁর ফোনের [illegible]শ পেয়ে শর্বরী তার বাসা থেকে হাসপাতালে গিয়েছিল এবং বাকী রাতটুকু শর্বরী [illegible]তালে কাটিয়ে পরের দিন সকালে সেই যে কোথায় চলে গেল এ কয়দিন ধরে [illegible]র তার কোন সংবাদই পাওয়া যায়নি।

উঠে রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, যা, তাকে উপরে নিয়ে আয়। আমার শোবার ঘরে বসা।

রঘুনাথ প্রভুর নির্দেশে যেন একটু বিস্মিতই হয়। আজ পর্যন্ত কখনো সে কোন নারীকে ত নয়ই কোন পুরুষকেও ঐ ঘরে ঢুকতে দেখেনি। কিন্তু স্বল্পভাষী মনিবের কথার উপরে কথা বলতে তার সাহসে কুলোয় না। নির্দেশ পালনের জন্য সে নিচে চলে গেল যেন একটু আশ্চর্য হয়েই।

শর্বরী সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, রঘুনাথ ফিরে আসতেই সে তার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

উপরে আসুন।

রঘুনাথকে অনুসরণ করে শর্বরী দোতলায় উঠে আসে।

রঘুনাথ তার প্রভুর নির্দেশ মত শর্বরীকে শয়নঘরের মধ্যেই সোজা নিয়ে আসে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে শর্বরী একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। অত্যন্ত ছিমছাম ঘরখানি। আসবাবপত্রের তেমন কোন বাহুল্যই নেই।

মেঝেতে পুরু ইজিপসিয়ান কার্পেট বিছানো, মধ্যস্থলে একটি কাচের গোল

টেবিল তার উপরে একটি টাইমপিস বসানো, সবুজ ঘেরাটোপ দেওয়া টেবিল ল্যাম্প। তার পাশে জয়পুরী একটি ফ্লাওয়ার ভাসে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। এক কোণে একটি সিঙ্গল্ খাটে বেড-কভারে ঢাকা শয্যা। অন্য পাশে একটি প্রমাণ আয়না-বসানো আলমারি, এবং তারই পাশে একটি আলনায় কিছু পোশাক।

ঘরের দেওয়ালে খানদুই এনলার্জড ফটো, একটি সাহেবী পোশাক পরিহিত প্রফেসারের নিজের, অন্যটি একটি তরুণীর।

গোল টেবিলটার দুপাশে দুটি গদিমোড়া কোচ।

তারই একটা নির্দেশ করে রঘুনাথ শর্বরীকে বসতে বললে। শর্বরী কোচের উপরে বসল।

রঘুনাথ ঘরে থেকে বের হয়ে গেল।

মিনিট তিন-চার বাদে পদশব্দে মুখ তুলতেই শর্বরীর সঙ্গে প্রফেসার চৌধুরীর চোখাচোখি হয়ে গেল।

শর্বরী উঠে দাঁড়াচ্ছিল, প্রফেসার বাধা দিলেন, বোস, বোস।

প্রফেসার এগিয়ে এসে দ্বিতীয় খালি সোফাটিতে উপবেশন করলেন, এ ক দিন হাসপাতালে তোমাকে দেখিনি শর্বরী। অসুখ-বিসুখ করেনি ত কিছু!

না। শরীর আমার ভালই স্যার।

তারপর দুজনারই বলবার সব কথা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়েছে। দুজনাই চুপচাপ।

শর্বরীই আবার কথা শুরু করে, আপনার ত অনেকের সঙ্গে জানা-শোনা আছে স্যার! আমাকে বাইরে কোথাও একটা কাজ যদি করে দেন।

কেন! তুমি আমাদের হাসপাতালে কি আর কাজ করতে চাও না?

না। আমি কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে চাই।

But my dear! Did you think about your future! কলকাতার হাসপাতালের মত facilities ত অন্য কোথাও তুমি পাবে না!

তা জানি। তবু এ ছাড়া আর আমার উপায় নেই।

অবশ্য আমি তোমার personal ব্যাপারে encroach করতে চাই না। কিন্তু তুমি ত জান you are carrying! এ অবস্থায়—

সেই জন্যই আরো আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে চাই। সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচকে যেন একপ্রকার দূরে সরিয়ে দিয়েই কথাগুলো বললে শর্বরী।

কিছু মনে করো না শর্বরী! You know my feelings about you!

আমি যদি কোন কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি জবাব দেবে ?

শর্বরী চুপ করে থাকে, কোন জবাব দেয় না।

শর্বরী !

বলুন।

Are you engaged to some one or you have already married some—

শর্বরী মাথা নেড়ে বললে, না স্যার, কারো সঙ্গেই আমার কোন engagement হয়নি, আর—আর বিবাহ হয়নি। কথার শেষাংশে গলার স্বরটা কেমন একটু দ্বিধা ও সঙ্কোচে জড়িয়ে যায়। এক অন্তঃসত্ত্বা নারী—একজন তার চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠই শুধু নয়, তার শ্রদ্ধেয়ও বটে—পুরুষের মুখের সামনে বসে জবাব দিচ্ছে অসংকোচে সে কারো সঙ্গে বিবাহের চুক্তিতে আবদ্ধও নয় এবং কারো সঙ্গে তার বিবাহও হয়নি।

প্রফেসর শর্বরীর কথাটা শুনে এবারে কয়েকটা মুহূর্তের জন্য যেন বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে রইলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ডাঃ নির্বাণ চৌধুরীর বুঝতে কষ্ট হয় না যে, শর্বরী তার কাছে কিছু লুকোচ্ছে।

ঈষৎ হাসির একটি বঙ্কিম রেখা ডাঃ নির্বাণ চৌধুরীর ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে উঠলো। তিনি ধীর শান্তকণ্ঠে বললেন, তুমি জান শর্বরী নিশ্চয়ই যে তুমি সন্তানের মা হতে চলেছো !

শর্বরী মাথা নিচু করে।

ডাঃ চৌধুরী বলতে লাগলেন, আর এও তুমি জান, আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা বা মানুষের মন আজও এতখানি উদার হয়নি যে, আইন ও ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা স্বীকৃতি ছাড়া একমাত্র মায়ের পরিচয়েই সন্তানকে তার বুক পেতে গ্রহণ করবে, মায়ের legitimate child বলে সম্মান দেবে !

জানি।

তাহলে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো তোমার সন্তানকে বাঁচতে হলে তার একটা আইন বা ধর্মসঙ্গত জন্মস্বীকৃতি চাই। সমাজের একটা পরিচয়পত্র চাই। কুন্তীদেবীকেও কর্ণকে তার পিতা সূর্যের পরিচয়পত্র দিতে পারেন নি বলে জন্মমুহূর্তেই তাকে নদীর জলে বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

শর্বরী চুপ করে থাকে।

ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ করো না শর্বরী। মনে রেখো, যাকে তুমি পৃথিবীতে আনছো তার প্রতি মা হিসেবে তোমার একটা দায়িত্ব আছে। তার

জন্ম বা খেয়ে পরে কোনমতে বেঁচে থাকাটাই তার জীবনের শেষ ও একমাত্র কথা নয়। একদিন যদি বড় হয়ে সেই সন্তানই তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তার জন্ম-পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তোমাকে তার জবাব দিতে হবে সেদিন, এবং দিতে তুমি বাধ্য।

শর্বরীর সমস্ত মুখখানা যেন পাথরের মতই কঠিন হয়ে উঠলো, দৃঢ় শান্ত স্বরে সে বললে, তাহলেও কোন উপায় নেই স্যার। দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি যেমন বললেন, সে রকম দুর্দিনের মুখোমুখি হয়ে আমাকে যদি দাঁড়াতেও হয় ত দাঁড়াবো তবু যা আমি একবার মনে মনে সংকল্প করেছি তা থেকে বিচ্যুত হবো না। আপনি হয়ত জানেন না স্যার, ঠিক এই কারণেই নিজের বাবার কাছ থেকেও আমাকে চিরদিনের মত বিদায় নিয়ে আসতে হয়েছে।

অতঃপর প্রফেসর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

তাহলেই বুঝে দেখ, সংগ্রাম তোমার শুরু হয়ে গিয়েছে। পারবে শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে?

আশীর্বাদ করুন স্যার যেন পারি। তবু যেন নিজেকে চরম গ্লানির দুর্ভাগ্যের মধ্যে টেনে নামিয়ে ছোট না করি।

প্রফেসর চৌধুরী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। গত দুই বৎসরের বেশী সম্মুখে ঐ উপবিষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বল্পবাক মেয়েটিকে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে দেখে আসছেন। একদিক দিয়ে মেয়েটির অন্তর যেমন ফুলের মত কোমল, অন্যদিক দিয়ে চরিত্রে ওর আছে একটা লৌহকাঠিন্য। তবু তিনি শর্বরীর আজকের ব্যবহারে বিস্মিত না হয়ে পারছিলেন না, এবং শেষ চেষ্টা করলেন আর একবার।

শর্বরী!

বলুন।

কেউ কি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে? তা যদি করে থাকে, প্রতারককে এভাবে নিষ্কৃতি দিলে চরম ঘৃণ্য দুষ্কৃতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া গেলো। তার মধ্যে তোমার ভদ্রতাবোধ ও সৌন্দর্যবোধ থাকতে পারে কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজের প্রতি একজন সমাজভুক্তের কর্তব্য হতে তোমার বিচ্যুতি যে ঘটবে, নিশ্চয়ই সেটা অস্বীকার করতে পারো না।

না স্যার। সে রকম কিছু নয়।

তবে!

ক্ষমা করবেন স্যার, এর বেশী কিছু আমার পক্ষে এই মুহূর্তে বলা সম্ভবপর নহে।

সত্যি, উত্তরোত্তর প্রফেসারের বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না। যে তার গর্ভের সন্তানের জন্য দায়ী সে যখন প্রতারণা করছে না, তবে কেন এভাবে স্বেচ্ছায় কলঙ্ক নিয়ে সকল গুরুদায়িত্ব মাথায় পেতে নিতে চলেছে শর্বরী!

শর্বরীর কথা বা তাকে প্রফেসর চৌধুরী যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। সব কিছুই দুর্বোধ্য ঠেকে।

শর্বরী! তোমার কিছুই যে আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

স্বেচ্ছায় তাকে আমি মুক্তি দিয়ে এসেছি স্যার।

কি বলছ তুমি!

হ্যাঁ। স্বেচ্ছায় সব দায়িত্ব থেকে তাকে আমি মুক্তি দিয়ে এসেছি!

এর পর প্রফেসার চৌধুরীর মুখে সত্যি আর যেন কোন কথাই আসে না।

শর্বরী বলতে লাগল, আমার এই সংগ্রামের দিনে একমাত্র আপনার কথাই আমার মনে পড়লো। তাই আপনার কাছে আমি এসেছি। আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিন।

অনেকক্ষণ তারপর প্রফেসর চৌধুরী নিঃশব্দে বসে বসে যেন কি ভাবলেন। সম্মুখে ত্রিপয়ের ওপরে অ্যাসট্রেতে রক্ষিত জলন্ত সিগ্রেটটা কেবল পুড়ে পুড়ে ছাই হতে থাকে।

তারপর একসময় মুখ তুলে শর্বরীর দিকে তাকিয়ে কথা বললেন।

তুমি কলকাতার বাইরে যেতে চাও, তাই না?

হ্যাঁ।

ধানবাদ কোল ফিল্ড্‌ এরিয়ায় আমার এক বন্ধু একটা মেটার্নিটি হোম খুলেছেন, তিনি আমার কাছে একজন গাইনি ট্রেণ্ড্‌ ডাক্তার চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁর নামে তোমাকে একটা চিঠি দিয়ে যাচ্ছি। মাইনে অবশ্য খুব বেশী নয়, মাত্র ১৫০৲ টাকা, তবে ফ্রী কোয়ার্টার ও চাকর পাবে।

তাতেই আমার চলবে। আপনি অনুগ্রহ করে একটা চিঠি দিন তাহলে।

প্রফেসার নিজের লেটার প্যাডে তখুনি একটা চিঠি লিখে শর্বরীর হাতে তুলে দিলেন।

শর্বরী চলে যাবার আগে পায়ে হাত দিয়ে প্রফেসারকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই স্নিগ্ধ স্বরে প্রফেসার বললেন, একটা কথা তোমাকে যাবার আগে বলে দিচ্ছি শর্বরী। আজ যেমন তুমি আমার কাছে এসেছো, যদি কোনদিন ভবিষ্যতে আমার দ্বারা তেমনি তোমায় কোন উপকার হতে পারে বলে মনে করো ত সেদিন সোজা এমনি করে আমার কাছে আসতে দ্বিধা করো না।

তার

প্রফেসারের কথায় শর্বরীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। কোন মতে মাথা নিচু করে উদ্গত অশ্রুকে চাপতে চাপতে শর্বরী বললে, না স্যার, ভুলবো না। আপনার কথা কোন দিনই আমি ভুলবো না।

বেরিয়ে গেল শর্বরী।

প্রফেসার নিঃশব্দে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাত প্রায় পৌনে দশটা নাগাদ শর্বরী মীনুদির ওখানে ফিরে এলো।

মীনাক্ষী একটা ইজিচেয়ারের উপরে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে একটা বই পড়ছিল। শর্বরীর পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

সরলাকে ভাত দিতে বলি, ততক্ষণ বাথরুম থেকে ঘুরে আয় তুই। মীনাক্ষী বললে।

তাই বল। বলে শর্বরী হাতমুখ ধুয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

দুজনে টেবিলে খেতে বসেছে। কেউ কথা বলছে না।

শর্বরীই কথা শুরু করে, কাল সকালেই আমি চলে যাচ্ছি মীনুদি।

কাল সকালেই চলে যাচ্ছিস মানে ?

হ্যাঁ। চাকরি পেয়ে গিয়েছি। কালই গিয়ে জয়েন করবো।

এর মধ্যে আবার কোথা থেকে চাকরি জোটালি ?

পেয়ে গেলাম।

কিন্তু কোথায় ?

বেশী দূরে নয়, কলকাতা থেকে ঘণ্টা চার-পাঁচেকের রাস্তা।

কোথায় ?

বললাম ত।

তার মানে জায়গার নামটাও বলবি না ?

অজ্ঞাতবাসে চলেছি যে মীনুদি !

মীনাক্ষী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, কি যে তোর হয়েছে তার তুই-ই জানিস। বলবি না যখন কিছুই পীড়াপীড়িও আর করবো না। থাক্। যা তোর ইচ্ছে হয় কর্।

রাগ করো না মীনুদি। বলেছি ত একদিন সবই জানতে পারবে। এবং সেদিন তোমার আজকের এ রাগ থাকবে না যখন বুঝতে পারবে কত বড় লজ্জায় ও দুঃখে আজকে এইভাবে সব কিছু তোমার কাছেও গোপন করে আমায় যেতে হয়েছিল।

শর্বরীর শেষের কথায় মীনাক্ষী কোন জবাব দেয় না।

জিনিসপত্র বা লটবহরের কোন বালাই নেই। সামান্য একটা স্যুটকেশ মাত্র। এখানে অবশ্য এ কদিন মীনুদির ঘরে তার দেওয়া শয্যাতেই রাত কেটেছে। কিন্তু সেখানে চাকরির স্থলে কে তাকে শয্যা দেবে! তাই পরের দিন সকালেই শর্বরীর যাওয়া হলো না। অন্ততঃ শোবার মত বিছানাপত্র কিছু নিয়ে যেতেই হবে। সকালে বের হয়ে বাজার থেকে শর্বরী একপ্রস্থ তোশক, লেপ, বিছানার চাদর ও গোটা দুই বালিশ, একটা মশারি ও থান দুই শাড়ি কিনে নিয়ে এলো। সব কেনাকাটা করে হাতে আর অবশিষ্ট রইলো মাত্র তিরিশটি টাকা।

বেলা একটা পঞ্চান্নয় তুফানে যাওয়াই ঠিক করেছিল শর্বরী।

গোছগাছ করে শর্বরী মীনাক্ষীর সামনে এসে দাঁড়ালো। ট্রেনের এখনো ঘণ্টা চারেক সময় আছে। মীনাক্ষী চেয়ারে বসে একটা উলের মাফলার বুনছিল।

কিছুক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও মীনাক্ষী কথা বলছে না দেখে শর্বরী বললে, মীনুদি কি আমার সঙ্গে কথাও বলবে না!

মীনাক্ষী যেমন বুনছিল তেমনি বুনেই চলে, শর্বরীর কথার কোন জবাব দেয় না।

এখনো কথা বলছো না, কিন্তু পরে আমি চলে গেলে আফসোস করতে হবে এই ভেবে যে, আহা মেয়েটা যাবার সময় মুখ ভার করে চলে গেল। কেন মিথ্যে কথা বললাম না!

বয়ে গিয়েছে আমার ভাবতে।

মিথ্যে কেন বড়াই করছো মীনুদি! জানি ত তোমাকে আমি!

যে এমনি ইচ্ছে করে এমনি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে যায় তার কথা কেন মিথ্যে ভাবতে যাবো?

তবু ভাববে। এই দেখ না বাবার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে এসেছি, তবু এই চলে যাবার মুহূর্তে তাঁর কথাই বার বার মনে পড়ছে কেন আমার!

গত সন্ধ্যা থেকেই একটা কথা মীনাক্ষীর বার বার মনে হচ্ছিল, শর্বরীর শেষের কথায় সেই কথটা আর না বলে পারলে না। শৈবালের সঙ্গে শর্বরীর মন-জানাজানির ব্যাপারটা আর কেউ শর্বরীর বান্ধবীদের মধ্যে না জানলেও মীনাক্ষী জানত। এবং শুধু তাই নয়, পরস্পর যে ওরা পরস্পরের নিকট বাগদত্ত

সেটাও মীনাক্ষীর অজানা ছিল না। তারপর সেদিন এসে যে রেজেষ্ট্রী মতে বিবাহে অন্যতম সাক্ষী থাকতে হবে এও জানিয়ে গিয়েছিল। তাই গত সন্ধ্যা থেকেই মীনাক্ষীর মনে হচ্ছিল শৈবালের সঙ্গে শর্বরীর কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটেনি ত!

তাই সে স্পষ্টাস্পষ্টই বললে, হ্যাঁরে এই যে তুই কলকাতা ছেড়ে হঠাৎ চলে যাচ্ছিস শৈবাল জানে ত?

মীনাক্ষীর আচমকা প্রশ্নটা যেন সপাং করে একটা বেত্রাঘাতের মতই অতর্কিতে এসে শর্বরীকে একটা আঘাত করল। কয়েকটা মুহূর্ত সে কথাই বলতে পারলে না। মীনাক্ষীও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শর্বরীর মুখের দিকে প্রশ্নটা উত্থাপন করে।

শৈবাল-অধ্যায় আমার জীবনে শেষ হয়ে গিয়েছে মীনুদি।

এবারে যেন সত্যিসত্যিই বেত্রাহতের মত চমকে উঠল মীনাক্ষী, তার মানে?

মানে আর কি, বললাম ত!

সহসা মীনাক্ষী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে শর্বরীর একখানা হাত চেপে ধরে বললে, না, কিছুতেই তোকে আমি যেতে দেবো না সব কথা না শুনে। কী হয়েছে সর্বনাশী সব আমাকে খুলে তোকে বলতেই হবে। বল্—

বললাম ত। শৈবালের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে।

শেষ হয়ে গিয়েছে। কে শেষ করেছে, তুই?

হ্যাঁ। আমিই। অবাক্ হচ্ছো মীনুদি, না! ভাবছো নিশ্চয়ই এত বড় দুঃসাহস আমার কেমন করে হোলো, না?

তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে মুখপুড়ী! আর কেউ না জানুক, আমি ত জানি শৈবালের প্রতি তোর ভালবাসার কথা!

যখন তা জান, তখন এও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে কত বড় ব্যথায় সেই ভালবাসাকেও আমি পেছনে ফেলে যাচ্ছি। একটা কথা তোমার প্রায়ই শুনেছি মীনুদি, আমাদের মেয়েদের মত অসহায় প্রাণী পৃথিবীতে আর নেই। আর যখনই তুমি সে কথা বলেছো, আমি বলেছি যদি কখনও তেমন সময় আসে ত আমি নিশ্চয়ই প্রমাণ করে দেবো, মেয়েদের যতখানি তোমরা অসহায় ভাবো সবটুকুই তার পুরোপুরি সত্যি নয়। দৈহিক ও মানসিক গঠনে এবং এদেশের সামাজিক ব্যবস্থার দরুন যেটুকু তাদের অসহায়ত্ব, প্রয়োজন হলে সেটুকু কাটিয়ে উঠতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না।

ওসব বড় বড় লেকচার থামা মুখপুড়ী! বল্ শৈবালের সঙ্গে তোর কি

হয়েছে, আমি সব মিটিয়ে দেবো।

মিটিয়ে দেবে! তার মানে কিছুটা আমাকে কিছুটা তাকে বর্জন করতে হবে তোমার মধ্যস্থতায়, এই ত! কিন্তু তুমি এও ত জান মীনুদি, এই আপোষের ব্যাপারটা জীবনে চিরদিন আমি ঘৃণা করে এসেছি। ওটা চারিত্রিক দুর্বলতার নামান্তর মাত্র। না মীনুদি, তা আর হয় না। মনের মধ্যে একবার যেখানে চিড় খেয়েছে, সেখানে একটা মানানসই জোড়াতালি দিয়ে আর যেই মিটিয়ে নিতে পারুক, আমি পারবো না। জীবনের একমাত্র বন্ধু ও শিক্ষাগুরু আমার জন্মদাতা পিতা যিনি, তাঁর সঙ্গেই যখন মিটিযে নেওয়া সম্ভব হলো না তখন শৈবালের কথা ত উঠতেই পারে না।

কিন্তু পারবি? পারবি শৈবালের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক এমনি করে ছিন্ন করে থাকতে?

কেন পারবো না। নিশ্চই পারবো। একটা ভুল একদিন করে ফেলেছিলাম বলে সেটাকে পরে ভুল জেনেও তাকে আঁকড়ে থাকতে হবে, এই বা তোমাদের কোন যুক্তি!

কি বলছিস্ তুই। তোদের এতদিনকার সমস্ত কিছু সব ভুল!

নয় কি। তা না হলে আজ এমনি করে সব কিছুকে চিরদিনের মত অস্বীকার করে আমিই কি চলে যেতে পারতাম।

সরলা এসে জানাল খাবার তৈরী।

সরলার দিকে তাকিয়ে শর্বরী বললে, আমাদের দুজনার খাবার দাও সরলা।

তুই খেয়ে নে, আমি পরে খাবো। মীনাক্ষী বলে।

হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে ঝুঁকে নিচু হয়ে সস্নেহে মীনাক্ষীর কোলের ওপরে ন্যস্ত একখানা হাত ধরে প্রীতিমধুর কণ্ঠে শর্বরী বললে, কে জানে মীনুদি, হয় ত এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখাই হবে না। যাবার দিনটিতে আর মুখভার করে তোমাকে আমি থাকতে দেবো না। ওঠো। চল একসঙ্গে বসে আজ দুজনে খাবো। কই, ওঠো!

ইচ্ছা না থাকলেও মীনাক্ষী শর্বরীর ঐ অনুরোধটা যেন ঠেলতে পারে না। শর্বরীর গলার স্বরে এমন একটা করুণ আবেদন ফুটে ওঠে যেটাকে সে না মেনে কিছুতেই পারে না।

উঠতেই হলো মীনাক্ষীকে। এবং পাশাপাশি বসে শর্বরীর সঙ্গে খেতেও হলো।

আরো ঘণ্টা দুই পরে শর্বরী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। নিচে রাস্তায় ট্যাক্সী

অপেক্ষা করছে।

শর্বরী মীনাক্ষীর সামনে দাঁড়িয়ে বললে, তাহলে চললাম ভাই মীনুদি।

কোথায় যাচ্ছিস তাও ত বললি না। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিবি ত?

শর্বরী জবাবে কোন কথাই বলে না, কেবল তার ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা জেগে ওঠে।

কিরে, জবাব দিচ্ছিস না যে?

যে সঙ্কল্প নিয়ে চলেছি, সে সঙ্কল্প যদি কোন দিন আমার সফল হয়, তবে আবার নিজে এসে দেখা দেবো। আচ্ছা আজ চলি।

আর দ্বিতীয় কোন কথা না বলে শর্বরী সোজা নিচের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

আর ঐ শেষ মুহূর্তে শর্বরীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেন না জানি মীনাক্ষীর মনে হলো প্রচণ্ড একটা অন্তর্দ্বন্দ্বে মেয়েটা যেন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এবং শর্বরীর অপস্রয়মান দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা তার দুচক্ষের কোল বেয়ে নিঃশব্দে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

একটু পরে চলমান ট্যাক্সীর ইঞ্জিনের শব্দে বোঝা গেল, শর্বরী চলে গেল।

শর্বরী চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ মীনাক্ষী স্থির হয়ে বসে রইলো।

তারপর হঠাৎ কি একটা কথা মনে হওয়ায়, শয়নঘরে প্রবেশ করে রাইটিং প্যাড্‌টা টেনে নিয়ে খস্ খস্ করে শৈবালকে একটা পত্র লিখে সরলাকে দিয়ে চাকর নিধুকে ডেকে তক্ষুণি চিঠিটা শৈবালের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল, কিন্তু ঘণ্টা-খানেক বাদে চাকরটা এসে বললে, বাবুর দেখা সে পেল না, চিঠিটা রেখে এসেছে।

পরের দিন খুব ভোরেই শৈবাল এসে হাজির হলো।

মীনাক্ষী বারান্দায় বসে চা পান করছিল।

কি ব্যাপার মীনুদি? এত জরুরী তলব!

শৈবাল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো।

শর্বরীর সঙ্গে তোমার কি হয়েছে শৈবাল?

শৈবাল শর্বরীর নামটা শুনেই চমকে ওঠে, বলে, শর্বরী, কোথায় সে?

সে ত কাল চলে গেছে।

চলে গেছে, কোথায়?

জানি না। ঠিকানাটা সে কিছুতেই বলে গেল না।

ও।

কিন্তু আমার কথার তো জবাব দিলে না শৈবাল ?

য়্যা। শৈবাল যেন চম্‌কে ওঠে।

শৈবাল!

কী মীনুদি ?

কী হয়েছে তোমাদের ?

কই, কিছু তো হয়নি !

আমার কাছে লুকোচ্ছ শৈবাল !

আমি উঠি মীনুদি। শৈবাল উঠে দাঁড়ালো।

শৈবাল, শোন !

আর একদিন আসবো মীনুদি। বলে আর অপেক্ষা মাত্রও না করে শৈবাল সোজা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো।

স্তব্ধ মূহ্যমানের মত মীনাক্ষী বসে রইলো পূর্ববৎ চেয়ারটার উপরই।

॥ কালকূট ॥

ধানবাদ জংশনে নেমে আরো মাইল পনের-কুড়ি গেলে তবে শর্বরীর সেই নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থান।

এক-কামরাওয়ালা ইঞ্জিন-চালিত যানে চেপেই গন্তব্যস্থানটিতে যেতে হয়।

বিরাট একটি কোল ফিল্ড্। ধু-ধু শূন্য প্রান্তর স্তব্ধতায় যেন ঝিমুচ্ছে। আর আকাশের কোল ঘেঁষে ধূসর পাহাড়ের অস্পষ্ট ইঙ্গিত। অনেকখানি এরিয়া নিয়ে কোল ফিল্ডটি।

মাটির তল থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার কুলী-কামিন হাজার হাজার টন কয়লা লোহার গাঁইতি ঠুকে ঠুকে সংগ্রহ করছে। তারপর সেই কয়লা বিদ্যুৎ-চালিত লোহার টবে টবে ভর্তি হয়ে উপরে উঠে আসছে।

সেই সব কুলী-কামিন, অন্যান্য বিভাগীয় কর্মচারী, অফিসার ও তাদের ফ্যামিলি নিয়ে গড়ে উঠেছে একটা নাতিবৃহৎ শহর। ঐ এরিয়াতেই একটা ছোটখাটো হাসপাতাল ছিল এবং যাবতীয় ব্যাধির চিকিৎসা ঐ হাসপাতালেই চলছিল।

ডাঃ রমেন সাহা দীর্ঘকাল ধরে ঐ হাসপাতালটির চার্জে আছেন।

মাস দেড়েক হলো কর্তৃপক্ষকে রাজী করিয়ে ডাঃ সাহা হাসপাতালটির সংলগ্ন জায়গায় আরো একটা বাড়ি তৈরি করিয়ে সেখানে একটি প্রসূতি আগারের ব্যবস্থা করেছেন। এবং আপাততঃ পাঁচটি বেডের ব্যবস্থা করেছেন। ছোটখাটো একটি অপারেশন থিয়েটারও করেছেন এবং যতটা সম্ভব আধুনিক যন্ত্রপাতিও কর্তৃপক্ষের দ্বারা মঞ্জুর করিয়ে এনে অপারেশন থিয়েটারটিকে সাজিয়েছেন।

সেই প্রসূতি-আগারটির জন্যই স্ত্রীরোগ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান ও একস্-পিরিয়েন্স্ আছে এমন একজন ডাক্তারের প্রয়োজন হওয়ায় ডাঃ সাহা তাঁর কলকাতার ডাক্তার বন্ধু একদা সহপাঠী বিখ্যাত স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ নির্বাণ চৌধুরীকে পত্র দিয়েছিলেন। পত্রে ডাঃ সাহা তাঁর বন্ধু ডাঃ চৌধুরীকে এও জানিয়েছিলেন, তিনি কোন হোমরাচোমরা বা প্রচুর ফরেন কোয়ালিফিকেশন-ওয়ালা কোন স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চান না। কারণ, কর্তৃপক্ষ যে মাইনে ধার্য করেছেন তাতে করে ঐ ধরনের কোন লোক পাওয়া সম্ভব নয়। এবং এও তিনি চান না কোন ভাল বিশেষজ্ঞ এসে কিছুদিন কাজ করে অন্যত্র কোন ভাল চান্স পেলেই চলে যান। ডাঃ চৌধুরী প্রথমে ডাঃ সাহার পত্র পেয়ে ততটা গা করেননি, তাই পত্রের জবাবও দেননি। কিন্তু শর্বরী সেদিন যখন আকস্মিকভাবে

তাকে একটা চাকরি করে দেবার জন্য অনুরোধ জানাল, তখনি হঠাৎ ডাঃ চৌধুরীর মনে পড়ে গেল কয়েকদিন মাত্র পূর্বে প্রাপ্ত তাঁর বন্ধু ডাঃ সাহার চিঠিখানার কথা। তিনি শর্বরীকে একটা পরিচয়পত্র লিখে ত দিলেনই ডাঃ সাহার নামে, এবং পরের দিন প্রত্যুষেই নিজেও আর একখানা চিঠি দিলেন ডাঃ সাহাকে শর্বরীর সব কথা জানিয়ে।

রাত্রি প্রায় সোয়া দশটা নাগাদ অন্যান্য দশ-বারোজন কুলীশ্রেণীর সহযাত্রীর সঙ্গে শর্বরী এসে ট্রেন থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় নামল।

ফাল্গুনের শেষ হলেও এখানে শীতের প্রকোপটা বেশ ভাল ভাবেই অনুভূত হয়। চারিদিকে খোলা মাঠ; অন্ধকারে বেশী দূর দৃষ্টি চলে না। মনে হয় নির্জন অন্ধকার যেন চারিপাশে মুখব্যাদান করে আছে। শুধু সেই শূন্যতার মধ্য থেকে একটানা একটা ঝিঁঝির করুণ শব্দ ভেসে আসছে।

একধারে কেবল ছোট্ট একটি টালির ঘর। যাত্রীরা সব সেই দিকে এগিয়ে চলল ট্রেন থেকে নেমে। ঘরের সামনে বাতার সঙ্গে ঝুলছে একটা হ্যারিকেন বাতি টিমটিম করে। আলোর চাইতে উন্মুক্ত প্রান্তরের খোলা হাওয়ার প্রকোপে ধূমোদ্গিরণই বেশী হওয়ায় আশপাশের স্থানটিকে আলো-আঁধারে রহস্যঘন করে তুলেছে। কালো রংয়ের একটা মোটা গ্রেট্ কোট ও মাথায় একটা উলের মাংকি ক্যাপওয়ালা একজন বেহারী ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন যাত্রীদের নিকট হতে টিকিটগুলো সংগ্রহ করতে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসেন স্যুট পরিহিত আরো একজন লোক।

যাত্রীরা যে যার টিকিট বুঝিয়ে দিয়ে মাঠের পথে অন্ধকারে একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সর্বশেষে শর্বরীর সামনে এগিয়ে এলো দুজনে।

স্যুট পরিহিত দ্বিতীয় ভদ্রলোকটিই এবারে শর্বরীকে প্রশ্ন করেন, আপনিই বোধ হয় ডক্টর রয়, কলকাতা থেকে আসছেন?

অন্ধকারে ভাল করে কিছু দেখাও যায় না। তবু শর্বরী চোখ তুলে তাকাল প্রশ্নকারীর মুখের দিকে। মৃদুকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ।

আমি ডক্টর সাহা। নমস্কার।

ওঃ! নমস্কার। শর্বরীও প্রতিনমস্কার জানায়।

আপনার মালপত্র সব কোথায়?

বেশী ত কিছু নেই। ঐ একটা সুটকেশ আর একটা বেডিং। বেডিং আর সুটকেশটা শর্বরী নিজে হাতেই গাড়ি থেকে নামিয়েছিল, দেখিয়ে দিল।

ডাঃ সাহা তখন ঝমরু ঝমরু বলে দুবার ডাকতেই একটি সাঁওতাল যুবক এগিয়ে এলো।

এই যে ঝমরু, তোদের নতুন জেনানা ডাক্তার। মালগুলো নিয়ে আয়। চলুন মিস রয়, ঝমরু আপনার মালপত্র নিয়ে আসবে'খন। আমরা ততক্ষণ এগুই। বলে বেহারী ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করে বললেন, আচ্ছা। তবে চলি জানকীপ্রসাদ। নমস্তে।

নমস্তে! নমস্তে। জানকীপ্রসাদ প্রত্যুত্তর দেয়।

খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার পথ, মোটরে যাতায়াতের তেমন সুবিধা নেই। স্তিমিত তারার আলোয় অস্পষ্ট। ভাল করে বোঝাও যায় না। কিন্তু কিছুটা পথ হাঁটবার পর ক্রমে চোখের দৃষ্টিতে পায়ে চলার পথটা সরল হয়ে আসে।

আগে আগে চলেছেন ডাঃ সাহা। পশ্চাতে নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করে চলে শর্বরী। চারিদিকে স্তিমিত তারার আলোয় অস্পষ্ট অন্ধকারের বিস্তৃতি। থেকে থেকে কেবল ঝিল্লীরব শোনা যায়। গাছপালা বাড়িঘর মানুষজন আশে-পাশে কোথাও কিছু চোখে পড়ে না। এই নির্জন আবছা অন্ধকারে ঘেরা মাঠের মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ শর্বরীর মনটা যেন কেমন করে ওঠে।

এ কোন্ মরুভূমির মধ্যে স্বেচ্ছায় সে তাকে নির্বাসনে এনে ফেলল! জন-কোলাহল মুখরিত, আলোকমালায় সুশোভিত শহরের সঙ্গে সে জ্ঞান হওয়া অবধি পরিচিত। এ কোন্ অপরিচিত স্তব্ধ নির্জনতা।

সহসা ডাঃ সাহার কথায় শর্বরীর চমক ভাঙে, ডাঃ চৌধুরীর চিঠিতে আপনার সম্পর্কে সব জেনে আমি একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম মিস্ রয়।

কেন?

আপনার মত একজন রিসার্চ-মাইনডেড্ সত্যিকারের কর্মী ও উৎসাহী ইয়ং ডাক্তারকে যে আমাদের মধ্যে পাবো, এ অবিশ্বি ভাবতেই পারিনি।

প্রফেসর চৌধুরী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তাই হয়তো তাঁর চিঠির মধ্যে একটু অতিশয়োক্তি আছে।

না। চৌধুরী আমার ক্লাসমেটই নয় শুধু, বিশেষ বন্ধুও। তাঁকে আমি খুব ভাল করেই চিনি। তাঁর চরিত্রে আর যে দোষই থাকুক না কেন, ঐ দোষটি যে নেই সেটা আমার চাইতে বেশী হয়তো কেউই জানে না। তাই বলছিলাম তাঁর চিঠিতে আপনার পরিচয় পেয়ে অন্য কাউকে না পাঠিয়ে আমি নিজেই

এসেছি। প্রসূতিভবনটা খোলা অবধি আমার একটা দুশ্চিন্তা হয়েছিল, কোথায় মনের মত একজন লোক পাবো, যাঁর উপরে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্তে সমস্ত দায়িত্বটা তুলে দিতে পারবো।

আপনি ত আমার কাজের কিছুই জানেন না ডক্টর সাহা! হয়ত আমার উপরে আপনি যতখানি আশা করে আছেন—

শর্বরীকে ডক্টর সাহা কথাটা শেষ করতে দিলেন না। শেষ হবার পূর্বেই বলে উঠলেন, ডক্টর চৌধুরীও হঠাৎ কাউকে কাজের সার্টিফিকেট দেন না মিস রয়। মৃদু হেসে কথাগুলো বলে সহসা সামনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, আমরা এসে পড়েছি। এই আমাদের এরিয়া।

শর্বরী ডাঃ সাহার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনমনস্ক হয়ে পথ চলছিল। ইতিমধ্যে কখন তারা যে পথের শেষপ্রান্তে একটা ঢালু জমির সামনে এসে গিয়েছে টেরও পায়নি। সামনের দিকে এখন তাকিয়ে দেখলো, মাইন এরিয়ার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিজলী বাতিগুলো অন্ধকারের বুকে আকাশপ্রদীপের মত জ্বলছে।

প্রায় দুই মাইল জায়গা নিয়ে মাইন এরিয়া।

একদিকে মাইন ও তার অফিস। অন্যদিকে মাইনের অফিসার ও কর্মচারীদের পাকা ইটের গাঁথুনি ও টালির সেড্ দেওয়া সব পর পর একই প্যাটার্নের কোয়ার্টার। তার পশ্চাতে খানিকটা খোলা মাঠ এবং ওধারে কুলীদের সেড্।

ওরই মধ্যস্থলে মাইনের হাসপাতাল। টালির সেড্ ও পাকা ইটের গাঁথুনীর লম্বা একটা ব্যারাকের মত হাসপাতাল।

॥ ২ ॥

হাসপাতালটি ছোট হলেও ডাঃ সাহা আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি দিয়ে চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই করে রেখেছিলেন। অভাব ছিল একটি প্রসূতি-আগারের, কয়েক মাস হলো কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে তারও ব্যবস্থা করেছেন। হাসপাতালে মোটমাট ত্রিশটি বেড। ডাক্তার বলতে অবিশ্যি ডাঃ সাহাই একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনিই ফিজিসিয়ান, তিনিই সার্জেন, তিনিই প্যাথলজিস্ট। আর আছে কম্পাউণ্ডার রাখোহরি। বয়েস তার চল্লিশের উর্ধ্বে, বেশ আঁটসাঁট গড়ন। কর্মঠ। তবে একটু বেশী কথা বলে। এবং একজন ফিমেল ও একজন মেল নার্স। মাধবী ও গণপতি।

মাধবীর বয়েস ত্রিশের উর্ধ্বেই হবে। কিন্তু তার দেহের আঁটসাট গঠন দেখলে বোঝবার উপায় নেই সঠিক তার বয়সটা কত। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মুখখানি গোল। দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে একটা উলকি চিহ্ন। ভাসা ভাসা গোল গোল দুটি চোখ। হাসি সর্বদা মুখে লেগেই আছে। এবং হাসলে গেলেই দু গালে দুটি টোল পড়ে। কখনো তাকে কেউ বিরক্ত হতে বা মুখ গোমড় করতে দেখেনি। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে নার্সের ট্রেনিং নিয়ে চাকুরিতে ঢুকেছে

মাধবী সম্পর্কে অনেক কথাই অনেকে বলে। বিশেষ করে মাহন-এর ছোকার কেরানী দলের মধ্যে মাধবীর বিশেষ একটু প্রতিপত্তি আছে।

মেল নার্স গণপতির বয়েস বেশী নয়। ত্রিশের নিচেই হবে। মাধবীর সে অতটা কাজে দুরন্ত নয়। একটু ঢিলেঢালা। এবং সেজন্য ডাঃ সাহা কাছে সর্বদাই প্রায় বকুনি খেতে হয়।

এ হাসপাতালে গণপতিই প্রথমে আসে। তখন হাসপাতালের প্রথম যুগ। তখন এখানকার ডাক্তার ছিলেন ডঃ হরিসাধন দত্ত। ছোকরা ডাক্তার। এখানে বছর তিনেক কাজ করে ভাল একটা চাকুরি পেয়ে সিলোন চলে যান ডাঃ দত্ত। তারপর আসেন ডাঃ সাহা। ডাঃ সাহা এসেই ক্রমে ক্রমে হাসপাতালের পরিবর্তন শুরু করেন, এবং বছর পাঁচেকের মধ্যে সমস্ত হাসপাতালটাকে যেন একেবারে নতুন করে ঢেলে সাজান। তারই বছরখানেক পরে এলো মাধবী নার্স হয়ে, এবং মাধবী আসবার পর থেকেই গণপতির এতদিনকার একাধিপত্য একটু একটু করে ক্রমে মাধবীর হাতে চলে যেতে লাগল।

আরো বছর তিনেক পরে গড়ে উঠলো হাসপাতালের সংলগ্ন তার প্রসূতিভবনটি। শর্বরীকে আনা হলো তারই সকল দায়িত্ব নেবার জন্য।

প্রসূতিভবনের সংলগ্ন নতুন ডাক্তারের থাকবার জন্য একটি ছোটখাটো কোয়ার্টার তৈরি হয়েছে দুই কামরাওয়ালা। ডাঃ সাহা মাধবীকেই বলে রেখে-ছিলেন শর্বরীর কোয়ার্টার একটু গোছগাছ করে রাখবার জন্য। মাধবী শর্বরীর নির্দিষ্ট কোয়ার্টারেরই দোড়গোড়ায় অপেক্ষা করছিল তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

ডাঃ সাহাই মাধবীর সঙ্গে শর্বরীর পরিচয় করিয়ে দিলেন, এই মিসেস মাধবী সরকার—আমাদের এখানকার হাসপাতালের ট্রেণ্ড নার্স। তারপর মাধবীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, মাধবী! ইনিই মিস্ রয়, তোমাদের প্রসূতিসদনের নতুন ডাক্তার হয়ে এলেন। আচ্ছা ডক্টর রয়, আপনি তাহলে হাতমুখ ধুয়ে

একটু বিশ্রাম করে নিন। আমি আমার কোয়ার্টার থেকে আপনার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শর্বরী বাধা দেয়, না না—তার কোন প্রয়োজন হবে না। রাত্রে আমি আর কিছু খাব না। খিদে তেমন আমার নেই।

উপ-ডাঃ সাহা হেসে বললেন, তা কি হয়। আপনি নিজে ডাক্তার মানুষ। অকারণে দেহকে উপোস দিতে নেই, তাতে করে ক্ষতিই হয়। আচ্ছা আমি বলে কাল সকালে এসে আমিই আপনাকে হাসপাতালে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। রয়। যার সব কিছুর মালিক রায়বাহাদুর অবিশ্যি আসতে পারবেন না, কারণ বলে একেবারে শয্যাশায়ী অসুস্থ, তবে তাঁর ছেলে আসবেন, তাঁর সঙ্গে আপনার কালেই আলাপ হবে।

ডাঃ সাহা চলে গেলেন।

মাধবী এগিয়ে এসে বললে, চলুন মিস্ রয়, ভিতরে চলুন।

হ্যাঁ, চলুন।

গতকাল হঠাৎ ডাঃ সাহার মুখে নতুন প্রসূতিসদনের জন্য নতুন ডাক্তার আসছেন এবং তিনি একজন অল্পবয়সী স্ত্রীলোক শুনে মাধবী একটু চিন্তিতই হয়েছিল বয়স মাধবীর যাই হোক, একমাত্র স্ত্রীলোক বলেই এখানে সে তার একটা আধিপত্য গড়ে তুলেছিল। এবং নতুন যে ডাক্তার হয়ে এখানে আসছে সেও তারই মত একজন স্ত্রীলোক এবং বয়েস তার অল্প, এই সংবাদটিই তাকে বিশেষভাবে বিচলিত করে তুলেছিল। এখন শবরীকে সামনে পেয়ে ও তার সংযত গম্ভীর ব্যবহারে কতকটা নিশ্চিন্ত হল। শবরীর রূপ আছে এবং বয়স অল্প কিন্তু সমস্ত কিছুকে ঘিরে রয়েছে একটা কঠিন সংযম যেন, যেটাকে সহজ দৃষ্টিতেও কারো এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। এবং সেইখানেই সে আর দশজন ঐ বয়েসী নারী থেকে পৃথক। তাই মনে মনে গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে শবরীকে ঘিরে মাধবীর যে অসন্তোষের ধোঁয়া জমেছিল, সেটা শর্বরীকে চাক্ষুষ দেখবার পর থেকে এতক্ষণে একটু একটু করে কমে এসেছিল। সাগ্রহে শর্বরীকে ডেকে এনে মাধবী তার এখানকার ঘরদুয়ারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ছোটখাটো কোয়ার্টারটি বেশ ছিমছাম।

একখানি শয়ন ও একখানি বসবার ঘর। এ ছাড়াও পিছনের দিকে একটি ছোট বারান্দা এবং তার পরই একফালি উঠান। রান্নাঘর ও স্নানঘর একটু পৃথক্। বাড়ির চৌহদ্দি দেড়-মানুষ-সমান উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত চতুর্দিকে।

অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ হচ্ছিল শর্বরীর নিজেকে। মাধবীকে প্রশ্ন

করলে, স্নানঘরে স্নানের মত জল তোলা আছে কিনা ?

হ্যাঁ। বিন্টুর বৌ মুনিয়াকে দিয়ে স্নানঘরে জল আমি তুলিয়ে রেখেছি। জানি ত মেয়েমানুষ আপনি, তা ছাড়া কলকাতার লোক, ট্রেন জার্নীর পর স্নান না করে আপনি সুস্থ হতে পারবেন না।

এমন সময় বাইশ-তেইশ বৎসরের একটি আঁটসাট গড়ন সাঁওতাল যুবতী ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

এই যে মুনিয়া, এসে গিয়েছিস ! তোর নতুন মনিব, আমাদের এখানকার হাসপাতালের নতুন ডাক্তার এসে গিয়েছেন রে।

মুনিয়া একগাল হেসে শর্বরীকে সম্বর্ধনা জানায়।

কালো কষ্টিপাথরের মত গায়ের রং কিন্তু ভরন্ত যৌবন যেন উছলে পড়ছে। শক্ত টান করে খোঁপা বাঁধা। পরিধানে মলিন মোটা একখানা লালপাড় শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত নেমেছে।

প্রথম দৃষ্টিতেই শর্বরীর মুনিয়াকে ভারী ভালো লাগে।

এই মুনিয়াই আপনার এখানে কাজকর্ম সব করে দেবে। মাধবী বলে।

শর্বরী হাঁ কি না কোন জবাব দেয় না।

মাধবী এবারে বলে, আমি তাহলে এখন চলি। মুনিয়া রইলো, যদি কিছুর দরকার পড়ে ত ওকে বলবেন।

ও কি আমার কথা বুঝতে পারবে !

না না, সে ভয় আপনি করবেন না। মুনিয়া বাংলা কথা বেশ বোঝে। ভাঙা-ভাঙা বাংলা কথা বলতেও পারে। শুধু ও কেন, এখানকার কুলী-কামিনদের প্রত্যেকেই প্রায় দু-চারটে চলনসই গোছের বাংলা কথা বুঝতে পারে, বলতেও পারে। আচ্ছা, আমি তাহলে চলি।

আসুন। মৃদুকণ্ঠে শর্বরী বলে।

মাধবী বিদায় নিয়ে দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসে, হ্যাঁ, ভাল কথা, একা একা এ বাড়িতে থাকতে আপনার ভয় করবে না ত ? আমি অবিশ্যি আমার কোয়ার্টারে একাই থাকি। ভয়-টয় আমার একদম নেই !

না। আমি একাই থাকতে পারবো। জবাব দেয় শর্বরী।

অবিশ্যি লোকের দরকার হলে ডাক্তারবাবুকে বলবেন, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন। আচ্ছা আমি চলি। মাধবী দরজাপথে বের হয়ে গেল।

বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারের উপরে বসে ছিল শর্বরী। অল্প দূরে খোলা

উঠানের উপরে দাঁড়িয়েছিল মুনিয়া। মুনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে শর্বরী প্রশ্ন করলো, তোর নাম মুনিয়া ?

মাথাটা দুলিয়ে হাসিমুখে মুনিয়া জানায়, হ্যাঁ।

তুই থাকিস কোথায় ?

হুই হোথা ! তু গোসল করবি ত মেমসাব্ !

হ্যাঁ। তুই একটু বোস, আমি গোসলটা সেরে নেই।

শর্বরী উঠে পড়ল। সুটকেশ থেকে শাড়ি, টাওয়েল, সাবান ইত্যাদি নিয়ে স্নানঘরে গিয়ে ঢুকল শর্বরী।

ট্রেনের জার্নীতে সমস্ত চোখমুখ কয়লার গুঁড়োয় কিচ্ কিচ্ করছে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করে শর্বরীর শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। দেহের ক্লান্তিও অনেকটা যেন কমে যায়।

স্নান শেষ করে বাইরে এসে দেখে ইতিমধ্যে ডাঃ সাহার ওখান থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে করে তার রাত্রির আহার্যও এসে গিয়েছে।

ক্ষুধা শবরীর আদপেই ছিল না। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে মুনিয়ার সাহায্যে শয্যাটা বিছিয়ে নিয়ে, মুনিয়াকে বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে শয্যার এসে গা ঢেলে দিল।

ক্লান্ত দেহে ঠাণ্ডা জলে স্নানের পর এতক্ষণ চোখের পাতা যেন বুঁজে আসছিল কিন্তু এখন শয্যায় শয়ন করবার পর দু চোখের পাতা থেকে সমস্ত ঘুম কোথায় যেন সরে গেল।

অন্ধকারে একাকী শয্যার উপর শুয়ে এতক্ষণে যেন শর্বরী নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার অবকাশ পায়।

গত বারোটা দিন ও রাত্রি শর্বরীর যে কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গিয়েছে, ও যেন মনে করতেই পারে না। এ কটা দিন আকস্মিক জমাটবাঁধা মনের মধ্যে ও যেন ঘুমিয়ে ছিল।

আজ বারো দিন বাদে সর্বপ্রথম তার শৈবালকে মনে পড়ল। এবং সেই সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ঘৃণায় যেন ওর সমস্ত মনটা আবার রি রি করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল শেষ বিচ্ছেদের দিনে শৈবালের সেই মুহূর্তের কথাগুলো।

পুরুষ বলেই হয় ত শৈবাল তাকে এত বড় অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাত হানতে পেরেছে। পুরুষের অহমিকায় তাদের এতদিনকার ভালবাসার মর্যাদাই দেয়নি শৈবাল। আজ আবার নতুন করে শর্বরী নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। ভালই হলো। এ ভালই হলো। মনের মধ্যে ঐ ধারণা পোষণ করে

যে পুরুষ, তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে একত্রে বসবাস করার মত চরম উপহাস আর কি থাকতে পারে। বিবাহের পবিত্র বন্ধনটাও হয় ত সেখানে দুবিষহ লজ্জারই একটা বোঝা হয়ে উঠতো। সৌজন্যের মুখোশ মুখে এঁটে দিনের পর দিন শৈবাল করে যেত স্বামীর অভিনয়, অথচ সে ঘুণাক্ষরেও সেটা বুঝতে পারতো না। না, না—এ তার চাইতে ভালই হলো। অভিনয়ের গ্লানি থেকে সে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এলো। অপমানের হাত থেকে সে মুক্তি পেল।

মুক্তি! মুক্তি!

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা শর্বরীর মনে পড়ে যায়। তার অনাগত সন্তান! সে ত শৈবালেরই। শৈবালকে সে অস্বীকার করলেও সেই সন্তানকে সে অস্বীকার করবে কেমন করে?

যত বড় দৃঢ়তার সঙ্গেই সে শৈবালের সমস্ত স্মৃতিকে অস্বীকার করে আসুক না কেন, শৈবালের সমস্ত সত্তার স্বীকৃতি নিয়ে যে সন্তান তার দেহের অভ্যন্তরে ভ্রূণের আকারে তার মেদ, মজ্জা ও রক্তকে আঁকড়ে ধরে আছে, সেখানে তার মুক্তি কোথায়!

যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন শৈবালের সেই সন্তান তাঁকে কি প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেবে না যে শৈবালের কাছ থেকে তার মুক্তি নেই? যত দূরে যেখানেই যাক না কেন, শৈবালকে সে অস্বীকার করতে পারবে না। সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে এলেও তার মুক্তি নেই! দুঃস্বপ্নের মত শৈবাল তার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরবে।

তবে কি সে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলবে! জোর করে সব উপড়ে ফেলবে!

কিন্তু পরক্ষণেই নারীদেহে ও মনে যে চিরন্তন মা বাস করে সংগোপনে, সেই মা তার সংকল্পের দুই বাহু আঁকড়ে ধরে করুণ মিনতি জানায়। তার দেহের প্রতি রক্তবিন্দুতে বিন্দুতে এক অসহায় শিশু ছড়িয়ে পড়ে তাকে কোটি কোটি বাহু দিয়ে যেন আঁকড়ে ধরে কি এক অভূতপূর্ব পুলকবেদনায়।

না, না—তা সে পারবে না। কিছুতেই পারবে না। পারবে না বলেই না সে নিজে গিয়ে শৈবালের সামনে উপযাচিকার মত দু হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল।

আর সেই কারণেই না সে শৈবালকে চিরদিনের মত ত্যাগ করে আসতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে নি? এমনি করে সে পরাজয় স্বীকার করে নেবে?

সেই কারণেই কি সে কেবল শৈবাল নয়, তার খঞ্জ রোগগ্রস্ত অসহায় বাপকেও ত্যাগ করে এলো! মনে পড়ে গেল বাবার কথা।

অসহায় পঙ্গু শেখরনাথ।

হাসপাতালের শত কাজের মধ্যেও যে অসহায়, পঙ্গু এবং একান্তভাবে তার উপর নির্ভরশীল পিতা শেখরনাথের কথা তার বার বার মনে হতো। সেই বাপের কোন সংবাদই আজ বারো দিন সে কিছু জানে না।

শেখরনাথের সামান্য invalid pension-এ যে তাদের সংসারের কিছুই চলত না! তার আয়ের উপরই ছিল সব কিছু নির্ভর। আর তার অভাবে সেই সংসারে না জানি কী বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছে! আলো যা সামান্য মাইনে পায় তাতে করে সংসারে তার অবর্তমানে কোন সুরাহাই হবে না। টুটুর ত এখন পড়াই শেষ হয়নি। একান্তভাবে তার মুখাপেক্ষী সংসারটাকে সে কোন্ অনিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে ফেলে এসেছে তাই বা কে জানে!

পিতা শেখরনাথকে তার চাইতে বেশী ভাল করে কেউ ত চেনে না। তিনি যে আর কোন কারণেই তার কাছ থেকে এতটুকু সাহায্যও নেবেন না, শর্বরী তা জানে।

তাছাড়া যেজন্য সে শৈবালকে ভালবেসেও এতদিন বিবাহে মত দেয়নি তার শত অনুরোধেও, সেই হাসপাতালও তাকে ছেড়ে আসতে হলো।

হাসপাতালের সেই বিরাট কর্মজীবন। যা থেকে কোনদিন সে নিজেকে পৃথক করে দেখেনি এবং যে কর্মময় জীবনের মধ্যে সে এক নূতন ইতিহাস গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেছে এতকাল, সে হাসপাতালই বা কোথায় কতদূরে পড়ে রইলো!

এই অখ্যাত জায়গায় ছোট্ট হাসপাতালের মধ্যে কেমন করেই বা সে দিন কাটাবে! একটার পর একটা এলোমেলো চিন্তা শর্বরীর নিদ্রাহীন মস্তিষ্কের কোষে কোষে এসে জোট পাকাতে থাকে।

না। শর্বরী আর ভাবতে পারে না। যা হবার হোক। যা হয় হোক।

॥ ৩ ॥

পরের দিন মুনিয়ার ডাকাডাকিতে শর্বরীর যখন ঘুম ভাঙল, তার শয়নঘরের খোলা জানালাপথে সকালের রোদ এসে ঘর ভরিয়ে দিয়েছে। বালিশের তলা থেকে হাতঘড়িটা বের করে দেখলে সাতটা বেজে কুড়ি। সদর দরজা খুলে দিতেই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে মুনিয়া।

সেই কখন থেকে দরজা ঠেলছি—তা তোর ঘুমই ভাঙ্গে না। উনানটা ধরায়ে দি। চা খাবি ত!

হ্যাঁ, দে। আর দেখ্, ঘরের মধ্যে একটা কেটলি আছে, তাতে করে চায়ের জল চাপিয়ে দে।

মুনিয়া রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

শর্বরী একেবারে স্নান সেরে নিল। এক্ষুনি হয়তো ডাঃ সাহা এসে পড়বেন। হাসপাতালে যেতে হবে।

চা পান করতে করতে শর্বরী মুনিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, বাজার করে আনতে পারবি মুনিয়া?

কেনে পারবো না কেনে। কি আনতে হবে বলে দে। সব নিয়ে আসবো দেখ্‌না তু।

চাল, ডাল, তেল, মসলা কিছুই ত সঙ্গে আনিনি! সবই কিনে আনতে হবে। কোথা থেকে আনবি? সামনে কোন বাজার আছে?

সর্দারজীর দোকানেই সব পাওয়া যায়। বাজার ত এখানে নেই। হপ্তায় দুবার করে হাট বসে। শনি মঙ্গল।

শর্বরী টাকা বের করে দিয়ে মোটামুটি কি কি আনতে হবে বলে দিলে মুনিয়াকে।

মুনিয়া চলে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাঃ সাহা এসে উপস্থিত হলেন কাল রাত্রে শর্বরী ডাঃ সাহার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখেনি।

ডাঃ চৌধুরীর সমবয়স্ক ও সহপাঠী হলেও ডাঃ সাহাকে ডাঃ চৌধুরীর চাইতে একটু বেশী বয়েস হয়েছে বলেই মনে হয়। মাথার সামনের দিকে টাক পড়েছে এবং চুলেও বেশ পাক ধরেছে। বেঁটে রোগা লোকটি। চোখেমুখে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জ্যোতি।

ডাঃ সাহা এসে বললেন, চলুন ডাঃ রয়।

চলুন। আমিও আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

শর্বরী ঘরের মধ্যে গিয়ে শাড়িটা বদল করে জুতোটাকে পায়ে দিয়ে নেয়।

সকালের প্রসন্ন রৌদ্রালোকে চারিদিক ঝলমল করছে। একদল কুলী-কামিন চলেছে পিঠে ঝোড়া আর গাঁইতি নিয়ে খনিতে কয়লা কাটতে।

কেমন লাগছে জায়গাটা আপনার, ডাঃ রয়?

মন্দ লাগছে না। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে ডাঃ সাহা।

কি বলুন ত!

আপনি আমার প্রফেসরের বন্ধু। তাছাড়া বয়সেও আপনি আমার চাইতে অনেক বড়। 'আপনি' না বলে আমাকে আপনি 'তুমি' বলে নাম ধরে ডাকলেই আমি সুখী হব, ডাঃ সাহা।

তা বেশ ত। বেশ ত, তুমিই না হয় বলা যাবে। ডাঃ সাহা হেসে ওঠেন।

চার-পাঁচ মিনিটও লাগে না দুজনের হাসপাতালে পৌঁছাতে।

লম্বা ব্যারাকের আকারে, টালির সেড দেওয়া পাকা ভিতের হাসপাতালটি। পর পর খানপাঁচেক ঘর। সামনের খোলা জায়গায় কিছু মরসুমী ফুলের গাছ। অজস্র ডালিয়া ধরেছে গাছগুলিতে, সেই সঙ্গে ফুটেছে বড় আকারের গাঁদা ফুলও। হাসপাতালের বারান্দায় একদল রোগী বোধহয় ডাক্তারবাবুরই অপেক্ষায় বসে আছে।

ডাঃ সাহার সঙ্গে শর্বরী গিয়ে হাসপাতালের বারান্দায় উঠতেই নার্স মাধবী ও মেল নার্স ও কমপাউণ্ডার গণপতি ও রাখোহরি এগিয়ে এল।

রাখোহরি বললে, ছোট সাহেব নতুন হাসপাতালে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ওঁকে নিয়ে আপনাকে সেখানেই যেতে বলেছেন।

তাহলে চল শর্বরী, আগে তোমার ডিপার্টমেণ্টটাই ঘুরে আসা যাক আর এখানকার বর্তমান মনিব ছোট সাহেবের সঙ্গেও ঐ ফাঁকে আলাপ-পরিচয়টা সারা হয়ে যাবে, ডাঃ সাহা শর্বরীর দিকে তাকিয়ে বললেন।

তাই চলুন। মৃদুকণ্ঠে শর্বরী প্রত্যুত্তর দেয়।

প্রসূতিভবনের দিকে দুজনে অগ্রসর হলেন।

নবনির্মিত প্রসূতিভবনটি পুরাতন হাসপাতাল থেকে মাত্র হাত কুড়িক তফাতে। প্রসূতিভবনের কাছাকাছি পৌঁছাতেই দেখা গেল গেটের সামনে চকচকে কালো রংয়ের একটি অস্টিন অফ্ ইংলণ্ড দাঁড়িয়ে আছে।

প্রসূতিভবনের সামনের বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ওঁদের অপেক্ষায় ছোট সাহেব অর্থাৎ রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্র রণধীর মুখার্জী। সব কিছুর একমাত্র ওয়ারিশন ও মালিক।

মুখার্জী সাহেবের বয়স চল্লিশের কোঠাতেই হবে। বেশ নাদুসনুদুস গড়ন। পোশাকপরিচ্ছদ ও চালচলনে একটা উগ্র সাহেবিয়ানা যেন উৎকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

গায়ের রং কালো। গোল মুখ, নাকটা একটু চ্যাপটা, চোখে সোনার ফ্রেমে শৌখিন চশমা। হাতে একটি চামড়ার চাবুক।

ওঁদের দুজনকে এগিয়ে আসতে দেখে ছোট সাহেব বললেন, এই যে ডক্টর সাহা! এত দেরি হল যে!

ডক্টর সাহা ছোট সাহেবের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শর্বরীর সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন, ইনিই এই খনির মালিকের একমাত্র পুত্র। বর্তমানে ইনিই সব কিছু দেখাশুনা করছেন।

রণধীর সাহেবী কায়দায় শর্বরীর দিকে হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, How do you do! কিন্তু শর্বরী সেই সম্ভাষণেচ্ছুক প্রসারিত হাতের মধ্যে নিজেকে ধরা না দিয়ে দুটি হাত জড়ো করে একান্ত ভারতীয় প্রথায় সম্ভাষণ জানায়, নমস্কার।

খানিকটা অপ্রস্তুত ও আহত হয়েই যেন রণধীর নিজেকে সামলে নিয়ে প্রাত-নমস্কার জানায়।

তাহলে ডক্টর সাহা, আপনি ওঁকে সব বুঝিয়ে-শুনিয়ে দিন। ওয়াগন ডেলিভারীর ব্যাপারে এখুনি একবার আমাকে ধানবাদ যেতে হবে। আচ্ছা ডক্টর রয় চলি, পরে আবার দেখা হবে।

রণধীর মুখার্জী চাবুক দোলাতে দোলাতে বারান্দা থেকে নেমে সোজা গিয়ে তাঁর অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে বসলেন।

শর্বরী একদৃষ্টে রণধীরের গমনশীল দেহটার দিকে তাকিয়েছিল। সম্বিৎ ফিরে এলো তার ডাঃ সাহার ডাকে।

চল শর্বরী—হাসপাতালটা ঘুরে দেখবে, চল।

চলুন। বর্তমানে কোন পেসেন্ট হাসপাতালে আছে নাকি?

হ্যাঁ, দুটো বেডে পেসেন্ট আছে। একটা anæmic advance কেস। আর দ্বিতীয়টা পরশু রাত্রে ডেলিভারী হয়েছে।

শর্বরী এগিয়ে চলল ডাঃ সাহার পিছনে পিছনে।

নিজে সঙ্গে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডাঃ সাহা শর্বরীকে সব দেখাতে লাগলেন। ছোট্ট হাসপাতাল ও সামান্য আয়োজন হলেও ডাঃ সাহা যেন কোন ত্রুটিই রাখেননি কোথাও। পরম নিশ্চিন্তেই সে এখানে তার আপন খুশিমত কাজ করতে পারবে।

দিন দুই পর থেকেই হাসপাতালে নতুন মেয়ে-ডাক্তারের আসবার সংবাদ পেয়ে রোগিণীদের ভিড় হতে লাগল। জীবনের নতুন একটা পৃষ্ঠা যেন শর্বরীর চোখের সামনে উন্মোচিত হলো।

যদিও হাসপাতালটি একান্তভাবে খনির রোগীদের জন্যই, তথাপি আশপাশের গ্রাম থেকেও দু-চারজন রোগিণী প্রত্যহ আসতে লাগল। ফলে নিত্য নতুন নতুন সমস্যার সঙ্গে শর্বরীর পরিচয় ঘটতে লাগলো।

ছাত্রীজীবন ও ডাক্তারী পাস করা অবধি সে এতদিন কলকাতার মত শহরের অন্যতম বিখ্যাত হাসপাতালের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল, আজ কলকাতা থেকে

অনেকদূরে না-শহর না-পাড়াগাঁ একটি অখ্যাত জায়গার হাসপাতালে এসে দেখল একজন চিকিৎসকের জীবন কতখানি ব্যাপ্ত, মানুষের সমাজের কতখানি অপরিহার্য। ডাঃ চৌধুরীর অনেকদিন আগেকার একটা কথা আজ বার বার করে মনে পড়ে শর্বরীর। ডাঃ চৌধুরী মধ্যে মধ্যে বলতেন, চিকিৎসকের কর্তব্য শুধু রোগনির্ণয় ও তার ব্যবস্থাপত্র দানের মধ্যেই শেষ নয়। রোগীর পারিপার্শ্বিকতা, তাদের সমাজ-জীবন, অভাব-অভিযোগ, অর্থকরী সামর্থ্য, তার রীতিনীতি, হ্যাভিটস্ কন্সটিটিউশন, সব কিছুর সঙ্গেই ডাক্তার যদি পরিচিত না হতে পারে তবে সে কোনদিনই ভাল চিকিৎসক হতে পারে না। কত বিভিন্ন সমস্যা নিয়েই যে রোগীরা ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয়, ভাবতে গেলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। আরো তিনি বলতেন, আজকালকার চিকিৎসকরা সকলেই শহরের মধ্যে ভিড করে থাকতে চায়, কিন্তু তাতে করে ত সমাজ থেকে রোগ দূর করা যাবে না। মানুষ ত দেহ ও মনে রোগমুক্ত হবে না। সুস্থ ও সুখী হবে না। ছোট ছোট শহরে, পাডাগাঁয়ে আজকের অনেক চিকিৎসকদের ছাডয়ে পড়তে হবে। তাদের বুঝতে হবে, তাদের জানতে হবে আজ আমাদের ঘরে ঘরে রোগ কেমন করে দিনের পর দিন আমাদের পঙ্গু করে ফেলছে। অপর্যাপ্ত অপরিপুষ্ট আহার, সমাজব্যবস্থা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের জন্য অসাম্য, আমাদের রক্ত শোষণ করে অকালে মৃত্যুর মুখে ঠেলে নিয়ে চলেছে প্রতিদিন। মনে মনে শর্বরী প্রফেসর চৌধুরীকে প্রণাম জানায়। এমনি করে এখানে চাকরি নিয়ে না চলে এলে ত এ-সবের কিছুর সঙ্গেই তার পরিচয় ঘটতো না।

শর্বরী কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। কোথা দিয়ে যে দিন ও রাত্রি আসে সে যেন টেরই পায় না।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে একটা অত্যন্ত ডিফিক্যাল্ট কেস নিয়ে গলদঘর্ম হয়ে কোনমতে বিকালের দিকে ডেলিভারি করিয়ে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শর্বরী কোয়ার্টারে ফিরে স্নান সেরে সবে এক কাপ চা নিয়ে বারান্দায় বসেছে।

পূর্ণিমা। সন্ধ্যার দিকেই মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় আঙিনাটা যেন ভেসে যাচ্ছে। এমন সময় বাইরে একটা গাড়ি থামবার শব্দ হলো।

মুনিয়া রান্নাঘরে রাত্রির রন্ধনের ব্যবস্থা করছিল। গাড়ির শব্দে শর্বরী মুনিয়াকে ডেকে বললে, এই মুনিয়া, দেখ্ ত বাইরে যেন একটা গাড়ি থামলো বলে মনে হলো!

মুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটে গেল বাইরে এবং পরক্ষণেই হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত ফিরে এলো, ছোট সাহেব।

ছোট সাহেব! এ সময়ে! শর্বরী গায়ের কাপড়টা একটু গুছিয়ে নিয়ে ত্রস্তে উঠে দাঁড়ায়।

মশমশ জুতোর শব্দ তুলে রণধীর ভিতরে এসে প্রবেশ করল, ডক্টর রয় আছেন নাকি?

হ্যাঁ আছি, আসুন।

সেই প্রথম সাক্ষাতের পর আর ছোট সাহেবের সঙ্গে শর্বরীর দেখা হয়নি। ছোট সাহেবের কথা শর্বরী একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিল।

প্রসূতিভবনেই গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম, কিছুক্ষণ হলো আপনি কোয়ার্টারে ফিরে এসেছেন।

শর্বরী কোন কথা না বলে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল রণধীরের দিকে।

রণধীর চেয়ারটার উপরে বসল। আজও পরিধানে তার সাহেবী পোশাক।

চেয়ারে উপবেশন করে পকেট থেকে একটা সোনার সিগ্রেট কেস্ বের করে, কেস থেকে একটা সিগ্রেট নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল রণধীর।

শর্বরী কিন্তু দাঁড়িয়েই ছিল।

আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ডক্টর রয়, বসুন। Be seated please!

শর্বরী মনে মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। তথাপি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল রণধীরের অনুরোধে।

হঠাৎ কাজের haavy pressure পড়ায় এ কদিন আপনার একটা খবর নিতেও আসতে পারিনি। আপনার কোন রকম অসুবিধে হচ্ছে না ত ডক্টর রয়?

না। অসুবিধা আর কি।

কোন রকম অসুবিধা হলে কিন্তু বলবেন। তবে হ্যাঁ, না আসতে পারলেও আপনার সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়েছি, ইতিমধ্যেই ত চারিদিকে আপনার নাম ছড়িয়ে গিয়েছে। তাই বলে বেশী খেটে শরীরকে নষ্ট করবেন না যেন আবার।

ডাক্তারদের খাটুনির ভয় করতে গেলে কি চলে মিঃ মুখার্জী?

না, না—তাই বলে শরীরের দিকেও নজর রাখতে হবে বৈকি! তাছাড়া ডক্টর সাহা ত আছেনই। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনার কোয়ার্টার পছন্দ হয়েছে ত?

কেন হবে না! চমৎকার কোয়ার্টার!

শর্বরী বেশ বুঝতে পারে ছোট সাহেব বেশ আরাম করেই পা ছড়িয়ে

বসেছেন, সহজে এখন উঠবেন বলে তার মনে হয় না। অথচ ভদ্রলোক বাড়িতে এসেছেন, উঠুন বলাও চলে না। আবার ভদ্রলোকের উপস্থিতিটাও যেন কেমন বিশ্রী লাগছে। হঠাৎ শর্বরীর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে বললে, আমাকে একবার হাসপাতালে যেতে হবে মিঃ মুখার্জী।

হাসপাতালে! এক্ষুনি আবার হাসপাতালে যাবেন। এই ত এলেন শুনলাম।

কেসটার অবস্থা এখনো ভাল নয়। চব্বিশ ঘণ্টা এখনো close watch করা দরকার।

সে কাল সকালে গেলেও চলবে। ব্যস্ত হবেন না। একটা ordinary কুলি-বৌ—ওরা ত ওভাবে চিরদিন মরতেই অভ্যস্ত।

একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারিত রণধীরের কথাগুলো শর্বরীর মনের মধ্যে যেন মুহূর্তে প্রবল একটা বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। কিন্তু মনের ভাব মনেই চেপে রেখে মুখে বলে, আপনার কথাই হয়ত ঠিক মিঃ মুখার্জী, কিন্তু আমি একজন ডাক্তার হিসাবে আমার ধর্ম ও ডিউটিটা ভুললেও ত চলবে না, আমায় একবার যেতেই হবে।

চেয়ার থেকে উঠে শান্তপদে শর্বরী ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে।

কাপড়টা বদলে জুতো পায়ে দিয়ে এ ঘরে এসে দেখে রণধীর মুখার্জী তখনও চেয়ারটায় বসে আছে। ঘর থেকে শর্বরীকে বের হয়ে আসতে দেখে রণধীর বলে, চলুন, আপনাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে যাই ডক্টর রয়।

না, না—তার কোন প্রয়োজন হবে না। সামান্য এ পথটুকু আমি হেঁটেই যেতে পারবো।

তা হোক, আমি তো ঐ দিকেই যাবো। চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো।

কী ভেবে শর্বরী আর বিশেষ আপত্তি জানায় না। রণধীরের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তার গাড়িতে উঠে বসে। এ সেদিনকার অস্টিন গাড়িটা নয়। প্রকাণ্ড প্রিমাউথ গাড়ি।

কতটুকুই বা পথ। দেখতে দেখতে গাড়ি হাসপাতালের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। শর্বরীকে নামিয়ে দিয়ে রণধীর চলে গেল।

হাসপাতালের বারান্দায় গিয়ে উঠতেই ডাঃ সাহার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো শর্বরী।

তোমার হাসপাতালটা ঘুরে দেখছিলাম শর্বরী। Congratulations my

child ! You have done miracles !

আপনি কখন এলেন ডক্টর সাহা ?

হাসপাতালের কাজ শেষ করে কোয়ার্টারে ফিরছিলাম। হঠাৎ পথে নেমে তোমার কথা মনে পড়ল। তুমি আসবার পর থেকে ত এদিকে একটিবারও আসিনি, তাই ভাবলাম একবার ঘুরে যাই।

ভালই করেছেন, চলুন আমার কেসটা দেখে যাবেন, পেসেন্টের কন্‌ডিশনও খুব লো ছিল, একসট্রিমলি এনিমিক। তার উপরে আবার ডেড বেবী। অনেক টানাহেঁচড়া করে তবে ডেলিভারী করিয়েছি।

শর্বরীর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দিকে যেতে যেতে ডাঃ সাহা বললেন, এই কদিনেই তুমি যা নাম করেছো শর্বরী ! গরীব মূর্খ কুলী-কামিনের দল ওরা ত তোমাকে দেবতা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

সত্যি ওরা বড় ভাল। আমি আর কি করছি। সাধ্য কতটুকুই বা আমার। আর শিখেছিই বা কি।

শহরের বড় বড় হাসপাতালে থাকলে হয়ত ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে তোমার নামও বড় বড় কয়েকটা অদ্ভুত অদ্ভুত অপারেশনের মধ্যে দিয়ে দু-দশটা মেডিকেল জার্নালে উঠতো। এক ধরনের গৌরব ও তৃপ্তি যে তাতে যথেষ্টই আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই শর্বরী। কিন্তু এই সাধারণ কেসগুলোর ভিতর দিয়েও তোমার পরিশ্রম, চেষ্টা ও সাধনা তোমাকে কম তৃপ্তি দেবে না জেনো। এত যত্ন করে দীর্ঘদিনের সাধনায় তুমি যা অর্জন করেছো বা শিক্ষা করেছো, জেনো এখানকার জীবনেও সেটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে না। হয়ত বড় বড় মেডিকেল কন্‌ফারেন্সে তোমার ডাক পড়বে না, টপর্যাংকিং ডাক্তারদের গ্ল্যামার তোমার জীবনে আসবে না. তবু মানুষ ও সমাজের কাছে তোমার এ দান, তোমার এ ত্যাগ কারো থেকেই কম নয়।

ডাঃ সাহার কথাগুলি শর্বরীকে যেন ডাঃ চৌধুরীকেই মনে করিয়ে দেয় নতুন করে।

দুজনের মধ্যে হাসপাতাল নিয়েই নানা আলোচনা চলতে থাকে। কথা-প্রসঙ্গে একসময় শর্বরী বলে, একজন একটু জানাশোনা অ্যানাস্‌থেটিস্ট হলে ভাল হয় ডাঃ সাহা। রাখোহরিকে দিয়ে অ্যানাস্‌থেসিয়া দিতে আমার যেন তেমন সাহস হয় না।

দেখি কতদূর কি করতে পারি ! আর একটা পোস্ট স্যাংশন করানো—কর্তৃপক্ষ ত বোঝে না। ওরা চিনেছে কেবল লাভের মুনাফা, টাকা আনা পাই।

হাসপাতালের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি নটা ঘোষণা করল।

চল শর্বরী। রাত হয়ে গেল। তোমাকে তোমার কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে যাই।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ একসময় ডাঃ সাহা বললেন, তোমাকে একটা কথা বলব শর্বরী, মনে কিছু করো না।

না, না—মনে করবো কেন, বলুন না।

ঐ ছোট সাহেবটিকে যতটা পারো এড়িয়েই চলো।

শর্বরী ডাঃ সাহার কথায় আচমকাই বোধ হয় থেমে গিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

ডাঃ সাহা বললেন, হ্যাঁ শর্বরী, আমি রণধীর মুখার্জীর কথাই বলছি। পাঁচ সাতটা খনির মালিক। প্রচুর অর্থ আছে। এই যে এখানে একটা হাসপাতাল করেছেন, তারও মূলে জেনো নিঃস্বার্থ পরোপকারবৃত্তি নেই। কিছুটা কানুনের চাপে পড়ে ও কিছুটা নিজেদেরই সুবিধার স্বার্থে এই হাসপাতাল ওরা চালায়। আর সেই প্রয়োজনেই আমাদের প্রয়োজন ওদের কাছে।

কিন্তু—, শর্বরী বোধ হয় কিছু বলতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু ডাঃ সাহা সেদিকে কান না দিয়ে বললেন, অবিশ্যি বুড়ো রায়বাহাদুর লোকটা তত খারাপ নয়। কিন্তু তিনি ত অসুস্থ শয্যাশায়ী। তাঁর অবর্তমানে এখন যিনি সর্বময় কর্তা—ঐ রণধীর বা ছোট সাহেব লোকটা যেমনি সুবিধাবাদী, তেমনি হৃদয়হীন ও প্রচণ্ড দাম্ভিক। এবং শুধু তা হলেও কথা ছিল না, চরিত্র বলে কোন বস্তু বা বোধই লোকটার মধ্যে নেই!

আমি তা যে বুঝতে পারিনি ডাঃ সাহা তা নয়। মৃদু কণ্ঠে শর্বরী বলে।

আর একটা কথা শর্বরী, ঐ নার্স মিডওয়াইফ মাধবী, ঠিক যতটুকু ওকে তোমার প্রয়োজন তার বেশী কোন প্রশ্রয় দিও না।

চিরদিনই কাজ-পাগল ছিল শর্বরী। কাজের মধ্যে এমনি তন্ময় হয়ে যেত যে, কোন কাজ তার হাতে নিলে সে নিজেকে পর্যন্ত ভুলে যেত। এখানকার হাসপাতালে আসবার মাস দুয়েকের মধ্যেই তার চিকিৎসাপদ্ধতি, রোগীর প্রতি তার যত্ন ও রোগসেবায় নিষ্ঠা, খনির কুলী-কামিনদের মধ্যেও তাকে বিশেষ প্রিয় করে তুলেছে। এমন কি সেই জনপ্রিয়তার কথা লোকের মুখে মুখে রটে যাওয়ায় হাসপাতালে রোগীর ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলছিল দিনের পর দিন।

রোগজীর্ণ অসহায় লোকগুলো এমন ভাবে তাকে চব্বিশ ঘণ্টা ঘিরে থাকত

যে, শর্বরী যেন নিশ্বাস ফেলবারও সময় পেত না!

রোগ! রোগ! আর রোগ!

কত বিচিত্র ব্যাধিই যে মানুষের শরীরে বাসা বাঁধতে পারে এবং তার মূলে যে থাকে কত বিচিত্র কারণ, নতুন করে যেন শর্বরী জানবার অবকাশ পেল। পাঠ্যাবস্থায় ছাত্রীজীবনের সুদীর্ঘ সময়টা চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তকগুলির যাবতীয় সব কিছু নির্বিচারে তাকে গলাধঃকরণ করতে হয়েছে, কারণ সব কিছুর পরীক্ষা না দিলে পুরাপুরি ডাক্তারী শাস্ত্রটা জানা হয় না ও ডাক্তার হবার সার্টিফিকেট মেলে না। তারপর পাস করবার পর যখন সে হাউস ফিজিসিয়ান হলো 'জি' ওয়ার্ডে এবং সেখানে যতদিন ডাঃ চৌধুরীর অধীনে কাজকর্ম করেছে, ততদিন বিরাট চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষ একটি বিভাগ স্ত্রীরোগ নিয়েই ছিল তার কাজ। কলকাতায় বিরাট বিরাট সব হাসপাতালে বিভিন্ন সব বিভাগ এবং বিভিন্ন বিভাগের জন্য রয়েছে বিভিন্ন সব বিশেষজ্ঞ। কিন্তু এসব ছোটখাটো শহরের হাসপাতালের ব্যবস্থা তেমন নয়। এখানে একজন ডাক্তারকে একাধারে সব কিছুই জানতে হবে। যদিচ বিশেষ করে এখানকার প্রসূতিভবনের জন্যই শর্বরীকে আনা হয়েছিল, কিন্তু সে একজন স্ত্রী-ডাক্তার হওয়ায় ছোট শহরের যাবতীয় স্ত্রীরোগীরা নির্বিচারে এসে তারই শরণাপন্ন হতে লাগল। স্ত্রীরোগ ত বটেই, অন্যান্য রোগের ব্যবস্থার জন্যও স্ত্রীরোগীরা তার কাছেই এসে ভিড় করে। ফলে নতুন করে আবার সব কিছুই শর্বরীকে পড়াশুনা করতে হয়। ডাঃ সাহার কাছেও পরামর্শ চাইতে হয়। এদিকে ডাঃ সাহাও বরাবর ছিলেন বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু। এতদিন তিনি সময় পেতেন না, কিন্তু শর্বরী আসবার পর থেকে অনেকটা ঝক্কি তাঁর ঘাড় থেকে নেমে যাওয়ায় তিনি নিজেকে আবার তাঁর ছোট্ট ল্যাবোরেটরির মধ্যে বন্দী করেছিলেন। বাধ্য হয়ে মধ্যে মধ্যে পরামর্শের জন্য শর্বরীকে সেই স্থানেই ছুটে আসতে হতো।

শুধু দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানই ছিল না ডাঃ সাহার, তিনি ছিলেন সত্যিকারের জ্ঞান-তপস্বী। পড়াশুনাও ছিল তাঁর প্রচুর।

॥ ৪ ॥

ডাঃ সাহার সঙ্গে কথা বলতে বলতে শর্বরীর চোখের সামনে যেন নতুন এক জগতের দ্বার খুলে যায়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু কীভাবে অলক্ষ্যে মানুষের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে ধ্বংসের যজ্ঞ শুরু করে, কী ভয়াবহভাবে তাদের বংশবৃদ্ধি হয় সামান্য সময়ে, কী প্রচণ্ড তাদের প্রতাপ! এবং শুধু বাইরের জীবাণুই নয়,

মানুষের মনের সঙ্গেও কত ভয়াবহ ব্যাধির মূল জড়িয়ে আছে! শরীর ও মনের সম্পর্কের সঙ্গে ব্যাধির যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যোগাযোগ তা আবিষ্কার করলে যেসব বিস্ময় উদঘাটিত হয়, তা সাধারণের ধারণারও অতীত।

এক রাত্রির কথা।

শরীরটা সেদিন ভাল না থাকায় শর্বরী একটু তাড়াতাড়িই হাসপাতাল থেকে ফিরে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল একটা গাড়ির হর্নের শব্দে।

বন্ধ দরজার কড়া একটু পরে নড়ে উঠলো। টেবিলের উপরে রক্ষিত ঘড়ির দিকে তাকাল শর্বরী। রাত সাড়ে এগারোটা।

এত রাত্রে কে আবার এলো গাড়িতে!

ছোট সাহেব রণধীর নয় ত। যদি সত্যি সে-ই হয় ত আজ বেশ কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে দেবে তাকে।

যারা এমনি করে গায়ে পড়ে অভদ্রতা করে, তাদের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করবার কোন হেতু নাই।

বেশ একটু বিরক্তচিত্তেই শয্যা ছেড়ে উঠে সদরে এসে দরজার খিলটা খুলতেই রায়বাহাদুরের বাড়ির ড্রাইভার মনোহরলাল শর্বরীকে সেলাম জানাল।

মনোহরলালকে শর্বরী চেনে। ইতিপূর্বে তার স্ত্রীর চিকিৎসা সে করেছিল।

কি ব্যাপার মনোহরলাল! এত রাত্রে?

আপনাকে একবার বড় বাংলোতে যেতে হবে। মনোহরলাল বিনীতভাবে বললে।

মল্লিকদের কুঠীটা এ অঞ্চলে বড় বাংলো নামেই সর্বজনবিদিত। শর্বরী তাই প্রশ্ন করে, কেন বল ত?

রাণীসাহেবা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রাধা পাঠিয়ে দিলো আপনাকে এখুনি একবার নিয়ে যেতে।

রাণীসাহেবা অর্থাৎ ছোট সাহেব রণধীর মুখার্জীর স্ত্রী, এবং রাধা হচ্ছে রাণীসাহেবার খাস পিয়ারের ঝি বা আয়া। শরীরটা ভাল নয়, তবু শর্বরী 'না' বলতে পারলে না। রোগীর ডাক এসেছে। ডাক্তার সে, তাকে যে যেতেই হবে।

শর্বরী বললে, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি এখুনি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

শর্বরী ঘরে ফিরে এসে পরিধেয় শাড়িটা বদলে দু মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিল। ডাক্তারী ব্যাগ ও স্টেথোটা নিয়ে ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে বের হয়ে এল।

বিরাট হাড্‌সন লাক্সারী কার। মনোহরলাল গাড়ির দরজা খুলে দিল, শর্বরী গাড়ির মধ্যে উঠে বসল। মনোহরলাল গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিল।

বড় বাংলো শর্বরীর বাংলো থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটু নির্জনে, উঁচু একটা টিলার উপরে। দোতলা সাদা রঙের বাংলোটা। চারিদিকে ফুলের বাগান। প্রাচীর-ঘেরা একমানুষ সমান উঁচু। ইতিপূর্বে এই সাড়ে তিন মাস প্রায় শর্বরী এখানে এসেছে, কিন্তু বড় বাংলোটা দু-একবার দূর থেকে দেখলেও ভিতরে প্রবেশের সুযোগ হয়নি।

বড় বাংলোর যাবতীয় অসুখ-বিসুখে ডাঃ সাহাই দেখাশোনা করে থাকেন। তার ডাক বড় বাংলোতে এই প্রথম। মোটরের হর্ন শুনে নেপালী বন্দুকধারী দারোয়ান লোহার বিরাট পাল্লাওয়ালা গেট খুলে দিল।

গাড়ি একটা চক্র দিয়ে বাংলোর পশ্চাৎ দিকের গাড়িবারান্দার নীচে এসে ব্রেক করল। অন্দর থেকে বিলিতী কুকুরের গুরুগম্ভীর ডাক ভেসে এলো। মনোহরলালই গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে বন্ধ দরজার গায়ে ইলেকট্রিক কলিংবেলটা টিপল।

গাড়ির মধ্যে উপবিষ্ট শর্বরী তাকিয়ে দেখছিল। লম্বা টানা বারান্দা। বিচিত্র পাতাবাহার ও অর্কিডের সব গাছগাছালি টবে ও বাস্কেটে বারান্দার দুধারে সাজানো।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়স্কা ধোপদুরস্ত একটি সাদা থান পরিহিতা স্ত্রীলোককে দরজার পথে দেখা গেল। কালোর উপরে গোলগাল গড়নটি মন্দ নয় দেখতে।

মনোহরলাল তাকেই বললে, ডাক্তার মেমসাহেব এসে গেছেন। তাঁকে ভিতরে নিয়ে যাও রাধা।

রাধা মনোহরলালের কথায় গাড়ির সামনে এগিয়ে এলো। বললে, আসুন।

গাড়ি থেকে নেমে শর্বরী রাণীসাহেবার খাস পরিচারিকা রাধাকে অনুসরণ করল নিঃশব্দে। সাহেবী কেতায় সজ্জিত লম্বা একটা কার্পেট-মোড়া হলঘর। ধন ও আভিজাত্যের চিহ্ন সর্বত্র। হলঘর পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে রাধা শর্বরীকে নিয়ে দোতলায় দক্ষিণ দিকে একটি ঘরের ভেজানো রঙিন কাচের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ভেজানো কাচের দরজা ঠেলে খুলে রাধা আহ্বান জানাল শর্বরীকে, আসুন।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই কিন্তু শর্বরী নাসা কুঞ্চিত করল। তীব্র একটা ঝাঁজাল কটু গন্ধ তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করছিল।

গন্ধটি শর্বরীর অপরিচিত নয়, তীব্র অ্যালকোহলের গন্ধ।

থমকে দাঁড়াল শর্বরী।

ঘরের মধ্যে জ্বলছে একশ পাওয়ারের উজ্জ্বল আলো। সব কিছু ঘরের অত্যন্ত স্পষ্ট। চোখ তুলে তাকাল শর্বরী অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে।

এ ঘরের মধ্যেও প্রচুর দামী আসবাবপত্র। একধারে একটি শুভ্র শয্যা-বিছানো নিচু পালঙ্ক। সেই পালঙ্কের উপরে দৃষ্টি পড়তেই শর্বরীর চোখের দৃষ্টিটা যেন আটকে গেল।

পালঙ্কের উপরে আধ-শোয়া আধ-বসা অবস্থায় বালিশে হেলান দিয়ে রয়েছে এক নারী। শুধু সুন্দর বললেই যেন যথেষ্ট বলা হয় না, রূপ যেন একেবারে অজস্র ধারায় উপচে পড়ছে তার সর্ব অবয়ব বেয়ে। বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। রোগা ছিপছিপে দেহের গঠন। বালিশের উপরে মুদিতনয়না যে মুখখানি কাত হয়ে রয়েছে, সে মুখের শ্রীর তুলনা বুঝি মেলে না সহসা। যেন একস্তবক ফুল বালিশের উপরে পড়ে আছে! পরিধানে কালো রেশমী শাড়ি। বক্ষের বসন অবিন্যস্ত, স্খলিত। একটা হাত এলানো। অন্য হাতটি ঝুলছে পাশ দিয়ে। হাতের হীরার জড়োয়ার চুড়ি প্রখর আলোয় যেন বিদ্যুতের ঝিলিক হানছে।

শর্বরী কয়েক মুহূর্ত পরে রাধার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, উনিই!

হ্যাঁ।

কি হয়েছে?

মৃদু রহস্যপূর্ণ একটি হাসির বঙ্কিম রেখা কেবল রাধার ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল। কোন কথা বললে না সে।

আবার প্রশ্ন করে শর্বরী, কি হয়েছে ওঁর?

এগিয়ে গিয়েই দেখুন না কি হয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল এবারে শর্বরী তাঁর অতি নিকটে। রাধাও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল। সে-ই ডাকল মৃদুকণ্ঠে, রাণীসাহেবা?

কে? জড়ানো আঁখি তুলে তাকাল রাণীসাহেবা।

ডাক্তার মেমসাহেব এসেছেন রাণীসাহেবা।

বসতে দে। বলেই আবার চক্ষু মুদিত করল রাণীসাহেবা।

শর্বরীকে রাধার সাহায্য করতে হলো না। একপাশে গদীমোড়া একটা ছোট টুল ছিল, শর্বরী নিজেই সেটা টেনে নিয়ে বসল।

রাধা শর্বরীর কালো ডাক্তারী ব্যাগটা তার পাশে নামিয়ে দিয়ে নিম্নকণ্ঠে

বললে, আমি ঘরের বাইরেই আছি ডাক্তার মেমসাহেব। দরকার হলে আমাকে ডাকবেন।

বড় বাংলোতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শবরীর একজনের কথা মনে হয়েছিল, এই গৃহের বর্তমান কর্তা ছোট সাহেব অর্থাৎ রণধীর মুখার্জী। তাঁকে এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কেন। এবং কি জানি কেন, মনে মনে হঠাৎ সেই লোকটি এ ঘরে এসে না উদয় হয় এই কথাটা বারবার ভাবছিল। তাই রাধাকে প্রস্থানোদ্যত দেখে শবরী প্রশ্ন করলো, তোমাদের ছোট সাহেব কোথায়?

রাধার ওষ্ঠপ্রান্তে আবার সেই বিচিত্র হাসির চাপা বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখা দিল। সে নিম্নকণ্ঠে বললে, রাত্রে তিনি যেখানে থাকেন সেখানেই আছেন।

মানে! তিনি বাড়িতে থাকেন না?

না।

কখনোই তিনি রাত্রে বাড়িতে থাকেন না নাকি?

না।

শর্বরীর একবার ইচ্ছা হলো, ছোট সাহেব তাহলে রাত্রিতে কোথায় থাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কি জানি কি ভেবে সে প্রশ্নটা সে আর করল না। আবার রাধা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে এবারে সে আর রাণীসাহেবা।

সমস্ত বড় বাংলোটা যেন অদ্ভুত স্তব্ধ মনে হয়। ঘরের চারদিকে আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল শর্বরী। চারদিকে বিলাসের প্রাচুর্য যেন ঝলমল করছে। ঘরের সাদা ধবধবে দেওয়ালে অত্যুজ্জ্বল একশ পাওয়ারের আলোর দীপ্তি যেন ঠিকরে পড়ছে। এক কোণে স্ট্যাণ্ডের উপরে সুদৃশ্য একটি ঘড়ি। ঘড়ির কাঁটা প্রায় বারোটার ঘর ধরে ধরে।

আবার তাকাল শর্বরী সম্মুখে আধশোয়া আধবসা বালিশের উপরে মুখরাখা রাণীসাহেবার দিকে।

আচমকা মাঝরাত্রে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে কোথায় তাকে এরা নিয়ে এলো!

ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটার ঘোষণা শুরু হতেই চোখ মেলে তাকালেন রাণীসাহেবা।

আপনার কি কষ্ট বলুন ত! ডাক্তার শর্বরী এবারে সচেতন হয়ে উঠল।

কষ্ট? রাণীসাহেবা প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ।

বড় কষ্ট! বুকটার মধ্যে জলে যাচ্ছে! কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাণীসাহেবার মুখ দিয়ে ভরভর করে এবার অ্যালকোহলের ঝাঁঝালো গন্ধ বের হয়ে এলো।

ওসব খেলে বুক ত জ্বলবেই! শর্বরী বলে।

কি, মদ?

হ্যাঁ!

কিন্তু ও খাওয়া আমার অভ্যেস আছে।

শর্বরী যেন কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সম্ভ্রান্ত বাড়ির খুব সম্ভবতঃ এক শিক্ষিত বধূ অনায়াসেই কিনা বলছে মদ্যপানে সে অভ্যস্তা!

কিছু খেয়েছিলেন, না শুধু পেটেই ওসব খেয়েছেন?

কি খাবো! ঐ সব বাবুর্চিদের হাতের মাংস, স্টু, কোপ্তা, কাবাব! না খেলে নয়, তাই খাই, গা আমার ঘিনঘিন করে।

কেন?

জগদীশ শাস্ত্রীর পৌত্রী আমি। চিরদিন নিরামিষ খাওয়াই আমার অভ্যাস। ওসব খেতে রুচি হয় কখনো, আপনিই বলুন না!

বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক জগদীশ শাস্ত্রী নামটা শর্বরীর অপরিচিত নয়! ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ! তাঁরই পৌত্রী—সে কিনা আজ অক্লেশে মদ্যপান করছে! কেন? কোন্ দুঃখে? দেহভরা জগদ্ধাত্রীর মত রূপ! ধনী রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রবধূ। এর আবার কি দুঃখ থাকতে পারে! আর কেনই বা এর দুঃখ থাকে!

হঠাৎ রাণীসাহেবার কণ্ঠস্বরে শর্বরী চমকে উঠে তার দিকে তাকায়। রাণীসাহেবা বলে আপনি ভাবছেন নিশ্চয়ই কেন আমি মদ খাই, তাই না! আমার অবস্থা হলে বুঝতে পারতেন। গত এক বছরের মধ্যে চার মাস আমি রাতের পর রাত একটি মুহূর্তের জন্যও দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি। চোখ বুঝলেই—, শিউরে উঠলো রাণীসাহেবা কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে হঠাৎ।

চোখ বুঝলে কি? প্রশ্ন করে শর্বরী।

দেখি একটা কুৎসিত কালো মেয়ে যেন দু হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে তার ধারালো চকচকে সাদা দাঁতগুলো দিয়ে কামড়াচ্ছে। উঃ, সে কি যন্ত্রণা! ধড়ফড় করে জেগে উঠি। ঘুমোতে আমি পারি না। শেষ পর্যন্ত আর সে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মদ খাই। Peg after peg! Peg after peg! কিন্তু

কই, তাতেও ত ভোলা যায় না! যেই নেশা কেটে যায়, নিজের উপরে ঘেন্নায় ধিক্কারে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।

তবে ওগুলো মিথ্যে আপনি খান কেন?

খাবো না ত কি করবো বলতে পারেন? বলুন না, মদ ছাড়া এ রোগের আর কোন ওষুধ আপনি জানেন। এখানকার লোকেরা বলে আপনি নাকি ধন্বন্তরি! কত জনের কত কঠিন রোগ আপনি সারিয়েছেন। সারিয়ে দিন না আমার অসুখটা। করুণ মিনতি রাণীসাহেবার কণ্ঠ হতে ঝরে পড়ে।

ঠিক কি জবাব দেবে শর্বরী বুঝতে পারে না। স্তব্ধ হয়ে শুধু বসে থাকে।

রাণীসাহেবা বললেন, রাধা বলছিল আপনি নাকি আমার অসুখ সারিয়ে দিতে পারবেন। তাই ত আপনাকে ডেকে আনালাম।

আজ আপনি শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। পরে একদিন দিনের বেলায় এসে আপনার অসুখের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবো। জবাবে বলে শর্বরী।

কিন্তু দিনের বেলা ত আমার কোন অসুখ থাকে না। রাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ত আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। সন্ধ্যাও নামে, আমারও বুকটার মধ্যে কেমন যেন ধড়ফড় করতে শুরু করে। নিঃশ্বাস আটকে আসে। সমস্ত শরীরটা কেমন যেন ঝিমঝিম করতে শুরু করে।

সব শুনবো আমি একদিন দিনের বেলা এসে। এখন আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন দেখি। শর্বরী আবার বলে।

না। আপনি বুঝতে পারছেন না। রাধা! এই রাধা!……

পরিচারিকা রাধা তাড়াতাড়ি ছুটে এলো।

কই, আমার বোতল গ্লাস কোথায় রাখলি! দে, একটু ঢেলে দে।

বোতলটা ফুরিয়ে গেছে রাণীসাহেবা। রাধা কুণ্ঠিত ভাবে বললে।

ফুরিয়ে গেছে! কেন কাবার্ডে আর বোতল নেই? একটা নতুন বোতল খোল্!

বললাম তো আর বোতল নেই।

হঠাৎ কুশ্রী চিৎকারে খিঁচিয়ে উঠলো সম্ভ্রান্তবংশের অন্তঃপুরচারিণী, ফের মিথ্যে কথা বলছিস হারামজাদী! চাবকিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দেব, যা যেখান থেকে পারিস নিয়ে আয়।

রাধা এবার বোধ করি বোতল আনতেই আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে বসে রইলো শর্বরী।

হোয়াইট হর্সের একটা বোতল ও একটা সুদৃশ্য কাচের গ্লাস এনে সামনের

একটা ত্রিপয়ের উপরে নামিয়ে রাখল রাধা।

মিথ্যে কথা বোধ হয় বলেছিল সে আর খেতে দেবে না বলেই, বলেছিল, বোতল ফুরিয়ে গিয়েছে।

দে ঢেলে দে। রাণীসাহেবা বললেন।

রাধা গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল। কিছুটা গ্লাসে ঢেলে থামতেই রাণীসাহেবা বলে উঠলেন, ওকি! থামলি কেন, আর একটু ঢাল্!

আরো খানিকটা ঢেলে জল মিশিয়ে গ্লাসটা এগিয়ে দিল রাধা। একচুমুকে যেন চোঁ চোঁ করে সবটুকু গলায় ঢেলে নিঃশেষিত গ্লাসটা রাধার হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে রাণীসাহেবা বললেন, আর একটু ঢাল্ রাধা।

শর্বরী এবারে বাধা দিল, না। আর খাবেন না।

আধবোজা নেশাগ্রস্ত ঢুলু ঢুলু চোখে ডাঃ শর্বরীর মুখের দিকে তাকালেন রাণীসাহেবা। বললেন, ভয় নেই, ওতে আমার কিছু হয় না।

তবু খাবেন না আর।

কিন্তু বুকের ভিতরটা যে জ্বলে একেবারে খাক হয়ে যাচ্ছে।

আপনি যা খাচ্ছেন ওতেও সে জ্বালা কমবে না, বরং আরো বেড়ে যাবে। তার চাইতে বরং আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। আমি ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিই—অন্ধকারে—

শর্বরীর কথা শেষ হলো না। একটা ভয়ার্ত আকুল চিৎকার করে উঠলেন রাণীসাহেবা, না না—আলো নিভাবেন না, আলো নিভাবেন না। অন্ধকারে আমি থাকতে পারি না। আমার যেন দম আটকে আসে। আমি জেগে থাকতে চাই, আমি জেগে থাকতে চাই। আপনি!—আপনি এখন যান। রাধা ড্রাইভারকে বল ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসতে। যান আপনি—আপনি যান।

শর্বরী যেন একটা ধাক্কা খেয়েই ঘর থেকে বের হয়ে এল।

পরের দিন হাসপাতালে ডাঃ সাহার সঙ্গে দেখা হলে শর্বরী তার গত রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা বলতেই, ডাঃ সাহা মৃদু হেসে বললেন, কাল রাত্রে তাহলে তোমার বড় বাংলোতে ডাক পড়েছিল। জান শর্বরী, মানুষের অসংখ্য বিচিত্র ব্যাধির ঐ আর একটি রূপ। মনের ব্যাধি! সুরুচির ঐ আজকের ব্যাধির জন্য দায়ী কে জানো, ওর ঐ পাষণ্ড চরিত্রহীন স্বামী রণধীর মুখার্জী।

তারপর ডাঃ সাহা যা বললেন তা সত্যিই বিচিত্র।

ধনের প্রাচুর্য না থাকলেও সামাজিক কৌলীন্যের সঙ্গে রূপের প্রাচুর্য ছিল

সুরুচির, যে প্রাচুর্য তাকে লক্ষপতি রায়বাহাদুর মুখার্জীর একমাত্র পুত্রের বধূর পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রায়বাহাদুর অনেক দেখেশুনেই বিখ্যাত পণ্ডিতবংশের অসামান্যা রূপবতী কন্যা সুরুচিকে পুত্রবধূরূপে নির্বাচন করেছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রণধীর যেন ক্রমশই নিম্নশ্রেণীর লম্পটে পরিণত হচ্ছিল। কুলি-কামিনদের ভিতর থেকে সাঁওতাল মেয়েদের এনে প্রকাশ্যেই রাত্রে নিজের ঘরে যথেচ্ছাচার করতো রণধীর। এবং বিবাহের পর কিছুদিন সেই স্বৈরাচার বন্ধ থাকলেও বছরখানেক পরে গোপনে গোপনে আবার পূর্বাভ্যাসে সে ফিরে যেতে লাগল।

ঐ সময় বাতব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী হলেন রায়বাহাদুর। ফলে নিষ্কণ্টক রণধীরের যথেচ্ছাচারিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। এবং প্রথম প্রথম স্ত্রীর কাছে চক্ষুলজ্জার ভয়ে রণধীর আলাদা একটা বাড়িতে রাত কাটাত ঐসব মেয়েদের নিয়ে। কিন্তু ক্রমে এ-কান ও-কান হতে হতে স্ত্রী সুরুচির কানে যখন তার কীর্তিকলাপ পৌঁছতে শুরু করল, তখন সে লজ্জার বাঁধও একটু একটু করে ভেঙে পড়তে লাগল। শেষটায় আবার সে পূর্বের মত বড় বাংলোর নিচের একটা ঘরেই সাঁওতাল মেয়েদের ধরে এনে রাত কাটাতে লাগল।

ঐ রকম এক রাত্রের ব্যাপারই বোধ হয় সুরুচির চোখে পড়ে যায়। তারপর থেকেই সুরুচির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। সুরুচি কেমন গম্ভীর হয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু বোধ হয় পারলে না তার মন থেকে স্বামীর ঐ বিকৃত রুচি ও নিম্ন-শ্রেণীর নারীসঙ্গ-লিপ্সার চিন্তাটাকে দূর করতে।

সেই চিন্তাই ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তার অবচেতন মনের মধ্যে এক ভয়াবহ অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলল, যেটা রূপ নিল শেষ পর্যন্ত মানসিক ব্যাধির। সেই ব্যাধি—সে ভীতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই সুরুচি আশ্রয় নিল মদের। কিন্তু হতভাগিনী বুঝতে পারল না যে মদ্যপান তাকে মুক্তি দেবে না। নিষ্কৃতির পথ ওটা নয়। দুঃখটা তাতে আরো জটিল হয়েই উঠবে।

দিনের পর দিন তারপর চলতে লাগলো একই নাটকের পুনরাবৃত্তি। বৃদ্ধ পঙ্গু নিরুপায় রায়বাহাদুর সব জেনেও চুপ করে রইলেন আর উপরের একটা ঘরে বসে সুরুচি গ্লাসের পর গ্লাস মদ শেষ করতে লাগলো।

শর্বরী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ডাঃ সাহার মুখে সুরুচি—বড় বাংলোর রাণীসাহেবার কাহিনী শুনে। ভয়াবহ এক মানসিক ব্যাধির মূল নির্ণয়ের কাহিনী তাকে বাক্যহারা করে দিয়েছিল।

শর্বরী প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা ঐ রোগ থেকে কি ওকে সারিয়ে তোলা যায় না ডাঃ সাহা?

যায় না এমন কথা বলবো না। তবে ঐ ধরনের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা একমাত্র তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা ঐ রোগের বিশেষজ্ঞ। শুধু তাই নয়। তার জন্য চাই দীর্ঘদিনের যত্ন, প্রচেষ্টা ও ধৈর্য। দেহের একটা জীবাণুকে তাড়ানো অনেক সময় সোজা হয় ঔষধ দিয়ে, কিন্তু মনের ব্যাধির মূলে যে কার্যকারণ রয়েছে, যার প্রভাবে মস্তিষ্কে ধরেছে ভাঙন, তাকে দূর করা অত সহজসাধ্য নয়। জটিল মস্তিষ্কের সংখ্যাতীত কোষের কোন অদৃশ্য অভ্যন্তরে যে কোন বিপর্যয় ঘটিয়েছে, কয়েকটা সাধারণ বাহ্যিক পরীক্ষার দ্বারা তা নির্ণয় করা অত সহজ নয় যেমন তেমনি কিছু পেটেন্ট মেডিসিন ওকে গলাধঃকরণ করিয়েও সুস্থ করে তোলা সম্ভব নয়। রাণীসাহেবার মস্তিষ্ক থেকে এ ব্যাধি দূর করতে হলে শুধু বিশেষজ্ঞের চিকিৎসাই নয়, সেই সঙ্গে প্রয়োজন ওর স্বামীর পূর্ণ সহযোগিতা ও সহানুভূতি, দীর্ঘদিন ধরে যা ক্রমে ক্রমে তাকে সুস্থ করে তুলবে একদিন হয়ত।

শর্বরী প্রশ্ন করে, আচ্ছা ডাঃ সাহা, রণধীরবাবু ত শুনেছি শিক্ষিত এবং ভাল বংশের সন্তান, তবে ওরই বা এ ধরনের প্রবৃত্তি হয় কেন?

প্রশ্নটা তোমার যথেষ্ট চিন্তা ও বুদ্ধিরই পরিচয় দিচ্ছে শর্বরী। বললেন ডাঃ সাহা। তারপর একটু থেমে আবার শুরু করলেন, তোমার মত আমারও মনে ঐ প্রশ্নটার উদয় হয়েছিল একদিন শর্বরী। এবং এককালে আমি মানসিক ব্যাধি নিয়ে কিছুটা পড়াশুনাও করেছিলাম। সেই কৌতূহলেই রায়বাহাদুরকে আমি প্রশ্ন করে রণধীর সম্পর্কে যে মোটামুটি আইডিয়া গড়েছি সেটা হচ্ছে—রায়বাহাদুরকে তুমি দেখনি, দেখলে দেখতে সাধারণতঃ বাঙালীদের ঘরে অমন লম্বা-চওড়া সুপুরুষ বড় একটা দেখা যায় না। যেমনি দেহের বিরাট গঠন, তেমনি দেহের রঙ। রণধীর ঠিক বাপের দেহগত বৈশিষ্ট্যই পেয়েছে কেবল গায়ের রঙটা বাদে। খুব অল্প বয়সে—রণধীরের যখন মাত্র দুই বৎসর, সেই সময় রণধীরের মা মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রায়বাহাদুর আর বিবাহ করেন নি। মাতৃহারা শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে ঝুমনী নামে একটি ক্রিশ্চান যুবতী সাঁওতাল রমণীর উপরে। বুঝতেই পারছো, রায়বাহাদুরের ঐ যুবতী সাঁওতাল রমণীটির প্রতি দুর্বলতা বা আকর্ষণ ছিল। যাহোক রণধীর ঐ ঝুমনীর স্নেহ ও যত্নেই লালিতপালিত হতে থাকে। এবং ঐ আঁটসাট গড়ন কালো বেঁটেখাটো সাঁওতাল রমণীর দীর্ঘদিনব্যাপী অষ্টপ্রহরের সাহচর্যে, একটা মনোগত

বিশেষ আকর্ষণ জন্মায় তার প্রতি রণধীরের। ফলে ঐ শ্রেণীর নারীর প্রতি রণধীরের অবচেতন মনে ক্রমশঃ একটা যৌন আকর্ষণ গড়ে ওঠে, যেটা তার পরবর্তী জীবনে তার ব্যবহারে ও কর্মে স্বভাবতই প্রতিফলিত হয়েছে। এবং যে আকর্ষণ তার সমস্ত শিক্ষা, দীক্ষা ও রুচিবোধকে পর্যুদস্ত করে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হয়ত অজ্ঞাতে ঐ শ্রেণীর রমণীদের সংসর্গে অন্ধ আবেগে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আজও পরবর্তী জীবনে। এও এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। যে ব্যাধির মূল ছিল তার নিজের জীবনের পরিস্থিতির মধ্যেই বীজের আকারে ছড়ানো। রণধীর ও রাণীসাহেবা দুজনেই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত।

ডাঃ সাহার মুখে রণধীর ও রাণীসাহেবা সুরু্চির ভয়াবহ ব্যাধির কথা শুনে সেদিন শর্বরীর বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

ক্ষয়, কুষ্ঠ ও সিফিলিসের চাইতেও মারাত্মক ব্যাধি এই মনোবৈকল্য।

তাই মধ্যে মধ্যে আজকাল শর্বরীর মনে হয়, কত অসহায় মানুষের কষ্টার্জিত ও উদ্ভাবিত আজিকার এই চিকিৎসা-শাস্ত্র দুরারোগ্য সব ব্যাধির কাছে। নিত্য নতুন যেমন চিকিৎসা ও ঔষধ আবিষ্কৃত হচ্ছে, সেই সঙ্গে পাশাপাশি আবিষ্কৃত হচ্ছে নব নব সব অদ্ভুত দুরারোগ্য ব্যাধি প্রতি মুহূর্তে মানুষের শ্রম প্রচেষ্টা যতই ব্যাধির কাছে পরাজয় মানছে ততই তাদের প্রতিজ্ঞা যেন কঠিন হয়ে উঠছে।

জল স্থলকে আজ তারা জয় করছে তাদের উদ্ভাবনী প্রতিভা দিয়ে, ব্যাধিকেও আজ তাই তারা জয় করবার দুর্জয় সংকল্পে জীবন পণ করেছে।

হাসপাতালের আবহাওয়ার মধ্যে রোগ, ব্যাধি ও রোগগ্রস্তদের নিয়ে শর্বরী যেন নিজেকেই নিজে ভুলে যায়। তারও যে একটা আলাদা সত্তা আলাদা মন আছে, তারও যে আছে সাধারণ আর দশজনার মতই সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা, সে যেন সত্যিই ভুলে গিয়েছে।

কিন্তু ঐ সব চিন্তা সত্ত্বেও তার শরীরের অভ্যন্তরে যে জীবনের অদৃশ্য গঠন চলেছে তিলে তিলে, মধ্যে মধ্যে তার সমস্ত দেহ সমস্ত সত্তাকে যেন প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে জানিয়ে দিতে চায় দ্রুত নিকটবর্তী অবশ্যম্ভাবী এক প্রশ্নের।

সে প্রশ্নের সম্মুখীন একদিন তাকে হতেই হবে, সে রূঢ় সত্যকে এড়িয়ে যাবার কোন রাস্তাই তার নেই। আর ঐ মুহূর্তটিতে ঠিক সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায় শৈবালকে।

শৈবাল! শৈবাল।

সমস্ত সম্পর্ক তার সঙ্গে ছিন্ন করে এলেও প্রেমের দেবতা দুটি মনকে তাদের

একদিন অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই অদৃশ্য বন্ধনের গ্রন্থি ত উন্মোচিত হবার নয়। যে গ্রন্থি সে বহন করে এনেছে সেই গ্রন্থিই যে তার সমস্ত জীবনভোর তাদের সেই প্রেমেরই স্বীকৃতি হয়ে থাকবে।

শৈবালকে সে অস্বীকার করলেও তার স্বতঃসিদ্ধ দাবিকে সে অস্বীকার জানাবে কেমন করে। শৈবালের যে স্বীকৃতি আজ তার দেহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে, তাই ছিঁড়ে ফেলে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হবার ক্ষমতা আজ তার কোথায়।

॥ ৫ ॥

আর শৈবাল।

শৈবালের সমস্ত পৃথিবী যেন শর্বরীর অকস্মাৎ নিরুদ্দেশে একেবারে শূন্য মিথ্যা হয়ে গিয়েছে।

সে হাসপাতালে যায়, কাজ করে, কিন্তু মন তার নিজের বশে নয়।

মেডিকেল আউটডোর থেকে বদলী হয়েছে আজকাল শৈবাল চেস্ট আউট-ডোরে। শৈবালের বরাবরই ইচ্ছা ছিল বিলাত থেকে ক্ষয় রোগেরই বিশেষজ্ঞ হয়ে আসবে। যদিচ সে জানত ক্ষয় রোগের বিশেষজ্ঞের শুধু একটা বিলিতী ছাপ হলেই হবে না। সঙ্গে লণ্ডন কিংবা এডিনবরার একটা মেম্বারসিপ্- (এম্. আর. সি. পি.) এর ছাপও প্রয়োজন টি ডি. ডি.র সঙ্গে সঙ্গে। তাই দুটোর জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিল একটু একটু করে শৈবাল। ক্ষয় রোগে বিশেষজ্ঞ হবার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল শৈবালের। তার মনে হতো যত প্রকার রোগ আছে তার মধ্যে ঐ ক্ষয় (টি. বি.) রোগটা বিশেষ ভাবেই মারাত্মক। সাধারণ ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের এমনি পরিস্থিতি যে ক্ষয় রোগটা যেন সহজেই তাদের মধ্যে প্রবেশাধিকার পায়। বিশেষ করে আজকালকার শহর অঞ্চল-গুলিতে। ভেজাল মিশ্রিত অপরিপুষ্ট আহার, সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য নানা জাতীয় অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি বাসস্থান ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র অভাবগ্রস্ত স্বামী-স্ত্রীর জীবনের একমাত্র রিক্রিয়েশন হিসাবে যৌন-ব্যভিচার, ঐ সব কিছুর মিলিত প্রচেষ্টায় যে শহরবাসীদের মারাত্মক ঐ ব্যাধিটির দিকে নিরন্তর ঠেলে দিচ্ছে।

সকাল থেকেই প্রত্যহ চেস্ট আউটডোরে প্রচণ্ড ভিড়। আউটডোর বিলডিংয়ের ঘরে বারান্দায় রক্তশূন্য ফ্যাকাশে একদল স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়িয়ে যেন মৃত্যুর অপেক্ষা করে বোবা অসহায় পশুর মত।

ডাঃ বোস। বিলাত প্রত্যাগত উচ্চ ডিগ্রী ভূষিত বিশেষজ্ঞ, ডিপার্টমেন্টের হেড। বেঁটেখাটো রোগাটে চেহারা। স্বল্পবাক্। বলতে গেলে চেইন স্মোকার। তাঁর অধীনে আরো তিন-চারজন বিশেষজ্ঞ জুনিয়ার ভিজিটিং আছেন, আর আছে একদল অত্যুৎসাহী অনাহারী (Honorary—অবৈতনিক) গালভরা বিশেষণে বিভূষিত এম্ আর. সি. পি. টি. ডি. ডি. ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাধারী তরুণ যুবক ক্লিনিক্যাল টিউটারের দল। তাদের বুকজোড়া আশা কুহকিনী, বড় হাসপাতালের গন্ধে গন্ধে যেন তেন প্রকারে থাকতে পারলেই তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিশ রোখে কে। এবং সেইজন্য সেই সব পোস্টে ঢুকবার জন্য কি উমেদারী, কি ধরাধরি মামা কাকা দাদা ও শ্বশুরদের। বড হাসপাতালে ঢোকা ত চারটিখানি কথা নয়। তার জন্য অনেক কাঠ খড তেল কেরোসিন পোড়াতে হয়। ডাক্তারের দলও ঐ সব 'অনাহারী' চাকরিতে ঢুকে ভাবেন তারা ধন্য হয়ে গেলেন, কর্তৃপক্ষও ভাবেন ধন্য করে দিলাম ওদের। দু পক্ষই ধন্য হন, মাঝখান থেকে কেবল বেচারী রোগীরা উভয় পক্ষের ধন্য হবার চাপে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায়। অথচ মহামান্য কর্তৃপক্ষের দলও বুঝতে চান না যে, দীর্ঘদিন ধরে বলদ দিয়ে তেল পিষতে হলে তাদের কেবল অনাহারে রাখলে ঘানির সঙ্গে তারা ঘুরবে বটে, তবে তেল বেরুবে না। আর কৃতকৃতার্থ যারা হলো অনাহারী চাকরি পেয়ে তাদের পদমর্যাদার মোহটা যখন দুদিন বাদেই কেটে যায় তখন তারা ঐ নিত্য হাজিরাটুকুই দিয়ে যান মাত্র, তেল আর পেষেন না। শুধু তকমা দিয়ে যে পেট ভরে না, এ কথাটাই কর্তৃপক্ষের দল বুঝতে চান না।

তাই চেস্ট আউটডোরের অন্যান্য বড বড হাসপাতালের আউটডোরের মত সবই হয়। হয় না শুধু রোগীকে সারিয়ে তোলা। ঘটা করে রোগ নির্ণয় হয়, এবং বারোয়ারী প্রথায় আউটডোরের পেটেন্ট মিকশ্চার বিতরণ হয়; সকাল হলেই বড় বড় গাডিতে চেপে ডাক্তার বিশেষজ্ঞের দল আসেন ও রোগীরাও ভিড জমায়, কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

সব দেখেশুনে শৈবালের ঘেন্না ধরে যায়, কিন্তু উপায়ই বা কি। গয়ংগচ্ছ করে যেমন চলেছে তাকেও সেইভাবেই চলতে হবে।

ভিউ বক্সের গায়ে একটা এক্স-রে ফিল্ম চাপিয়ে শৈবাল দেখছিল। পাশেই তার একটা টুলের উপরে একজন রোগিণী বসে। তারই পাশে দাঁড়িয়ে রোগিণীর স্বামী।

অসুখ ত আপনার এখন অনেকটা কম বলেই মনে হচ্ছে। শৈবাল বলে।

কিন্তু ওর কাশিটা ত একেবারে যাচ্ছে না ডাক্তারবাবু! স্বামী বলে।

যাবে। পি. এ. সি. যেমন চলছিল তেমনি খাইয়ে যান। আর কমপ্লিট্ রেস্টের প্রয়োজন। সেটার দিকে বিশেষ নজর রাখবেন। দুধ ঘি ছানা মাখন যত পারেন খেতে দেবেন। রেস্ট, মেডিসিন আর ডায়েট এই ত এই রোগে—

বলছেন তো দুধ, ঘি, মাখন, ছানা কত কি, কিন্তু পাই ত মাইনে বলে একশ ত্রিশটি টাকা মাত্র ডাক্তারবাবু! ওষুধের দাম কুলিয়ে উঠতে পারি না— তা ওসব কোথা থেকে আসবে বলুন!

না দিতে পারলে সারবে না। স্ত্রীকে আপনার বাঁচিয়ে তুলতে হলে, যা যা বললাম সব করতে হবে বৈকি। নির্বিকার কণ্ঠে শৈবাল বলে।

আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ভর্তি করবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না?

এখানে ত বেড নেই। অন্যত্র চেষ্টা করে দেখুন না।

আমাদের মত সাধারণ লোকের চেষ্টায় আর কি হয় বলুন। আমার এক বন্ধু বলছিল ডাঃ বোসকে নাকি বাড়িতে ডেকে দুটো ভিজিট দিলে একটা ব্যবস্থা হয়। হয় ত বলুন, ঘটি-বাটি বেচে না হয়—

শৈবাল জানে সবই। এবং কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয় বহুক্ষেত্রেই। তবু স্বীকার করতে চায় না। বলে, জানি না মশাই। সে আপনার বন্ধুই জানেন। আচ্ছা আসুন—

দ্বিতীয় রোগী এগিয়ে এলো।

শৈবাল তাকে পরীক্ষা করে হাসপাতালের একটা এক্স-রে ফর্ম লিখে দেয়।

রোগী বলে, দিলেন ত ফর্ম লিখে—ডেট্ ত পড়বে এক মাস পরে।

কি করা যায় বলুন, রোগী ত কম নয়।

বাইরে থেকে যদি ছবি তুলিয়ে আনি?

পারেন ত ভালই। আনবেন।

এবারে এলো তৃতীয় রোগিণী। তারই ব্যবস্থাটা কোন মতে সেরে চতুর্থ রোগীর কাগজপত্র নিতেই অন্য এক ডিপার্টমেণ্টের কে এক ডাক্তার মুখার্জী সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শৈবাল ব্যস্ত নাকি!

না। কি ব্যাপার?

আমার এই ভাইটিকে একবার ডাঃ বোসকে দিয়ে দেখিয়ে দাও না ভাই।

ডাঃ বোস এসেছেন তুমি জান?

হ্যাঁ, খবর নিয়েছি তাঁর ঘরেই আছেন।

চল।

দোতলায় ডাঃ বোসের রুম।

শৈবাল ডাঃ মুখার্জী ও তার ভাইকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

সাদা অ্যাপ্রন গায়ে মুখে জলন্ত সিগ্রেট ডাঃ বোস চেয়ারে বসে খট্ খট্ করে কি একটা টাইপ করে চলেছেন ছোট একটা পোর্টেবেল টাইপরাইটারে। আশে-পাশে ভিড করে দাঁড়িয়ে আছে চার-পাঁচজন নতুন ডাক্তার, হাউস স্টাফ দুজন, নার্স, দুজন ক্লিনিক্যাল টিউটর।

স্যার ?

Yes। শৈবাল,--টাইপ করতে করতেই ডাঃ বোস বললেন।

এই রোগীটিকে একটু দেখে দিতে হবে স্যার।

কি ব্যাপার ? পূর্ববৎ নিজের কাজেব মধ্যে ব্যস্ত থেকেই প্রশ্ন করলেন ডাঃ বোস।

প্লেটগুলো এগিয়ে দিল শৈবাল।

প্লেটগুলোতে একটার পর একটা দু-এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে বললেন, অ্যাকটিভ লিসন আছে বলে ত মনে হচ্ছে না। বলতে বলতে আবার টাইপ শুরু করলেন।

ঔষধপত্র কি চলবে ?

দরকার নেই কিছুই।

স্ট্রেপ্টোমাইসিন আর পি. এ. সি চলছিল, এখন কি বন্ধ থাকবে ?

থাকুক।

কিন্তু একটু কাশ আছে।

ও ঠিক হয়ে যাবে।

ই. এস. আরও একটু হাই।

ভয়ের কারণ নেই।

অফিসের কাজকর্ম কি চলতে পারে ?

কেন চলবে না।

আর কত বিরক্ত করা যায়। অগত্যা ওদের বেরিয়ে আসতেই হলো। রোগী কেবল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একবার বললে, আমাকে পরীক্ষা ত করলেন না!

কিন্তু ডাক্তার ভাই বা শৈবাল কেউই সে প্রশ্নের জবাব দিল না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অন্য এক ডিপার্টমেন্টের হাউস ফিজিসিয়ান ডাঃ মজুমদারের সঙ্গে দেখা হলো।

কি খবর মজুমদার ?

ডাঃ বোসের কাছে যাচ্ছি।

কেন, কি হলো আবার ?

কি আর হবে—আমাদের ওয়ার্ডের সেই ১৩নং রোগিণীর ব্যাপারটা। তোমরা বললে, টি. বি., এক্স-রেতেও পাওয়া গেল টি. বি.—তারপর পোস্টমর্টেমে বলছে ফুসফুস সম্পূর্ণ নিরোগ।

পোস্টমর্টেম মানে ?

মানে আর কি! সেই রোগিণী টি, বি রোগ জানতে পেরে হাসপাতালের দোতলার জানালা থেকে লাফিয়ে পড়ে সুইসাইড্ করেছে।

বল কি। তারপর ?

তারপর আর কি। এখন করোনার্স কোর্টে হাজির হয়ে কিছু বলতে হবে ত।

কিন্তু ব্যাপার কি, সত্যিই রোগীর টি. বি. ছিল না নাকি!

কে জানে ভাই। যাই একবার তোমাদের কর্তার সঙ্গে দেখা করে আসি। ডাঃ মজুমদার উপরে চলে গেল।

বন্ধুকে বিদায় দিয়ে শৈবাল এসে আবার চেয়ারে বসল। দু মাস হয়ে গেল, শর্বরীর কোন সন্ধানই আজ পর্যন্ত আর পায়নি শৈবাল। আরো একদিন সাহস করে ইতিমধ্যে শৈবাল গিয়েছিল শর্বরীদের বাড়িতে। দরজার কাছেই আলোর সঙ্গে দেখা।

শৈবালদা!

কেমন আছো আলো ?

ভাল।

তোমার বাবা কেমন আছেন ?

সেই রকমই আছেন।

এবার যেন একটু ইতস্তত: করেই শৈবাল জিজ্ঞাসা করলে, শর্বরীর কোন সংবাদ পেয়েছো ?

না।

ছোট্ট সংক্ষিপ্ত উত্তর। এবং উত্তর দেবার বিশেষ ভঙ্গীটির ভিতর দিয়েই স্পষ্ট প্রকাশ পেল, আলো তার দিদি শর্বরীর আলোচনা যেন করতে চায় না।

আচ্ছা চলি। শৈবালকে দ্বিতীয় আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে আলো বাড়ির মধ্যে চলে গেল। তারপর আর সাহস হয় নি শৈবালের ওপাড়া পর্যন্ত মাড়াতে। নিজের অপরাধবোধটা যেন ওদিকে গেলে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে মনে। তার মনে হয়—সেই তো শর্বরীর আকস্মিক নিরুদ্দেশের জন্য দায়ী, আর কেউ একদিন ভুলতে পারলেও ওরা কোনদিনই হয়ত ভুলবে না। কারণ শৈবাল সংবাদ পেয়েছিল, শর্বরী চলে যাওয়ায় আলোদের সংসারের অবস্থাটা সত্যিই কাহিল হয়ে পড়েছে। আলোর বাবার সামান্য ইনভ্যালিড পেনশন ও আলোর সামান্য আয় এতই অল্প যে তা দিয়ে আর যাই হোক তিন-চারটি প্রাণীর কলকাতার মত শহরে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করা চলে না।

তাই যতই দিন যাচ্ছে শৈবালের নিজেকে নিজের কাছে যেন ততই ছোট মনে হচ্ছে। কেন যে সেদিন সে হঠাৎ ঐভাবে শর্বরীকে ঐ রূঢ় কথাগুলো বললো! সে কি জানত না স্বল্পভাষিণী শর্বরী কি প্রচণ্ড অভিমানিনী! তবে কেন যে তাকে ওভাবে অমন রূঢ় কথাগুলো বলতে গেল।

আবার মনে হয় শৈবালের—রূঢ় কথা না হয় সে বলেছিলই। উত্তেজনার মুখে মানুষ কত সময় ত কত কিছুই বলে। তাই বলে সেটাকেই চরম সত্যি বলে মেনে নিতে হবে! তাদের এতদিনকার নিবিড় সম্পর্কটাকে একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে হবে!

শৈবাল নিজেও কোনদিন বুঝতে পারেনি শর্বরীর সঙ্গে অকস্মাৎ সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে যে, কী গভীর ভাবেই না সে ভালবেসেছিল শর্বরীকে, এবং যখন সেই সত্যটা শর্বরীর নিরুদ্দেশ হবার পর তার বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে তিল তিল করে বুঝতে পারল, তখন বারংবার তার দু চোখের কোল অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল।

ধনীর একমাত্র সন্তান শৈবাল। চিরদিন পর্যাপ্ত স্নেহ ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যেই মানুষ হয়েছে। হারাবার দুঃখ তাকে একটা পেতেই হয়নি, বিশেষ করে পেয়ে হারাবার দুঃখ। তাই তার জীবনের সব চাইতে প্রিয় শর্বরীকে হারিয়ে কিছুতেই যেন সে দুঃখটাকে ভুলতে পারছিল না।

শুধু তাই নয়।

তার শিক্ষিত মন যখনই শর্বরীর ভবিষ্যতের কথাটা ভাবছিল, তখনই যেন আরো বেশী করে এ ব্যাপারে তার অপরাধবোধটা তাকে পীড়ন করছিল। শৈবাল যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিল না তারই সন্তান আজ শর্বরীর গর্ভে, যে সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব পিতা হিসাবে তারই। এবং সে দায়িত্ব পালনে এতটুকুও

যদি ত্রুটি হয় ত সেই দোষ তারই। সে অপরাধ তারই।

অদৃশ্য কাঁটার মত সেই অপরাধের চেতনাটাই নিরন্তর শৈবালের মনের মধ্যে রক্তক্ষরণ করতে থাকে। বিদেশ-যাত্রার সমস্তই প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল, সব সে বাতিল করে দিয়েছে। এবং সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গাতেই গত ছ মাস ধরে শর্বরীর সন্ধান করেও সে কোন ঠিকানাই তার পায়নি।

ইতিমধ্যে তিন-চার দিন মীনুদির ওখানেও শৈবাল শর্বরীর খোঁজে গিয়েছিল কিন্তু তিনিও কোন সংবাদ শর্বরীর পাননি।

আজকাল কাজ নিয়ে তাই সে নিজেকে ভুলে থাকতে চায়, এবং কাজের মধ্যে যতক্ষণ ডুবে থাকে ততক্ষণ একরকম থাকে কিন্তু অবসর মুহূর্তগুলি যেন পাথরের মত তার বুকের উপর চেপে বসে।

আর একটা নতুন খেয়াল চেপেছে শৈবালের মনের মধ্যে, একটু ফাঁক পেলেই হাসপাতালের শিশুসদনের পাশাপাশি বেডে যে সব শিশু রোগীরা শুয়ে থাকে তাদের দেখে বেড়ানো।

ছোট ছোট বাচ্চাগুলি রোগের জন্য মা-বাপের বুক থেকে ছিন্ন হয়ে হাসপাতালে এসে পড়ে রয়েছে। ওদের দেখলেই কেমন যেন একটা মমতা ওর বুকের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে।

নিজের আউটডোরের কাজ সেরে আজও চলল শৈবাল শিশুসদনের দিকে। লিফ্‌টে করে দোতলায় উঠতেই শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ননীলাল অধিকারীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

বেঁটেখাটো লোকটির দৈর্ঘ্য সাড়ে চার ফুট থেকে পাঁচ ফুটের মধ্যে। প্রখর একটা বুদ্ধির দীপ্তি চোখেমুখে। প্রত্যেকের সঙ্গেই বিদ্রূপ করে কথা বলা ডাঃ অধিকারীর একটি বিশেষত্ব; নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি ও তৎপরতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন। এবং শুধু আত্মসচেতন হলেই কথা ছিল না, সেটাকে তিনি তাঁর প্রতিটি হাবভাবে কথায়বার্তায় যেন একটা খোঁচা দিয়ে যারাই তাঁর সংস্পর্শে আসে তাদের বুঝিয়ে দিতে এতটুকু কসুর করেন না।

শৈবালের সঙ্গে লিফ্‌টের মুখেই দেখা হয়ে যেতে শৈবালই প্রথমে হাত তুলে নমস্কার জানাল।

ডাঃ অধিকারী বললেন, কি খবর হে! এম. আর. সি. পি. তাহলে সত্যি সত্যিই দিতে যাচ্ছো!

হ্যাঁ স্যার, একবার চেষ্টা করে দেখি।

দেখো! টাকা আছে যখন বাপের ব্যাঙ্কে—চেষ্টা করে দেখো। বলতে বলতে অবজ্ঞার হাসি হাসলেন ডাঃ অধিকারী। লিফটের সামনের প্যাসেজটা রোগীতে ভর্তি। ওয়ার্ডের নিয়মিত বেডগুলো ভর্তি হয়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত বেডে সব রোগীরা ঐ প্যাসেজের মধ্যেই দুধারে স্থান পেয়েছে। হাঁটবার পথটুকু পর্যন্ত নেই। জনসাধারণ চেঁচায় বটে এবং পান থেকে চুন খসলেই নানা সংবাদপত্রে ফলাও করে আন্দোলন শুরু করে দেয় যে, হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ রোগীদের ফেরত দিচ্ছেন, ভর্তি করে নিচ্ছেন না। অথচ তারা ভেবে দেখে না যে, হাসপাতালে হয়ত সাত শত বেডের ব্যবস্থা রয়েছে, সেস্থলে, কর্তৃপক্ষ সময় বিশেষে চৌদ্দ শত এমন কি পনের শত পর্যন্ত রোগী রাখছেন। ভিতরের অসুবিধাগুলো তারা জানতে চায় না। শুধু ফেরত দেওয়া হলো রোগীকে সেইটাই তারা বুঝে নেয়।

এই কথাটাই সেদিন কথাপ্রসঙ্গে ডাঃ সান্যাল বলছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে। বন্ধুটি আবার বিখ্যাত একটি সংবাদপত্রের নিউজ এডিটর। শৈবাল সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিল।

ডাঃ সান্যালের বন্ধু নিউজ এডিটর চিন্ময় বোস লোকটি আবার একটু স্পষ্টবক্তা। তিনি মৃদু হেসে বললেন, কথাটা তোমাদের যে একেবারে মিথ্যে তা অবশ্যি বলতে চাই না ডাক্তার। কিন্তু অপরপক্ষের বক্তব্যে কিছুই কি সত্য নেই? তেমন তেমন ক্ষেত্রে ঐ বোঝার উপরে শাকের আঁটিই কি তোমরা চাপাও না?

হ্যাঁ। চাপাবো না কেন, চাপাই। ক্ষেত্রবিশেষে তা করতে হয় বৈকি! কিন্তু সত্যিকারের দোষ যদি কারো থাকে ত হাসপাতালে বসে হাসপাতাল যারা চালায় সাক্ষাৎভাবে তাদের নয়। পরোক্ষে থেকে যাঁরা ঐ সব চালকদের অদৃশ্য ভাবে পরিচালনা করেন, তাঁদের কথাটা বলতে পারো না। যেখানে লোক-সংখ্যার অনুপাতে অন্ততঃ দশ-বারো হাজার বেডের হাসপাতালের দরকার, সেখানে যদি পাঁচটি বা ছয়টি মাত্র হাসপাতাল থাকে, তবে এর চাইতে বেশী কাজ আমাদের কাছ থেকে তোমরা আশা করতে পারো কি করে বলতে পারো? শুধু তাই নয়, যে ডিপার্টমেণ্টে অন্ততঃ দশজন ডাক্তারের প্রয়োজন, সেখানে দু-তিন-জনের বেশী ডাক্তারই নেই। তার ফলে প্রত্যহ ল্যাবোরেটরি থেকে দুশ-তিনশ ব্লাড, ইউরিন, স্টুল যখন পরীক্ষান্তে ফলাফল আসছে, রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি ফরমুলা মাফিক, এস. এ. পি.—Nil—ও. পি. সি.—Nil। পরীক্ষার তারিখ পড়ছে এক মাস পরে, এক্স-রে ডিপার্টমেণ্টেও হচ্ছে তাই—ফ্র্যাকচার ডিপার্টমেণ্টে যেখানে কনুই প্লাস্টার করতে হবে—করে ছেড়ে দিচ্ছে কনুই বাদ দিয়ে বাকীটুকুর প্লাস্টার। ইয়ার নোজ থ্রোট ডিপার্টমেণ্টে বিশেষজ্ঞেরা যন্ত্রগুলো এক-আধবার

নাকে মুখে গলায় বসিয়ে খসখস করে লিখে দিচ্ছে এলার্জি। দন্ত বিভাগ পটাপট দাঁত তুলে দিয়ে আসল দাঁতটি বাদ দিয়েই কাজ সারছেন। বলতে বলতে অভিজ্ঞ ডাঃ সান্যাল উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, হবে না হে। হবে না। এ নিয়মে চলবে না। চাই আমূল পরিবর্তন, একটা থরো সাফলিং।

চিন্ময় বোস বললেন, কিন্তু গরীব দেশ আমাদের, অত টাকা কোথায় হে। তুমি যা বলছ সে পরিকল্পনায় কাজ করতে হলে যে চাই কোটি কোটি টাকা।

তবে চেঁচিও না। যেমন কাজ আমাদের কাছ থেকে পাচ্ছ তাতেই সন্তুষ্ট থাক।

অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা শল্য-বিশারদ ডাঃ সান্যাল লোকটি। কাউকে রেখে কথা বলেন না। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি হতে চলল কিন্তু এখনো সোজা হয়ে মিলিটারী চালে হাঁটেন। মাথার চুল পেকে সব সাদা হয়ে গিয়েছে, পরনে সাদা জিনের প্যান্ট, সাদা শার্ট, সাদা টুপি।

ঠিক একই ভাবে শৈবাল গত দশ বৎসর ধরে লোকটাকে দেখছে। প্রত্যেক কাজে যেম'ন নিয়মানুবর্তিতা, তেমনি স্থির।

প্যাসেজটা কোন মতে অতিক্রম করে বাঁয়ে ঘুরে কাচের দরজা ঠেলে শিশু-সদনের ভিতরে এসে প্রবেশ করল শৈবাল।

সামনেই একটা ঘরের মধ্যে এক গাদা শিশু ও রোগী ও তাদের এটেনডেণ্ট্ মায়েরা, পয়সা খরচ করে গরু-ভেড়ার মতই গাদাগাদি করে আছে। ভাপ্সা গরমে দম বন্ধ হয়ে আসে। না আছে পর্যাপ্ত পাখার ব্যবস্থা, না কিছু। হাস-পাতালের কর্তৃপক্ষ রোগীদের ফেরত দিলে শুরু হবে গালাগালি, আর রোগীদের আত্মীয়স্বজনরা বিশেষ করে ছাপোষা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যাঁরা তাঁরা ভাবেন নিখরচায় জলযোগের মত অল্পমূল্যে নামকরা হাসপাতালে নামকরা সব বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসা পেতে হলে এটুকু সহ্য করতেই হবে। আর মাঝখান থেকে সত্যিকারের যারা রোগী তাদের প্রাণান্ত।

কাচের দরজা ঠেলে সেই ঘর থেকে বের হয়ে এলেন ঐ বিভাগের হাউস ফিজিসিয়ান ডাঃ মিস্ ঘোষ। চোখ-মুখ গম্ভীর থমথম করছে।

শৈবালই প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার ডাঃ ঘোষ!

রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দেন মিস্ ঘোষ, আর বলেন কেন! হাসপাতাল ত নয়, একটা গরুর গোয়াল। মানুষ যে কেন এর জন্য হন্যে হয়ে অসুস্থ আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে এখানে ছুটে আসে, বুঝতে পারি না। আজ দেড় মাসের উপরে ঐ ঘরটায় গোটা দুই ফ্যান দেবার জন্য রিকুইজিশন করেছি, তা আজ পর্যন্ত টনক নড়াতে পারলাম না তাঁদের।

পাশে এমন সময় কখন ডাঃ চ্যাটার্জী—অন্য একজন শিশুরোগে সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত তরুণ বিশেষজ্ঞ এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ওরা কেউ দেখতে পায়নি। এখনও গা থেকে তাঁর বিলাতের গন্ধ যায়নি ভাল করে, এবং সদ্য সদ্য বিলাতের হাসপাতালগুলোর বিলিব্যবস্থা এখনো ভুলতে পারেননি বলেই সে-দেশ ও এ-দেশের হাসপাতালগুলোর তুলনামূলক সমালোচনায় নাক সিটকান। তিনি বললেন, কে আপনার রিকুইজিশন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে বলুন ত। হাসপাতালের দপ্তরখানা, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তরখানায় হাজারটা ফাইলে ফাইলে লাল পেনসিলের নোটস্-এ ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঘুরে আসবে, তবে ত পাবেন পাখা। আরো মাস চারেক চুপচাপ বসে থাকুন, আসুন, আসুন—কেন মিথ্যে মাথা গরম করছেন। চলুন একটু চা খাওয়া যাক।

সকলে এসে ভিজিটিংদের নির্দিষ্ট বসবার ঘরটিতে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে তখন দু-তিনজন সদ্য পাস করা ডাক্তার-হাউসস্টাফ মিলে হাসির ঝড় বহাচ্ছে।

ব্যাপার কি, এত হৈ-হৈ কেন সরোজ? শৈবালই প্রশ্ন করে।

জানেন শৈবালদা, কলে রাত্রে বি. সার্জিকেলে মজার ব্যাপার হয়ে গেছে।

তোমাদের ডাক্তার ও নার্সঘটিত কেচ্ছা ত। ডাঃ চ্যাটার্জী চেয়ারটা টেনে নিয়ে গলার টাইয়ের নটটা ঠিক করতে করতে বলেন, শুনতে শুনতে ও মহাভারতের কথা পচে গেছে।

না, না—তা নয়। সরোজ সেন বলে।

তবে আবার কি?

২৯নং বেডের আজ অপারেশন ছিল। রাত্রে তাকে প্যারালডিহাইড্ দেবার কথা। সন্ধ্যায় অফ-ডিউটি নার্স যাবার আগে রিপোর্ট বুকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছে। এদিকে কি ব্যাপার হয়েছে জানি না, ২৯নং বেডের পেসেণ্টকে রিমুভ করা হয়েছে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ৪০নং বেডে পাশের ঘরে, বেডটা বোধ হয় খালিই পড়েছিল। ২৮নং বেডের এটেনডেণ্ট ভদ্রলোক রাত্রে খালি বেডের মৌকা পেয়ে তাতেই শয়মান হয়ে নিদ্রাভিভূত হয়েছেন। রাত দশটায় ওদিকে নাইট ডিউটির নার্স এসে ২০নং-এর বেডে সেই এটেনডেণ্ট্‌কেই প্যারালডিহাইড্ দিতে উদ্যত রেক্‌টামে। ভদ্রলোক ত অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে হতভম্ব। তিনি যত বলেন আমি রোগী নই, নার্স তত বলে, আপনিই।

কি বলছেন আপনি! ভুল করেছেন আপনি!

ভুল করিনি আমি। ২৯নং! নার্স আবার রেক্‌টামে প্যারালডিহাইড্

দিতে উদ্যত।

আহা করেন কি! করেন কি!

ঠিকই করছি। প্যারালভিহাইড্ নেবার সময় সকলেই ওকথা বলে।

সরোজ সেনের কথায় একটা প্রকাণ্ড হাসির হল্লা ওঠে।

ডাঃ চ্যাটার্জী নাক সিটকে মন্তব্য করেন, যেমন হয়েছে নার্সগুলো। বেশীর ভাগ কোথা থেকে যে সব আমদানি করে, না পারে দুটো নির্ভুল ইংরাজী শব্দ লিখতে, না পারে একটা নির্দেশ ঠিকমত পালন করতে। এমন একটা নোব্‌ল প্রফেশন অথচ শিক্ষিতার দল এদিকে পা দেবেন না। তার উপরে বেশীর ভাগ যা সব চেহারা! সামনে এসে দাঁড়ালে মন বলে পালাই, পালাই। কি সব ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগেল রে আমাদের!

আবার একটা হাসির হল্লা ওঠে।

হঠাৎ এমন সময় বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকে বললে, প্রিন্‌সিপ্যাল সাব ইধার আতা হ্যায়।

মুহূর্তে যেন ঘরের বাতি নিবে গিয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

বাইরে করিডরে মশমশ জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

চেম্বারলীনের মত একটি ছাতা হাতে গলাবন্ধ কোট গায়ে প্রিন্‌সিপ্যাল সাহেব এদিকেই আসছেন সত্যি।

॥ ৬ ॥

দৈনন্দিনের নিয়মিত রুটিন—বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চেম্বার অ্যাটেণ্ড করা।

শৈবাল চেম্বারে বসে রোগী দেখছিল। এক এক করে সর্বশেষে যিনি চেম্বারের সুইং ডোর ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন তাঁর দিকে শৈবাল তাকাল মুখ তুলে।

আগন্তুকের বয়স খুব বেশী নয়, চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশের মধ্যে। মাথায় সুবিন্যস্ত টেরি। পরিধানে দামী কাচির মিহি কালোপাড় ধুতি, গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি। বয়েস যাই হোক, ভদ্রলোকের সমস্ত মুখখানিতে যেন বড় বেশী অত্যাচারে, অকাল-বার্ধক্যের একটা কালো ছোপ পড়েছে।

ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে শৈবাল বললে, বসুন।

সামনের খালি চেয়ারটার ওপরে বসে ভদ্রলোক ডান হাতটা টেবিলের উপরে রাখলেন। শীর্ণ হাতের আঙুলগুলোতে কালো কালো সব দাগ। কিন্তু তারই মধ্যে অনামিকা ও মধ্যমায় দুটি হীরার আংটি জলজল করছে।

আপনার সঙ্গে আমি একটু পরামর্শ করতে চাই ডাক্তারবাবু।

বলুন।

আপনাকে একটা কথা আমার প্রথম থেকেই খুলে বলা ভাল। গত তিন বৎসর ধরে আমি বহু ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি এবং বহু টাকাও খরচ করেছি কিন্তু কোন ফলই পাইনি।

শৈবাল আগন্তুকের কথা চুপ করে শোনে। কোন মন্তব্য করে না। কারণ তার এই বছর তিন চারেকের অভিজ্ঞতাতেই বুঝেছে এবং শুনেছেও, এক ধরনের রোগী আছে যাদের বিভিন্ন ডাক্তারদের দরজায় দরজায় ঠোকর দিয়ে বেড়ানোই একটা অভ্যাস। একজন ডাক্তারের কাছে স্থির হয়ে তাঁর উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বেশীদিন চিকিৎসা করতে পারে না। আজ এর কাছে, কাল ওর কাছে—এই করেই বেড়ায়। সবটাই যে অবিশ্যি রোগীদেরই দোষ তা নয়। এবং সকল ডাক্তাররাও ঐ ব্যাপারে পুরোপুরি নির্দোষ নন। প্রথমতঃ কোন ডাক্তারের চিকিৎসা করাতে গেলে যে তার, অর্থাৎ রোগীর, ডাক্তারের উপর একটা বিশ্বাস রাখতে হয় এবং চিকিৎসার ব্যাপারে একটা ধৈর্য রাখতে হয়, এ তাদের অনেকেরই থাকে নেই। দ্বিতীয়তঃ একদল ডাক্তার আছেন যাঁদের হাতে অন্য কোন ডাক্তার-ফেরতা রোগীএলেই তাঁদের একটা অভ্যাস পূর্ব ডাক্তারটি সম্পর্কে নানারূপ হেয় মন্তব্য করা, অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। মুহূর্তের দুটো পয়সার লোভে তাঁরা নিজে চিকিৎসক হয়েও অন্য একজন তাঁরই সমগোত্রীয়ের মর্যাদাটুকু পর্যন্ত দিতে ভুলে যান। তাঁরা বোঝেন না বোধহয় যে, এতে করে নিজেদের ত তাঁরা ছোট করেনই, নিজের গোষ্ঠীটাকে পর্যন্ত ছোট করছেন, এবং এতে করে আখেরে কোন ফললাভই হয় না। আর একদল আছেন, রোগ বুঝতে পারুন না পারুন, যা নগদা-নগদি পাওয়া যায় গুছিয়ে নেন। কারণ তাঁরা জানেন, ও রোগী দ্বিতীয় দিন আর তাঁর দরজায় আসবে না। কিন্তু এই ধাপ্পা যে বেশীদিন টিকতে পারে না এটা তাঁরা বোঝেন না। আর একদল এত উপরে বসে আছেন যে ভাল করে সময় দিয়ে একজন রোগী দেখবারও যেন পর্যাপ্ত সময় তাঁদের নেই। ফলে এককালের নোব্‌ল প্রফেশন ডাক্তারীটা হয়ে উঠেছে একটা চাল-ডাল-তেলের ব্যবসার মত সাধারণ একটা ব্যবসা। এবং এদের মধ্যে পড়ে ক্রমে রোগীর দল উঠেছে হাঁপিয়ে, বিশ্বাস হারাচ্ছে তারা ডাক্তারদের উপর।

আগন্তুক ভদ্রলোক বলতে থাকেন, আমি ক্লীব কিনা আপনাকে বলে দিতে হবে পরীক্ষা করে ডাক্তার। এবং সত্যই যদি তাই হই, তবে এ রোগ আমার সারবে কিনা বলতে হবে আপনাকে খোলাখুলি।

কিন্তু আপনি যে সত্যিই ক্লীব তা জানলেন কি করে? শৈবাল প্রশ্ন করে।

দেখুন বর্তমানে বয়স আমার আটচল্লিশ বছর। চব্বিশ বছর বয়সের সময় আমি বিবাহ করি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার কোন সন্তানাদি হয়নি। স্ত্রীকে আমার আমি বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি—তার এমন কোন দোষ নাই যার জন্য সন্তান তার হতে পারে না।

তাঁর না থাকলেও, আপনার ত কোন কিছু রোগ থকেতে পারে।

নিশ্চয়ই। রোগ ত আমারই। দেখুন ডাক্তারবাবু, বড়লোকের ছেলে আমি, পয়সার অভাব কোনকালেই আমার ছিল না। প্রথম যৌবনে তাই আপনারা যাকে বলেন স্বেচ্ছাচারিতা, তা যথেষ্ট করেছি।

কোন যৌনব্যাধি কখনো আপনার হয়েছিল?

হয়েছিল তিনবার।

কি?

ডাক্তার বলেছিলেন গনোরিয়া। কিন্তু তার চিকিৎসাও প্রত্যেকবার করিয়েছি।

শৈবাল বুঝতে পারে লোকটা শুধু নির্লজ্জই নয়, পাষণ্ডও। একবারে তার শিক্ষা হয়নি, বারবার তিনবার জেনেশুনে একই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে এবং খুব সম্ভবতঃ প্রত্যেকবার আধা-খেচড়া করে চিকিৎসা করিয়েছে যার ফলে রোগটা আজ ক্রনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং যার অবশ্যম্ভাবী ফলে আজ তাকে চির-জীবনের মতই পিতৃত্ব হারিয়ে দিতে হয়েছে অন্যায়ের খেসারত।

মৃদুকণ্ঠে শৈবাল বলে, আপনার রক্ত ইত্যাদি অনেক কিছু পরীক্ষা না করিয়ে কোন কথাই আপনাকে আমি বলতে পারবো না।

সব কিছু পরীক্ষাই আমি করিয়েছি, একবার নয়, বারবার; এবং সব রেজাল্টই আমার কাছে আছে এই দেখুন। শৈবালের দিকে ভদ্রলোক পকেট থেকে এক তাড়া রিপোর্ট বের করে এগিয়ে টেবিলের উপর দিলেন।

শৈবাল অনেকক্ষণ ধরে রিপোর্টগুলো একটা একটা করে পড়ে, সেগুলো আবার ফেরত দিতে দিতে বললে, স্যরি! আমার দ্বারা কোন কিছু হবে না। আপনি কোন বিশেষজ্ঞের কাছে যান।

না, না—মশাই। আপনাদের ঐ সব বিশেষজ্ঞদের নামে একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে। এক-একজনের এক-এক মত। কেবল বড় বড় কথা, সময় নষ্ট আর টাকার শ্রাদ্ধ। সব যেন জাল পেতে বসে আছেন মাছি ধরবার জন্য।

এসব কি বলছেন! শৈবাল প্রতিবাদ জানায়।

ঠিকই বলছি মশাই, কেন ঘাঁটাচ্ছেন। দুজন বিশেষজ্ঞ কখনো আপনারা

একমত হন ? তাছাড়া যার কাছেই যাবো সে-ই আবার নতুন করে সব পরীক্ষা করাতে বলবে।

শৈবাল জানে যে ক্ষেত্রবিশেষে ওরকম হয়, কিন্তু তাই বলে সেটাই একমাত্র সত্য নয়। তা সে বলবেই বা কি। চুপ করে থাকে।

ভদ্রলোক আবার বলেন, তার চাইতে আপনি, দেখুন যদি পারেন আমাকে রোগমুক্ত করতে।

না। আমার দ্বারা আপনার কোন সাহায্য হবে না। শৈবাল স্পষ্টই বলে।

ভদ্রলোক তখন অগত্যা ফিস রেখে বের হয়ে যান।

রাত প্রায় সাড়ে আটটা হয়ে গেছে, শৈবাল যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই আবার দরজায় নক্ পড়ল, ভিতরে আসতে পারি ?

বিরক্ত চিত্তেই পুনরায় চেয়ারটায় বসতে বসতে শৈবাল বলে, আসুন।

ঘরে এসে ঢুকল প্রথমে ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়সী স্যুট-পরিহিত একটি যুবা পুরুষ ও আঠার-উনিশ বৎসরের একটি সুবেশা আধুনিকা।

বসুন।

উভয়ে বসল।

যুবকটি বললে, এঁর গত দু-তিন মাস ধরেই পিরিয়ডের ট্রাবলস্ চলাছল। গত মাসখানেক থেকে একেবারে বন্ধ।

মুহূর্তে শৈবাল ব্যাপারটি আঁচ করে নেয়। আলোকপ্রাপ্ত আধুনিক সমাজের যে ব্যাধিটি আজকাল হামেশাই দেখা যাচ্ছে, এও তাই।

নার্সকে ডেকে তবু মেয়েটিকে শৈবাল পাশের পরীক্ষা-ঘরে পাঠিয়ে দেয়, আপনি ভিতরে যান।

তরুণী ভিতরে গেল।

একটু পরেই নার্স বললে, ইয়েস ডক্টর রেডি।

টেবিলে শায়িতা তরুণীর সামনে দাঁড়িয়ে শৈবাল প্রশ্ন করে, কতদিন পিরিয়ড আপনার বন্ধ বলুন ত ?

এক মাস।

আগে কখনও অনিয়ম ছিল ?

না।

কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়েই শৈবাল চমকে ওঠে। চার মাসের উপরে অন্তঃস্বত্বা তরুণী !

কিন্তু আমার ত মনে হচ্ছে চার মাস—

টাকার জন্য আপনি ভাববেন না! একটা ব্যবস্থা আপনি করে দিন ডাক্তারবাবু। তরুণী এবারে স্পষ্টাস্পষ্টই বলে।

কেন মিথ্যে ঝুঁকি নিতে যাবেন। তার চাইতে বিয়ে করে ফেলুন।

সম্ভব নয় সেটা।

খুব সম্ভব। এটা সম্ভব হতে পারে আর বিয়েটা সম্ভব হবে না? বেশ একটু রুক্ষ কণ্ঠেই শৈবাল বলে।

সম্ভব নয় ডাক্তারবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন।

তবে আপনি অন্যত্র চেষ্টা করুন আমি এসব করি না।

শৈবাল মিথ্যে বলেনি, অনেক ডাক্তারের একমাত্র আয়ই ঐ ধরনের কেসে।

ডাক্তারবাবু! এ বিপদ থেকে, এ লজ্জা থেকে আমাকে উদ্ধার করুন! মিনতিতে তরুণীর কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ে।

বললাম ত আপনাকে। আমার দ্বারা হবে না।

মনে পড়ে যায় শৈবালের শর্বরীর কথা যেন নতুন করে। না না—সে পারবে না। পারবে না। ইতিপূর্বে অনেকবার সে যা করেছে—করেছে, কিন্তু আর নয়। শর্বরী তাকে শিক্ষা দিয়ে গেছে।

সুইং ডোরটা আবার খুলে গেল নিঃশব্দে।

চোখ তুলে তাকালো শৈবাল সেদিকে।

এ কি শীলা!

বছর একুশ-বাইশের ক্ষীণাঙ্গী এক শ্যামা তরুণী এসে ভিতরে প্রবেশ করলো। সাদা ক্রেপ সিল্কের শাড়ি পরিধানে। মাথার চুল বিনুনীর আকারে বক্ষের দুপাশে লম্বিত।

ওরই এক সহাধ্যায়ী বন্ধু ডাঃ ভূপতি সেনের বোন শীলা।

কি খবর শীলা!

খোঁজ নিতে এলাম আপনার শৈবালদা, আমাদের বাড়ির পথটা ত একেবারে ভুলেই গেছেন।

না, না—ভুলবো কেন?

চার মাস ও পথ মাড়ান না, তা সত্ত্বেও যদি বলেন যে পথটা ভোলেন নি—

সময় পাই না।

খুব প্র্যাকটিস্ আর হাসপাতাল নিয়ে মেতে উঠেছেন বুঝি?

কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন শীলা, বসো—

বসবো ?

বসবে না—

না যাই, আপনি হয়ত এভাবে চেম্বারে আসায় বিরক্ত হচ্ছেন।

না, না—বোস।

শীলা সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো।

তারপর ভূপতির খবর কি ? অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

দাদা তো একটা ঔষধের ফার্মে রিপ্রেজেনটেটিভের চাকরি নিয়েছে।

বল কি। ডাক্তার হয়ে শেষ পর্যন্ত ঔষধের রিপ্রেজেনটেটিভ্ ?

চারশ টাকা পর্যন্ত নাকি মাইনে হবে, দাদা বলেন টিকে থাকতে পারলে—

তা হোক, তবু—

কিন্তু আপনার ব্যাপারটা সত্যি সত্যি কি বলুন ত শৈবালদা। আমাদের কথা একদম ভুলে গেছিলেন, তাই না ?

না, না,—তা কেন—

সেদিন মা আপনার কথা বলছিলেন।

মাসীমা কেমন আছেন ?

ঐ একরকম। লো ব্লাডপ্রেসারের রোগী—

শৈবাল এবারে অন্য কথায় মোড় ঘুরায়, বলে, তোমার গান-বাজনা চলছে কেমন ?

কোথায় আর তেমন হচ্ছে। আর গান-বাজনা করবার সময়ই বা কোথায় বলুন। চাকরি করে দশটা চারটে—

চাকরি। তুমিও চাকরি করছো নাকি !

হ্যাঁ, মনোমোহিনী গার্লস্ স্কুলে একটা চাকরি পেয়ে গেছি—

বি-এ'টা তাহলে দিলে না ?

না। আচ্ছা উঠি এবারে শৈবালদা, এক বান্ধবীর বিয়েতে যাচ্ছিলাম, এই পথ দিয়েই, ভাবলাম নেমে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

শীলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

এখুনি যাবে ?

হ্যাঁ। যাই—

মাসীমাকে বলো, সময় পেলে একদিন যাবো।

প্রত্যুত্তরে কোন কথা না বলে শীলা মৃদু হাসলো মাত্র।

তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ভূপতিদের ওখানে কি একটা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বছর দুয়েক আগে শৈবাল একদিন গিয়েছিল। রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইছিল ঘরের মধ্যে বসে শীলা।

ভারি মিষ্টি গলাটি শীলার। এত ভাল লেগেছিল শৈবালের সেদিন শীলার গলায় তার অত্যন্ত প্রিয় একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত যে প্রশংসা না করে সে পারেনি।

বলেছিল, চমৎকার গলা আপনার—

ভূপতি বাধা দিয়ে বলেছিল, ওকে আবার আপনি কেন শৈবাল! ও আমার অনেক ছোট।

ভূপতির অনুরোধে সেদিন শৈবালকেও খান দুই রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে শোনাতে হয়েছিল।

শীলার সঙ্গে সেই আলাপের সূত্রপাত।

তারপর মধ্যে মধ্যে গিয়েছে যখনই শৈবাল ভূপতিদের ওখানে শীলা ওকে ছাড়েনি, গান গাইতেই হয়েছে তাকে। শর্বরীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর ইদানীং কয়েক মাস আর শৈবাল ভূপতিদের ওখানে যায়নি। শুধু ভূপতিদের ওখানেই বা কেন, ইদানীং কোথায়ও যাওয়াই শৈবাল ছেড়ে দিয়েছে।

ভাল লাগে না, কোথায়ও তার ভাল লাগে না। কেমন যেন একটা মর্মান্তিক শূন্যতা তাকে চারিপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে।

শর্বরী! শর্বরী তাকে যেন একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে গিয়েছে।

তার সমস্ত আনন্দকে যেন একেবারে নিঃস্ব করে শুষে নিয়ে গিয়েছে।

সেদিন বাড়িতে ফিরে শৈবাল একটানা ঘুমোতে পারল না। বার বার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল শর্বরীকে স্বপ্নে দেখে।

শর্বরী! শর্বরী!

॥ ৭ ॥

অবশ্যম্ভাবী মাতৃত্বকে শর্বরী বেশীদিন ডাঃ সাহার মত আত্মভোলা একজন ডাক্তারের কাছ থেকেও চাপা দিয়ে রাখতে পারল না। যে প্রাণপিণ্ড তার দেহের নিভৃত কোটরে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল, তার আবির্ভাবের চিহ্নগুলো ক্রমশই তার দেহের উপর যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। এবং একদিন হাসপাতালে কাজ করতে করতে হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠতেই, চেয়ারে বসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে যেন কেমন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল মুহূর্তে।

হাসপাতালের নার্স মাধবী পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি ডাঃ সাহাকে সংবাদ পাঠাল।

ডাঃ সাহা হন্তদন্ত হয়ে প্রসূতি সদনে ছুটে এলেন এবং শর্বরীকে পরীক্ষা করেই যে সন্দেহটা তাঁর মনের মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে অস্পষ্ট একটা কুয়াশার মত আনাগোনা করছিল, সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

শর্বরী একটু সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে সেদিন আর কাজ করতে দিলেন না ডাঃ সাহা। সোজা একেবারে কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিলেন।

শর্বরী সোজা কোয়ার্টারে গিয়ে একেবারে শয্যায় শুয়ে পড়ল, এবং ঘুমিয়ে পড়লো অসহ্য ক্লান্তিতে। বিকাল পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়ে সন্ধ্যার দিকে উঠে বসল। অনেকটা সুস্থ বোধ করছে তখন সে।

শর্বরী একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে চুপটি করে চোখ বুজে ছিল ঘরের মধ্যেই।

শর্বরী!

কে।

শর্বরী আমি। ঘরে আসতে পারি কি?

আসুন। আসুন—

ডাঃ সাহা ঘরে ঢুকে বললেন, না, না, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি শুয়ে থাক। বলতে বলতে ডাঃ সাহা নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পাশে বসলেন।

কয়েকটা মুহূর্তের পর ডাঃ সাহাই আবার প্রশ্ন করলেন, শরীর তোমার কেমন আছে?

ভাল। মৃদু কণ্ঠে কথাটা বলে মাথা নিচু করলো শর্বরী।

আবার কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত।

একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলাম শর্বরী।

বলুন। মুখ না তুলেই শর্বরী বলে।

বলছিলাম কি তুমি—

আমি জানি ডাঃ সাহা—এই আমার ছয় মাস।

যে কথাটা এতক্ষণ ডাঃ সাহা আসতে আসতে ভাবছিলেন, কেমন করে তিনি ব্যাপারটা শর্বরীর কাছে উত্থাপন করবেন এবং শর্বরীই বা সেটা কিভাবে নেবে। তিনি ভাবতেই পারেননি, তাঁর সমস্ত চিন্তার মীমাংসাটা এত স্পষ্ট ও এত শীঘ্র শর্বরী নিজে থেকেই করে দেবে।

শর্বরীর অকুণ্ঠ ও স্পষ্ট স্বীকৃতি ডাঃ সাহার মত লোককেও মুহূর্তের জন্য যেন স্তব্ধ করে দেয়। বুঝতে পারেন না তিনি এর পর তাঁর কি বলা উচিত এবং তাঁর বক্তব্যই বা কি থাকতে পারে।

অন্ততঃ আপনার কাছে কোন কথাই আমি গোপন করবো না ডাঃ সাহা, —শর্বরীই আবার বলতে শুরু করে ; এবং আপনার কাছে সত্যটা স্পষ্ট না থাকলে আপনাদের প্রতি আমার অশ্রদ্ধাই জানানো হবে।—বলে সংক্ষেপে শর্বরী তার কাহিনী এই সর্বপ্রথম এবং কোন কিছু গোপন না করেই আগাগোড়া ডাঃ সাহাকে বলে গেল।

নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বসে সব শুনলেন ডাঃ সাহা। শর্বরীর বলা শেষ হলে মৃদু কণ্ঠে বললেন, তোমার সত্য বা তোমার নীতি তোমারই থাক। সে সম্পর্কে আমি কোন সমালোচনা বা মতামতই প্রকাশ করতে চাই না শর্বরী। তাছাড়া, কেন জানি না তোমার এই কয় মাসের পরিচয়ে, অন্ততঃ এটা আমি বুঝতে পেরেছি যে, কোন অন্যায়ই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তবু তোমার চাইতে অনেক বেশী বয়স আমার, দেখেছিও আমি অনেক, তাতেই মনে হয় তুমি বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়েছো শর্বরী! সাধারণ মানুষ ও তাদের সমাজ তোমাকে কোন সম্মানই দেবে না। তাছাড়া সবচাইতে বড় যে প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে তোমার অনাগত সন্তান। তোমার নীতিমূলে যদি তাকে তুমি বলি দাও ত তার প্রতি তোমার অবিচারই করা হবে।

কথাটা যে আমিও ভাবিনি তা নয় ডাঃ সাহা ; কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা জিনিসকে আপনাদের সমাজ মেনে নেয়নি বলে যে সেটা অবধারিত সত্যি এবং তার ব্যতিক্রমটাই মিথ্যা, এও ত নয়।

না। অবিশ্যি তা নয়। কিন্তু এও ত তুমি স্বীকার করবে যে, এত বড় একটা ব্যাপার যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, তার ভিতরটা একেবারে মিথ্যা দুর্বল হলে এতদিনে সেটা ভেঙে পড়তোই একদিন না একদিন।

তার জবাবে আমি বলবো, ভেঙে পড়তো কি না পড়তো সেটা কেবল তখনি প্রমাণিত হতে পারতো যদি আপনাদের সে নীতি সত্যি ও মিথ্যার কষ্টিপাথরে কোন দুঃসাহসিকের দ্বারা যাচাই হতো কোনদিন।

না শর্বরী। তোমার কথাটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারলাম না।

কেন?

কারণ সব ব্যাপারে শেষ ও চরম মীমাংসার ঐটাই একমাত্র নিরিখ নয়। তাছাড়া আজ তোমার সত্য দৃষ্টিকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে তোমার অভিমান।

অভিমান!

হ্যাঁ। অভিমান বৈকি। যদিও এও আমি বিশ্বাস করি যে সত্যিকারের

ভালবাসা অভিমানশূন্য নয়, তবু বলবো, সেই অভিমান যদি ভালবাসাকে গ্রাস করবার সুযোগ পায় ত জেনো, সেটা ভালবাসার দুর্বলতারই পরিচয় হবে এবং যার দ্বারা তোমার ঐ ভালবাসাও সত্যিকারের মর্যাদা ত পাবেই না বরং ক্ষুণ্ণই হবে।

কিন্তু আপনি তাঁর কথাটা আদপেই ভাবছেন না ডাঃ সাহা। সে যে—

ঐখানেই ত তুমি ভুল করছো শর্বরী। সে যে পুরুষ! পুরুষ যে চিরদিনই স্বার্থপর! তাদের ধর্ম—ভেঙে ফেলা, কিন্তু নারীর ধর্ম যে গড়ে তোলা! পুরুষ ও নারীর যুগ্ম পরিচয়ে একদিকে যেমন চলে গঠন, অন্যদিকে থাকে তার ভাঙন। কারণ সেটাই স্বাভাবিক এবং সেই কারণেই সহনশীলা হতে হবে নারীকে। ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে নারীকেই, তবেই না তার পাশে দাঁড়িয়ে পুরুষ নব নব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হবে। তাই বলে ভেবো না শর্বরী যে নারী বলে তোমার দিকটা আমি ভাবছি না। কিন্তু সে কথা এখন থাক। বর্তমানে তোমার ভবিষ্যতের কথাটাই আমি বেশী করে ভাবছি। তুমি কি কিছু ভেবেছো?

যেদিন শৈবালের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমার ছিন্ন করে দিয়ে আসি, সেই দিন থেকেই ভবিষ্যতের জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে আছি ডাঃ সাহা।

কিন্তু এখানে তোমার আসন্ন মাতৃত্বের কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে যে প্রতিকূল সমালোচনার ঝড় উঠবে, তাকে তুমি ঠেকিয়ে রাখবে কি করে। আজকের যে মর্যাদার উপরে তুমি প্রতিষ্ঠিত, সে মর্যাদা যদি ভেঙে পড়ে তুমি কোন্ মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াবে শর্বরী?

আপনার আজকে আসবার আগে এতক্ষণ ধরে বসে বসে সেই কথাটাই আমি ভাবছিলাম ডাঃ সাহা। সামনের মাসের গোড়ার দিকেই এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যাবো ঠিক করেছি।

একেবারে চাকরিই ছেড়ে দিয়ে যাবে?

হ্যাঁ। কারণ ছুটি যদি নিয়ে যাই, ছুটির পরে ফিরে এখানে আসবার পর আমাকে ত আবার সেই প্রশ্নেরই সম্মুখীন হতে হবে। সেই মর্যাদা রক্ষারই প্রশ্ন আমার সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

কথাটা যে মিথ্যা তা নয়।

তাই ভাবছিলাম—

হঁ।—

কিছুক্ষণ তারপর দুজনই চুপচাপ।

তার চাইতে এক কাজ করলে ত পার শর্বরী? হঠাৎ ডাঃ সাহা আবার

কথা বললেন।

বলুন।

তোমার সন্তানকে কোন আশ্রমে রেখে—

না। যার স্বীকৃতিকে মেনে নেবার কঠিন প্রতিজ্ঞায় আমি সেদিন পৃথিবীতে আমার সবচাইতে বড় বন্ধু ও আশ্রয় এবং আমার উপরেই একান্ত নির্ভরশীল পঙ্গু বাপকে এবং আমার সন্তানের জন্মদাতা, যাকে আমি ভালবেসে সর্বস্ব দিয়েছি, তার সঙ্গে পর্যন্ত সমস্ত সম্পর্ক অনায়াসেই ছিন্ন করে পশ্চাতে ফেলে চলে এসেছি, আজ যদি তাকেই দূরে সরিয়ে দিই, তবে কি তাকেই আমার ছোট করা হবে না ডাঃ সাহা! তার ন্যায্য মর্যাদাকেই কি আমার ছিনিয়ে নেওয়া হবে না!

কিন্তু শর্বরী—

শর্বরী বাধা দিয়ে বললে, না। আমি অনেকদিন আগেই মনস্থির করেছি, তাকে আমার বুঝিয়ে দিতে হবে তার জন্মের মধ্যে কোন কলঙ্কই ছিল না। এ সংসারে আর দশজনের সন্তানের মতই তার জন্মের ব্যাপারটা সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সে অবাঞ্ছিত নয়, বাঞ্ছিত। কোন পাপই তাকে স্পর্শ করেনি। আমার সন্তান যেন বড় হয়ে জানতে পারে তার মা কলঙ্কিনী নয়। সমাজের চিরাচরিত পবিত্র বেদমন্ত্র, নারায়ণ-শিলা সাক্ষী রেখে তার জন্মের পরিচিতি বা স্বীকৃতি না গড়ে উঠলেও পবিত্র শুদ্ধ প্রেমের মিলনের মধ্যেই তার জন্ম। যে-কোন মন্ত্র, যে কোন স্বীকৃতির চাইতেই সে মিলন ছোট ছিল না। তার মা ও বাবার পরস্পরের গ্রহণ ও আত্মদানের মধ্যে কোন মিথ্যা বা ফাঁকিই ছিল না।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন ডাঃ সাহা শর্বরীর মুখের দিকে। এই বয়সে তিনি অনেক মেয়েই ত দেখেছেন, কিন্তু কই এমন দ্বিতীয়টি দেখেছেন বলে ত মনে পড়ে না। এবং দুঃখ হয় তাঁর এই ভেবে যে, এর মত মেয়েকেও হয়ত দুঃখ সইতে হবে। আর সত্যিই হতভাগ্য সেই শৈবাল! যে একে পেয়েও হারিয়েছে।

প্রথম দিন থেকেই এই মেয়েটিকে ডাঃ সাহা অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখেছিলেন এবং সেই স্নেহ গত কয় মাসের শর্বরীর নিত্য সাহচর্যে আরো যেন নিবিড় হয়ে উঠেছিল। যদি পারতেন তিনি ওকে সমস্ত কিছু থেকে আড়াল করে রাখতেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে তা ত সম্ভব নয়।

তবু জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় তুমি যাবে কিছু ঠিক করেছো শর্বরী?

না। এখনো কিছুই ঠিক করিনি। শর্বরী মৃদু শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল।

তোমার যদি আপত্তি না থাকে ত রাঁচিতে আমার একটা বাড়ি আছে, তুমি সেখানে গিয়ে একটা মাস থাকতে পারো।

বাঁচিতে।

হ্যাঁ, এখানকার কাজ থেকে আর বছর পাঁচ-ছয় বাদে অবসর নিয়ে আমার ইচ্ছা নিরিবিলিতে একা একা কাটাবো; তাই বছর তিনেক আগে মোরাবাদী হিলের কাছাকাছি জায়গায় নির্জনে একটা বাংলো তৈরি করে রেখেছি। একটা চাকর আর একটা মালী সেখানে আছে। তারাই বাড়িটা দেখাশোনা করে। তুমি ইচ্ছা করলে অনায়াসেই সেখানে একটা মাস কাটাতে পারো শর্বরী। চাও ত আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

কারো কোন রকম সাহায্য নেওয়া শর্বরীর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ভেবে দেখলে ডাঃ সাহার প্রস্তাবটা নেহাৎ মন্দ নয়। তাই বললে, ভেবে আপনাকে আমি পরে জানাব ডাঃ সাহা।

বেশ। তাই জানিও। আমি তাহ'লে এবার উঠি। ডাঃ সাহা উঠে দাঁড়ালেন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ ভাল কথা, এ কটা দিন আর তুমি হাসপাতালে যেও না শর্বরী। বিশ্রাম নাও। তোমার ওদিককার হাসপাতালের কাজ কটা দিন আমিই চালিয়ে নেব।

না, না—আপনাকে ব্যস্ত হতে দেব না ডাঃ সাহা। যে কদিন আছি, আমি কাজ করতে পারবো।

না। দুটো দিন রেস্ট্ নাও।

ডাঃ সাহা বের হয়ে গেলেন।

কিন্তু কথাটা চাপা রইলো না।

॥ ৮ ॥

হাসপাতালের নার্স মাধবীই কথাটা চাউর করে দিল সর্বত্র। এখানকার হাসপাতালে এতদিনকার কায়েমী আসনটা শর্বরীর আকস্মিক আবির্ভাবে নার্স মাধবীকে একেবারেই হারাতে হয়েছিল। এবং সবচাইতে বড় কথা নিজে স্ত্রীলোক হয়ে অন্য-একজন স্ত্রীলোককে তার সব কিছু প্রতিপত্তি ও শক্তি ছেড়ে দিতে হয়েছিল, এটা কিছুতেই যেন সে মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু শর্বরী তার থেকে সব কিছুতে অনেক উর্ধ্বে, বলতে গেলে তার নাগালের বাইরে; তাই সব কিছু নির্বিবাদে সয়ে যাওয়া ছাড়া মাধবীর আর দ্বিতীয় কোন পথও ছিল না। এবং সর্বোপরি যেটা তাকে সত্যিকারের আঘাত দিয়েছিল সেটা হচ্ছে শর্বরীর নির্মল ত্রুটিশূন্য চরিত্রের পাশে তার নিজের উচ্ছৃঙ্খল নষ্টচরিত্র, মূলত যে মূলধনের উপরে সে এতকাল এখানে প্রতিপত্তি নিয়ে কায়েমী হয়ে বসেছিল।

অন্যোপায় হয়ে নিরন্তর তাই সে রুদ্ধবিষ সর্পের মত ভিতরে ভিতরে গর্জাচ্ছিল মাথা নিচু করে। আজ তাই কুমারী শর্বরীর আসন্ন মাতৃত্বের মুখরোচক সংবাদটায় সে যেন হাতে স্বর্গ পেল। এতদিনে সে শর্বরীর মৃত্যুবাণের সন্ধান পেয়েছে। এ সুবর্ণ সুযোগ কি সে হারাতে পারে, না বৃথা যেতে দিতে পারে! সমস্ত উদ্যমে এবারে তাই মাধবী শর্বরীর অনিষ্টসাধনে বদ্ধপরিকর হলো। অথচ একটিবারও সে ভেবে দেখল না যে নিজে নারী হয়ে অন্য নারীর কত বড় অনিষ্টসাধনে সে এগিয়ে চলেছে।

এমনি হয়। একজন নারী অন্য একজন নারী এবং একজন পুরুষ অন্য এক পুরুষের যতটা অনিষ্ট সাধন করতে পারে, একজন নারী অপর একজন পুরুষের বা একজন পুরুষ অপর একজন নারীর বোধ হয় ততটা অনিষ্ট বা ক্ষতি করতে পারে না।

দিন তিনেক মাত্র শর্বরী হাসপাতালে যায়নি, কিন্তু ঐ সামান্য সময়ের মধ্যেই শর্বরীর আসন্ন মাতৃত্বের কথাটা যে কারোর আর জানতে বাকী নেই, সেদিন হাসপাতালে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শর্বরীর বুঝতে বাকী রইলো না।

হাসপাতালের জমাদার, মেথরাণী, ওয়ার্ড-বয়, এমন কি রোগীদের মধ্যে কেউ কেউ শর্বরীর দিকে আড়চোখে ঘন ঘন তাকাতে লাগল। চোখে তাদের চাপা ইঙ্গিতটা আর অস্পষ্ট থাকে না। শর্বরী যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। যতবারই সে কিছু নয় বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, ততবারই মনে হয় একটা বিশ্রী কুৎসিত প্রশ্ন যেন তার চারপাশে কেবলই প্রত্যেকের নীরব চাউনির মধ্যে দিয়ে তাকে অদৃশ্য একটা কাঁটার মত বিঁধছে।

কাজের মধ্যে কিছুতেই মন বসাতে পারল না শর্বরী। বার বার কাজের মধ্যে ভুলত্রুটি হতে লাগল। শর্বরী এসে হাসপাতালে তার নিজের বসবার ঘরে বসল।

নার্স মাধবী বরাবরই তাকে এড়িয়ে গিয়েছে এ কয় মাস। শর্বরী নিজে না ডাকলে তার সামনে বড় একটা আসতে সাহস পেত না। কিন্তু হঠাৎ আজ পদশব্দে মুখ তুলে দেখে শর্বরী। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মাধবী।

শরীরটা কি আপনার খারাপ লাগছে আবার? মাধবী প্রশ্ন করে।

না।

অবশ্য শরীরে এ সময় খারাপ হওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে শর্বরী বলে, পাঁচ নম্বর বেডের পেসেন্টর বাওয়েল ওয়াসের ব্যবস্থা করুন গে।

হ্যাঁ যাচ্ছি—

হ্যাঁ—ওয়ার্ডে যান। তিন নম্বর বেডের রোগিণীর লেবার পেন উঠেছে: সেদিকেও নজর রাখুন।......

নার্স মাধবী চলে গেল, কিন্তু শর্বরী স্পষ্ট দেখল তার মুখখানা চাপা হাসিতে ভরে রয়েছে।

বেলা তিনটে নাগাদ তিন নম্বর বেডের ডেলিভারী করিয়ে শর্বরী তার কোয়ার্টারে ফিরে এলো। পথে আসতে আসতেই শর্বরী ভাবছিল, মাসের শেষ পর্যন্ত যে সে এখানে থাকবে ভেবেছিল তা আর হয়ত থাকা হবে না।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছিল।

এসেই শয্যার উপরে গা ঢেলে দিল শর্বরী।

মুনিয়া এসে জিজ্ঞাসা করল, মা কিছু খাবি না?

না। তুই এক কাপ শুধু চা তৈরী করে দে

শুধু চা! আর কিছু খাবি না?

না। রাত্রে যা হয় কিছু খাবো।

সন্ধ্যার দিকে শর্বরী নিজের শয়নঘরের মধ্যেই আরামকেদারাটার উপরে চোখ বুজে শুয়েছিল। বোধ হয় একটু ক্লান্তিতে তন্দ্রামতও এসেছিল। হঠাৎ তন্দ্রাটা ছুটে গেল একটা জুতোর মশমশ শব্দে।

মুনিয়া কখন ঘরে আলো জেলে দিয়ে গেছে শর্বরী টেরও পায়নি।

চোখ মেলে ঘরের আলোতে তাকাতেই ধড়মড় করে উঠে বসল সোজা হয়ে শর্বরী। বিস্ময়ে সে যেন একেবারে বোবা নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল।

সামনেই দাঁড়িয়ে রণধীর মুখার্জী; ছোট সাহেব।

একি! আপনি—

হ্যাঁ। শুনলাম আপনার শরীরটা নাকি খারাপ। তাই খোঁজ নিতে এলাম মিস্ রায়। রণধীরের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র একটা অ্যালকহলের গন্ধ যেন ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

ঘটনার আকস্মিক বিহ্বলতাটা কেটে গিয়ে শর্বরী ততক্ষণে সহজ ধৈর্যে ফিরে এসেছে। রাগে অপমানে সর্বশরীর তখন তার যেন কাঁপছে। উঃ কি অভদ্র, কী দুঃসাহস লোকটার! নিদ্রার অবসরে গাত্রবস্ত্রটা সামান্য শিথিল হয়ে গিয়েছিল, সেটা সংযত করে নিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে এবারে শর্বরী বললে, আপনি যে

এতদূর অভদ্র আমার জানা ছিল না মিঃ মুখার্জী। নিদ্রিতা একজন নারীর নিভৃত বিশ্রাম-কক্ষে যে সাড়া দিয়ে ঢুকতে হয়—তার অনুমতি নিতে হয়, তাও কি আপনাকে কেউ শিক্ষা দেয়নি ?

ব্যাপার কি! অত খাপ্পা কেন ? মৃদু ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে কথাটা বলতে বলতে আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় রণধীর।

চকিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শর্বরী। তারপর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, যান! এখুনি আমার ঘর থেকে বের হয়ে যান!

কিন্তু মিস্ রায় ভুলে যাচ্ছেন যে, এটা আমারই বাড়ি। হঠাৎ যেন রূপ পাল্টালো রণধীর মুখার্জীর।

হ্যাঁ। সে আমি জানি। কিন্তু যতক্ষণ এ বাড়ি আমার দখলে আছে ততক্ষণ এ বাড়ি আমার। যান এক্ষুনি বেরিয়ে যান।

কিন্তু অত সতীপনাই বা কেন। আপনার গুণের কথা জানতে ত আর কারো বাকী নেই। আপনি যে কত বড় সতী—

কথাটা রণধীরের শেষ হলো না। সামনেই ত্রিপয়ের উপরে সন্ধ্যার মুখে চা পানের পর শূন্য কাপটা তখন পড়েছিল। চক্ষের নিমেষে সেই শূন্য কাপটা তুলে নিয়ে শর্বরী রণধীরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। ঠং করে একটা শব্দ করে পেয়ালাটা মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'উঃ' বলে একটা আর্ত চাপা শব্দ করে রণধীর তার কপালের বাম পাশটা হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। ঘরের আলোয় শর্বরী দেখল, রণধীরের হাত বেয়ে একটা লাল রক্তের ধারা নেমে এসেছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মুনিয়া বোধ হয় বাজারে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরে দরজার গোড়ায় এসে ডাকল, মা!

শর্বরীর হাতে আঘাত খেয়ে কঠিন একটা গালাগালি রণধীরের কণ্ঠ দিয়ে বের হয়ে আসছিল; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার সামনে মুনিয়াকে দেখে কি জানি কেন নিজেকে অদ্ভুত মানসিক বলে সামলে নিয়ে, দ্বিতীয়বার বাক্যব্যয় না করে টলতে টলতে রণধীর কক্ষ হতে বের হয়ে গেলেন, হতভম্ব মুনিয়াকে একপ্রকার ঠেলেই তার পাশ ঘেঁষে।

ঘরের দোর পর্যন্ত এগিয়ে এসে 'মা' বলে ডাকবার পরও প্রথমটায় মুনিয়া রণধীরকে ঘরের মধ্যে দেখলেও বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। কিন্তু তারপরই রণধীর যখন তার পাশ ঘেঁষে বের হয়ে যায়, তখন তাকে চিনতে পেরেছিল মুনিয়া।

প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত ঘরের বাইরে হতভম্ব মুনিয়া এবং ঘরের মধ্যে

দণ্ডায়মান নির্বাক স্থাণুর মত শর্বরী—কারো মুখ দিয়েই কোন কথা বের হয় না। সমগ্র ব্যাপারটা এত দ্রুত, মুহূর্ত মধ্যে ঘটে যাওয়ায় শর্বরী নিজে যেমন নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল, তেমনি ঘটনার কিছুই না বুঝতে পারায় মুনিয়াও যেন হয়ে গিয়েছিল নির্বাক নিস্পন্দ। ছোট সাহেব যে কখন এসেছিল এবং ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সময় কেন যে তার হাত বেয়ে রক্ত পড়ছিল, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না মুনিয়া।

ধীরে ধীরে একসময় সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আবার ডাকল, মা!

হ্যাঁ! চমকে মুখ তুলে তাকাল শর্বরী।

মা, উনুনে কি আগুন ধরিয়ে দেবো?

না।

এবেলাও কিছু খাবি না?

না।

মুনিয়া ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। শর্বরী যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ডাকল, মুনিয়া।

আমাকে ডাকছিস?

হ্যাঁ। একবার বুড়ো ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে পারিস?

ডাক্তারবাবুকে!

হ্যাঁ। বলবি এখুনি একবার আসতে, বড্ড দরকার।

যাচ্ছি।

মুনিয়া ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মাথাটার মধ্যে কেমন যেন ঝিমঝিম করছিল। শরীরটাও যেন কেমন একেবারে অবশ হয়ে আসে। শর্বরী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আরাম-কেদারাটার উপরে বসে পড়ল।

ঘটনা অনেক দূরে গড়িয়েছে।

একটা দিন ত দূরের কথা, আর একটা মুহূর্তও এখানে থাকা চলবে না। অন্য কোন মেয়ে হলে হয়ত এতক্ষণে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিত, কিন্তু শর্বরীর চোখে একবিন্দু অশ্রুও ছিল না। তাকে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে হবে, কেবল এই কথাটাই শর্বরী ভাবছিল। এবং যাবার জন্য এখুনি তাকে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে, সময় নেই আর।

সমস্ত ক্লান্তি সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে শর্বরী উঠে দাঁড়াল।

গোছগাছ করবার এমন বিশেষ কিছু নেই। যে সুটকেস্‌টা নিয়ে চার মাস

আগে এক রাত্রে সে এখানে এসে অনিশ্চিতের মধ্যে উঠেছিল, সেই স্যুটকেসটার মধ্যেই অতি দ্রুত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যা কিছু গুছিয়ে নিতে লাগল শর্বরী ক্ষিপ্র কম্পিত হস্তে।

সংসারের প্রয়োজনে এখানে আসবাবপত্র গত চার মাসে অনেক কিছুই করেছিল শর্বরী। ছোটখাটো নানা জিনিসপত্র। তখন হয়ত একবারও মনে হয়নি যে এত তাড়াতাড়ি এখান থেকে আবার তার চলে যাবার সময়টি আসবে। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকে চলে যাবার কথা মধ্যে মধ্যে তার মনে হলেও খুব বেশী হয়নি। যতটা গত পাঁচ দিন থেকে সর্বদা তার সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ডাঃ সাহার সঙ্গে চার দিন আগে সে রাত্রে কথা বলবার সময়ও তার মনে হয়নি যে, যাবার মুহূর্তটি তার এত কাছে একেবারে ঘনিয়ে এসেছে।

মুনিয়া কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে জানাল ডাঃ সাহা বাসায় নেই। একটা জরুরী কাজে বাইরে গিয়েছেন। কখন আসবেন কিছুই ঠিক নেই। তবে মুনিয়া তার চাকরকে বলে এসেছে তিনি ফিরে আসা মাত্রই যেন মেমসাহেবের বাংলোতে একবার আসেন। জরুরী দরকার।

পরিধেয় শাড়িটা পর্যন্ত বদলালো না শর্বরী। কেবল কোনমতে অতি আবশ্যকীয় জিনিসপত্র যা নেবার স্যুটকেসের মধ্যে ভরে, স্যুটকেসের ডালাটা বন্ধ করে বাইরে বারান্দায় এনে নামিয়ে রাখল এবং মুনিয়াকে দিয়ে চেয়ারটা বাইরে আনিয়ে তার উপরে বসে রইলো।

মুনিয়া দু-চারবার বলেছিল শর্বরীকে রান্না করবার কথা, খাওয়ার কথা। কিন্তু কোন সাড়াই পায়নি। সেই যে তখন থেকে পায়ের কাছে স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখে আরামকেদারাটায় বসেছে শর্বরী, তা বসেই আছে। সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত শরীর যেন জমে পাথর হয়ে গিয়েছে।

মুনিয়াও বাড়ি ফিরে যায়নি।

রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে একসময় সেও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

বৈশাখের শেষ।

সারাটা দিন অসহ্য গুমোট একটা গরম গিয়েছে। কিছুক্ষণ থেকে পশ্চিমাকাশে একটা মেঘের ছায়া ধীরে ধীরে যেন জমে উঠছে। ত্রয়োদশীর বাঁকা চাঁদ দেখা দিয়েছে। একটা মেটে মেটে জ্যোৎস্না বিছিয়ে দিয়েছে যেন ধূসর চাদর একখানি আকাশ ও ধরিত্রীতে। দূর থেকে ভেসে আসছে কুলী ধাওড়া থেকে মাদলের ধিতাং ধিতাং শব্দ। তার সঙ্গে বাঁশের বাঁশীতে সাঁওতালি সুর।

॥ ৯ ॥

রাত তখন প্রায় দশটা হবে।

একটা ছায়ামূর্তি সামনের উঠানে এসে দাঁড়াল নিঃশব্দে। ডাঃ সাহা। কল থেকে ফিরে বাসায় এসেই ভৃত্যের মুখে সংবাদটা পেয়ে ডাক্তার সাহা সোজা একেবারে শর্বরীর বাসায় চলে এসেছেন কতকটা বিস্মিত ও ব্যস্ত হয়েই।

বাইরের বারান্দার এক কোণে লণ্ঠনটা জ্বলছে মিটমিট করে। সমস্ত বারান্দায় একটা আলোছায়ার আবছা রহস্য। গালে হাত দিয়ে স্তব্ধ পাষাণ-মূর্তির মত চেয়ারের উপর বসে শর্বরী। পায়ের কাছে তার স্যুটকেসটা।

ডাঃ সাহা ডাকলেন, শর্বরী!

প্রথম ডাকে সাড়া পাওয়া গেল না, কিন্তু দ্বিতীয়বার ডাঃ সাহার অনুচ্চ কণ্ঠের ডাকে চমকে, যেন মুখ তুলে তাকাতেই শর্বরী দেখতে পেল, সামনেই দাঁড়িয়ে ডাঃ সাহা।

ডাক্তার সাহা! আসুন। আপনার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। শর্বরী উঠে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার শর্বরী?

বাড়িতে ঢুকেই শর্বরীর ধ্যানমগ্ন বসবার ভঙ্গীটি এবং প্রথম ডাকে সাড়া না পাওয়া ও দ্বিতীয় ডাকে চমকে উঠে দাঁড়নো—দেখে ডাঃ সাহা বুঝলেন ব্যাপার একটা কিছু ঘটেছে।

শর্বরী চেয়ার ছেড়ে নিজে উঠে দাঁড়াল বটে কিন্তু ডাঃ সাহাকে বসতে পর্যন্ত একবার বললে না। এবং ডাঃ সাহা দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করবার আগেই বললে, আমি আজই এখান থেকে চলে যাবো ডাঃ সাহা।

আজই! এই রাত্রে! কি বলছো তুমি শর্বরী!

হ্যাঁ, রাত সাড়ে বারোটায় যে মেল ট্রেনটা জংশনে পৌঁছায়, সেটাতেই যাবো। আপনার গাড়িতে করে আমাকে কেবল স্টেশনে পৌঁছাবার একটা ব্যবস্থা করে দিন ডাঃ সাহা।

কি হয়েছে শর্বরী! বোস! বোস—সব আমাকে শুনতে দাও।

কি আর শুনবেন। আমাকে আজই যেতে হবে।

সেইটাই ত জিজ্ঞাসা করছি। হঠাৎ আজ রাত্রেই বা তোমাকে যেতে হচ্ছে কেন?

বললাম ত আপনাকে যেতেই হবে আমাকে। অন্য উপায় না থাকলে হেঁটেই আমাকে যেতে হবে। এর চাইতে বেশী কিছু অনুগ্রহ করে আমাকে আপনি আর এখন জিজ্ঞাসা করবেন না। আমিও বলতে পারবো না।

ডাঃ সাহা ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, বেশ। তাহলে রেডি হয়ে নাও।

আমি রেডি ডাঃ সাহা।

সে কি! তোমার জিনিসপত্র।

কিছুর দরকার নেই। এখানকার সব এখানেই থাক।

এসব কিছুই নেবে না?

না।

বেশ। তবে চলো। বাইরেই আমার গাড়ি রয়েছে।

শর্বরীর যেন আর একটা মুহূর্তও দেরি সইছিল না। সঙ্গে সঙ্গে সে নিচু হয়ে স্যুটকেসটা তুলতে যেতেই ডাঃ সাহা বললেন, ওটা আমিই নিচ্ছি। বলে নিজের হাতেই স্যুটকেসটা তুলে নিলেন।

দু পা এগিয়েই শর্বরী দাড়ালো। ডাকলো, মুনিয়া! এই মুনিয়া!

মনিবের ডাকে ঘুম ভেঙে চমকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এলো মুনিয়া, কি বলছিস্ মা?

শর্বরী তার হ্যাণ্ড-ব্যাগ থেকে দশ টাকার দুখানা নোট বের করে মুনিয়ার হাতে দিতে দিতে বললে, এটা রাখ্ মুনিয়া। আমি চললাম।

কুথায় যাচ্ছিস্ মা?

এখান থেকে চলে যাচ্ছি রে।

চলে যাচ্ছিস্? আবার কবে ফিরবি?

আর ফিরব না রে।

ফিরবি না? কেন রে?

না মুনিয়া। আর ফিরব না। ঘরের মধ্যে আমার জিনিসপত্র রইলো, তুই নিস। বলে নোট দুটো মুনিয়ার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে পা বাড়াল শর্বরী, চলুন ডাঃ সাহা।

একবারও আর পেছন ফিরে তাকাল না শর্বরী। সোজা দরজার দিকে এগিয়ে চললো। পশ্চাতে আবছা জোছনায় ছায়ামূর্তির মত নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো মুনিয়া।

ডাঃ সাহার পুরনো মডেলের অস্টিন গাড়িটা শর্বরীর বাংলোর বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। স্যুটকেসটা পিছনের সীটে রেখে প্রথমে ডাঃ সাহা ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলেন। তাঁর পাশের সীটে উঠে বসল শর্বরী। ডাঃ সাহা সুইচ টিপে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। গাড়ির ইঞ্জিন গর্জন করে উঠলো।

আজ রাত্রেই তোমাকে যেতে হবে শর্বরী। রাতটা থেকে কাল গেলে হতো না?

না। রাত্রেই যেমন করে হোক, ট্রেন আমাকে ধরতেই হবে। শান্ত মৃদু কণ্ঠে শর্বরী বললে।

ডাঃ সাহা আর দ্বিতীয় কোন বাক্যব্যয় করলেন না। ক্লাচ ছেড়ে এ্যাকসলা-রেটারে পায়ের চাপ দিলেন।

গাড়ি ছুটলো।

রাত্রের মেল ট্রেন ধরতে হলে এখন একেবারে সোজা জংশনেই যেতে হবে। বেশী পথ অবিশ্যি নয়। মাইল কুড়িক।

ঘণ্টা দেড়েকেই পৌঁছে যাওয়া যাবে।

স্থানীয় পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ডাঃ সাহা বড় সড়ক ধরলেন, যেটা সোজা বরাবর ধানবাদ জংশনের দিকেই চলে গিয়েছে।

বাঁধানো সড়ক কিন্তু যানচলাচল বিশেষ করে এত রাত্রে বড় একটা দেখা যায় না। হেডলাইটের জোরালো আলো ফেলে ডাঃ সাহার গাড়ি জংশন স্টেশনের দিকে ছুটে চলছে। স্পিডোমিটারের কাঁটা থর থর করে কাঁপছে ৪০-৪৫-এর ঘরে।

কারো মুখে কোন কথা নেই।

ডাঃ সাহার সমস্ত দৃষ্টি আঁকাবাঁকা সড়কটার উপরে নিবদ্ধ, যত দূর গিয়েছে হেডলাইটের আলো ছড়িয়ে। আর তাঁর পাশে বসে শর্বরী। যেন পাথরের মতই নিস্পন্দ, জমাট।

সমস্ত দিনের অনাহার ও মানসিক ক্লান্তিতে চোখের পাতা জুড়ে ঘুম নেমে আসতে চায় বুঝি তার। দীর্ঘ চার মাস আগে মৌসুদির বাড়ি থেকে সে বের হয়েছিল এক নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে, আজ আবার চলেছে সে আর এক কোন অনিশ্চিত নতুন আশ্রয়ে। এমনি করেই কি সে আশ্রয় থেকে আশ্রয়ে, জীবনের পথে পথে তাঁবু ফেলে বেড়াবে। ঘর কি তার কোনদিনই বাঁধা হবে না। কখনও কি সে পাবে না তার নিজস্ব গৃহকোণটি খুঁজে, যে গৃহে থাকবে শান্তি, আরাম ও বিশ্রাম! কলেজের ছাত্রজীবনে শৈবাল যেদিন প্রথম তার নারী-চেতনায় সাড়া জাগিয়েছিল, যেদিন সে প্রথম বুঝতে পেরেছিল সেও একজন নারী এবং তার ব্যস্তমুখর কর্মজগতের বাইরে সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে আছে তার অন্তরের নিভৃততর প্রদেশে এক সৃষ্টিপিয়াসী চিরন্তনী নারীমন—যে

ঘর চায়, চায় স্বামী, স্বামীর ভালবাসা—চায় তারই দেওয়া সন্তান, সেদিন কি নিবিড় স্নেহেই না শৈবালকে আপনার করে বুকের মাঝখানটিতে টেনে নিয়েছিল সে। এবং সেদিন কি সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেরেছিল কপালে তার ঘরবাঁধা নেই! ভাগ্যদেবতার নির্মম পরিহাস তার জন্য অপেক্ষা করছে! বুঝতে কি পেরেছিল সে, তার কল্পনার বাসরঘরের ভিতটা এত পলকা, শুধু ধ্বসে পড়বার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু কেন? কেন সে পেয়েও কিছু পেল না?

ডাঃ সাহার সেদিনকার কথাটা হঠাৎ মনে পড়লো শর্বরীর। ডাঃ সাহা বলেছিলেন, আজ তোমার সত্যদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তোমার অভিমান।

অভিমান! সত্যিই কি তাই। সত্যিই কি অভিমানে দৃষ্টি তার আজ আচ্ছন্ন! না, না—ভুল। অভিমান। কার উপরে তার অভিমান! আর কেনই বা অভিমান! শৈবালের উপর অভিমান? কিন্তু কোন্ লজ্জায়ই বা তার উপরে সে অভিমান করতে যাবে? যার কাছে সামাজিক বা লৌকিক পজিশনটাই হলো বড়, ভালবাসাটা হয়ে গেল মিথ্যে, তার প্রতি অভিমান সে কোন্ লজ্জায়ই বা করতে যাবে। তাছাড়া অভিমান করে যদি সে একটা ভুল করে এসেই থাকে শৈবাল ত তার সে ভুল এতদিনে ভেঙে দিতে পারতো। ঠিকানা না হয় সে কাউকে নাই দিয়ে এসেছে। পুরুষ শৈবালের পক্ষে কি তাকে এই চার মাস সময়ের মধ্যে খুঁজে বার করা এতই দুঃসাধ্য হতো! ইচ্ছা থাকলে কি সে তাকে এই চার মাসের মধ্যে খুঁজে বের করতে পারতো না!

স্বার্থপর! স্বার্থপর পুরুষ!

হ্যাঁ, সে-ই যদি তাকে ভুলতে পেরে থাকে ত সে নিজেই বা কেন তাকে ভুলতে পারবে না। কেন সে নিজের দৈন্য নিয়ে উপযাচিকার মত তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে!

না, না—থাক। শৈবাল দূরেই থাক। চায় না শর্বরী তার স্বীকৃতি।

হঠাৎ ডাঃ সাহার প্রশ্নে শর্বরীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবে কিছুই ত ঠিক কর নি তুমি শর্বরী। এ অবস্থায় আমার মনে হয় এ কটা মাস তুমি আমার রাঁচির বাড়িতে গিয়েই থাকো। কি বল শর্বরী?

কি জানি কেন লোকটির এই কয়মাসের স্নেহের পরিচয়ে আর তাঁর অনুরোধে শর্বরী না বলতে পারলো না। বললে মৃদু কণ্ঠে, তাই যাবো।

সহসা শর্বরীর সম্মতিতে ডাক্তার যেন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলেন। শিশুর মত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন, হ্যাঁ মা, তাই যাও। দেখবে

খুব ভাল লাগবে জায়গাটা তোমার। তাছাড়া দেখো কোন অসুবিধাই তোমার সেখানে হবে না। একজন মালী আর একজন চাকর আছে। নন্দুয়া আমার অনেকদিনকার পরিচিত—বয়েস হয়েছে বটে একটু লোকটার। কিন্তু যেমন বিশ্বাসী তেমনি সরল ও সাহসী।

এতক্ষণের গুমোট ভাবটা যেন ডাক্তারের উৎসাহের তোড়ে ভেসে যায়।

অন্ধকার নির্জন সড়ক ধরে গাড়ি ছুটে চলেছে। দুপাশে অন্ধকার, ঝোপে ঝোপে জোনাকির বাতি অভিসার।

শর্বরীর মনে হয় যেন এই অন্ধকারের মধ্যেই সে হারিয়ে গিয়েছে।

ডাঃ সাহা তখনও বলে চলেছেন উৎসাহভরে, তুমি ডাক্তার। প্রচুর তোমার অভিজ্ঞতাও আছে এসব ব্যাপারে। তোমাকে কোন উপদেশ দেওয়া বাহুল্য, তবু বলি খুব সাবধানে থাকবে এ সময়টা। খুব বেশী পরিশ্রম করো না। আর চিন্তাও করো না।

স্নেহময় পিতা যেমন কন্যাকে উপদেশ দেন, ঠিক তেমনি করেই ডাঃ সাহা উৎসাহের সঙ্গে নানা উপদেশ দিতে লাগলেন শর্বরীকে। কেন জানি শর্বরীর দু চোখ ভরে জল এসে যায়। নিরন্তর স্নেহের বর্ম দিয়ে বাপ তাকে যেমন ঢেকে রাখতেন। পঙ্গু অসহায় ইনভ্যালিড্ চেয়ারে বা বিছানায় সর্বদা পড়ে থাকতেন, তবু মনে হতো তাঁর চোখ দুজোড়া যেন শর্বরীকে ঘিরেই সর্বদা সজাগ হয়ে রয়েছে; প্রত্যেকটি ব্যাপারে, তা যত তুচ্ছই হোক না কেন তাঁর স্নেহসিক্ত সতর্কতা, তাঁর উদ্বেগ যেন শর্বরীর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরত। কখনো ফিরতে দেরি হলে উদ্বেগের তাঁর অন্ত থাকত না। কত সময় শর্বরীই বিরক্ত হয়েছে। বলেছে, অত ভাবেন কেন বলুন ত বাবা। আজও কি কচি খুকীটি আছি নাকি আমি! হেসে বাবা বলতেন, সন্তানের জন্য মা-বাপের যে কত ব্যাকুলতা, কত উদ্বেগ এখন তা বুঝবি না মা। সন্তান হলে তখন মায়ের মন নিয়ে বুঝবি। সেই বাপকে আজ চার মাস হয়ে গেল চোখের দেখা পর্যন্ত দেখে না শর্বরী। তাঁর সেই কণ্ঠস্বরটুকু পর্যন্ত শুনতে পায় না। সেই হারানো স্নেহকেই যেন অনুভব করে শর্বরী ডাঃ সাহার মধ্যে দিয়ে। অন্ধকারে নিঃশব্দে তার দু চোখের কোল বেয়ে অনেকদিন পরে আজ অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার বক্ষোবাস সিক্ত করে দেয়।

দূরে অন্ধকারে জংশন স্টেশন ইয়ার্ডের লাল নীল আলোগুলো দেখা যায়। গন্তব্যস্থান প্রায় এসে গেল।

ডাকগাড়ি স্টেশনে আসবার প্রায় মিনিট পনের-কুড়ি আগেই ডাঃ সাহা জংশনে পৌঁছে গেলেন। আসানসোল পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে গাড়ি বদল

করে শর্বরী রাঁচি যাবে।

ডাঃ সাহা নিজেই শর্বরীকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে টিকিট কাটতে গেলেন।

শর্বরী টিকিটের টাকার কথাটা একবার উত্থাপন করেছিল কিন্তু ডাঃ সাহা তাকে একটা মৃদু তিরস্কার করে বললেন, ডোণ্ট বি নটি, মাই চাইল্ড্।

একটা খালি প্রথম শ্রেণীর কামরা মিলে গেল।

শর্বরীকে সেই কামরাতেই তুলে দিলেন ডাঃ সাহা। প্ল্যাটফরমের দিকে খোলা জানালার সামনে বসেছিল শর্বরী।

ডাঃ সাহা প্ল্যাটফরমের উপরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সময় পেলেই আমাকে চিঠি দিও কিন্তু মা।

দেবো।

আর শোন, একটা কথা তোমাকে বলি, তোমার যদি ছেলে হয় ত তার নামটা আমি রাখবো।

সহসা শর্বরীর লজ্জায় কপোল ও কপাল রক্তিম হয়ে ওঠে।

সিগন্যালে নীল আলো দিয়েছে। গার্ডের হুইসেল শোনা গেল। ঘণ্টা পড়লো ঢং ঢং ঢং।

যতদূর দেখা যায় শর্বরী খোলা জানালা পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে ডাঃ সাহা এখনো প্ল্যাটফরমের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন।

আবার শর্বরীর দু চোখের পাতা অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে যায়। ঝাপসা দৃষ্টির মধ্যে একটু একটু করে মধ্যরাত্রির অন্ধকারে পশ্চাতে ফেলে-আসা দণ্ডায়মান ডাঃ সাহার মূর্তিটা অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল।

॥ শ্বেত কপোত ॥

মাস দুয়েক পরে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরে ডাঃ সাহা শর্বরীর একটা চিঠি পেয়েছিলেন।

শর্বরী লিখেছিল—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আপনাকে জানাবো। পরশু সন্ধ্যায় আমার একটি ছেলে হয়েছে। মনে আছে নিশ্চই আপনার, দুই মাস আগে এক মধ্যরাত্রে বিদায়ের মুহূর্তে আপনি বলেছিলেন যে, আমার ছেলে হলে আপনি তার নামকরণ করবেন। নামকরণের মধ্যে দিয়ে আমার ছেলেকে আপনি আশীর্বাদ জানাবেন। কারণ আজ আমার আপনার চাইতে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী এ জগতে কেউ ত আর নেই। তাই তার জীবনের প্রারম্ভে আপনার আশীর্বাদই হোক তার চলার পাথেয়। আর সেই সঙ্গে আমাকেও আশীর্বাদ দেবেন যেন আমি কখনো ব্রতচ্যুত না হই। যে দুশ্চর তপস্যা আমি নিয়েছি তাতে যেন উত্তীর্ণ হতে পারি। আমার ছেলেকে যেন আমি তার জন্ম-পরিচয় দিয়ে যেতে পারি। আর সেই পরিচয় নিয়েই যেন সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সবার মাঝে।

আপনার স্নেহধন্য
শর্বরী

সেই দিনই রাত্রে শর্বরীর চিঠির জবাব দিলেন ডাঃ সাহা।

সুচরিতাসু,

মা, তোমার চিঠিখানি পেয়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা এই ক্ষুদ্র পত্রে জানাবার মত ভাষা আমার নেই। তুমি একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছো জেনে আরো খুশি হয়েছি। আজকের এই পুত্র যেন উত্তরকালে তোমার মত মায়ের পরিচয় নিয়ে ধন্য হয়; মাথা উঁচু করে যেন সে বলতে পারে, সে তোমার সন্তান। তোমার কথা যতই ভাবি, বিস্ময়ের যেন আমার আর অবধি থাকে না। ভাবি এমনি শ্রদ্ধায় এমনি নিষ্ঠায় যদি এদেশের প্রত্যেক মেয়ে মাতৃত্বকে গ্রহণ করতে পারতো, তবে বুঝি এ জাতির গতি কেউ রোধ করতে পারতো না। কুসুমাস্তীর্ণ পথ

ধরে যে জীবন চলে, সে জীবনে ত কোন গৌরবই নেই মা! প্রতি পদবিক্ষেপে কণ্টকক্ষত হয়েই না জীবনকে আমরা সত্যিকারের উপলব্ধি করি। দুঃখের সিন্ধু মন্থন করেই না জীবনপাত্র সুধারসে ভরে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। আমার আশীর্বাদ ত নিশ্চয়ই, সেই সঙ্গে তোমার উপরে ভগবানের আশীর্বাদ নিরন্তর বর্ষিত হোক এই কামনাই করি। বলেছিলাম তোমার পুত্রের নামকরণ আমিই করবো। ওদের দেশে ধর্মপিতা হবার রীতি আছে, সেই রীতি আমাদের দেশে ত নেই। নইলে আজ তোমার পুত্রের ধর্মপিতা আমিই হতাম। তোমার পুত্রের নাম রেখো গৌতম। গৌতম বুদ্ধের মতই যেন সে জীবনের সত্যকে একদিন খুঁজে পায়, জীবন-সত্যকে সে উপলব্ধি করতে পারে। এই আশীর্বাদই আজ তার জন্য আমার রইলো।

ইতি—

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

ডাঃ সাহা

শর্বরীর পুত্র যেদিন জন্মায় ঠিক সেইদিনই বোম্বাই বন্দর থেকে শৈবালের জাহাজ ছাড়লো। তার পরের পাঁচটা বৎসরের ইতিহাস: বিলাতে শৈবালের ক্ষয়রোগ সম্পর্কে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ ও ওদেশের ক্ষয়রোগের নানা হাসপাতালে ক্ষয়রোগের অতি আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে হাতেনাতে অভিজ্ঞতা অর্জন। আর এদিকে শর্বরীর একান্তভাবেই শিশুপুত্রকে পালন। দীর্ঘ পাঁচটা বৎসর শর্বরী বাইরের কোন কাজই করেনি। কেবল ডাক্তারী বই নিয়ে পড়াশুনা করেছে ও গৌতমকে ধীরে ধীরে বড় করে তুলেছে রাঁচিতে ডাঃ সাহার বাড়িতে থেকেই। ডাঃ সাহা দু-একবার রাঁচিতে এসে দু-দশ দিন ওদের সঙ্গে কাটিয়ে গিয়েছেন ইতিমধ্যে।

চমৎকার ছেলেটি হয়েছে শর্বরীর।

গোলগাল চেহারা। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল। টানাটানা স্বপ্নেভরা যেন দুই চোখ। আর কি দুষ্টু, কি দুষ্টু! এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল হয়েছে কি একটা না একটা কিছু ঠিক করে বসে আছে। আর প্রশ্নই বা কত! শর্বরীরও যেন ক্লান্তি নেই। প্রতিটি প্রশ্নের সে জবাব দেবে।

তারপর ছেলে যখন পাঁচ বছর:কয়েক মাসের হলো, শর্বরী আবার তার পূর্ব জীবনে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। তাছাড়া হাতের জমানো অর্থও ফুরিয়ে গিয়েছে। হাত শূন্য। এবারে অর্থের সন্ধানে তাকে বেরুতেই হবে।

অর্থ না হলে গৌতমকেও মনের মত করে মানুষ করা যাবে না। কাজের

সন্ধান করতে লাগলো শর্বরী। ডাঃ সাহাকে সে সম্পর্কে চিঠি দিল, যদি তিনি কোন সন্ধান দিতে পারেন। কিন্তু কাজ পাওয়া এত সহজ নয়, বিশেষ করে কোন হাসপাতালে। অথচ শর্বরীর ইচ্ছা আবার কোন হাসপাতালে কাজ শুরু করে। প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করার তার আদৌ ইচ্ছা নেই।

মাসখানেক পরে শর্বরী ডাঃ সাহার একটি চিঠি পেল। চিঠির মধ্যে একটি চাকরির বিজ্ঞাপনের কাটিং।

বোম্বাইয়ের কোন এক ডাঃ ঘোষাল, তাঁর নিজস্ব বিপ্রদাস নার্সিংহোমের জন্য একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ স্ত্রী-ডাক্তার চান। মাইনে ৩২৫৲ থেকে ৫০০৲ পর্যন্ত। ফ্রি কোয়ার্টারও পাওয়া যাবে।

ডাঃ সাহা কাটিংটি পাঠিয়ে চিঠির মধ্যে লিখেছেন, এই যে বিজ্ঞাপনের কাটিংটি পাঠালাম, এটা পাওয়া মাত্র ঐ ঠিকানায় তুমি একটা দরখাস্ত করে দেবে শর্বরী। ডাঃ অনাদি ঘোষাল আমার ও নির্বাণ চৌধুরীর ক্লাস-ফ্রেণ্ড। শুধু ক্লাস-ফ্রেণ্ডই নয়, এককালে আমাদের তিনজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল, এবং অনাদিও আমাদের মতই আজও অবিবাহিত। লোকটি যেমন জ্ঞানী তেমনি বিদ্বান। পাস করবার পরই ও চৌধুরীর সঙ্গে একত্রে একই জাহাজে ইউরোপ চলে গিয়েছিল। চৌধুরী তিন বৎসর পরে দেশে ফিরে এলো, কিন্তু ঘোষাল ফিরল দীর্ঘ সাত বৎসর পরে। তাও ফিরত না, ফিরলো কতকটা বাধ্য হয়েই। কারণ একমাত্র অভিভাবক ওর কাকা বোম্বাইয়ের কোন এক কাপড়ের কলে বড় অফিসার ছিলেন। তিনি বোম্বাইয়ে সেটেল্‌ড করেন। অল্প বয়সে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। সন্তানাদিও তাঁর কিছু ছিল না। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বোম্বাইয়ের বাড়ি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের একমাত্র ওয়ারিশান হলো অনাদি। যাহোক, অনাদি ভারতবর্ষে ফিরে এসে ঐ বোম্বাইতেই তার কাকার বাড়িতে, কাকার নামে একটি নার্সিংহোম খুলে কর্ম-জীবন শুরু করল। সেও আজ দীর্ঘ আঠারো বৎসর আগেকার কথা। অনাদি ডাক্তারী পড়লেও এবং স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও আসলে তার মনটা বরাবরই ছিল বিজ্ঞানীর মন। কেমিষ্ট্রিতে তার যেমন ঝোঁক ছিল, তেমনি পড়াশোনাও ছিল। কাজেই নার্সিংহোম খুললেও তার একাংশে সে তৈরী করে তুলল এক ছোটখাটো গবেষণাগার। বেশীর ভাগ সময়ই তার কাটে ঐ ল্যাবোরেটারির মধ্যে। নার্সিংহোম নিজে সর্বদা দেখতে পারে না বলে দু-তিনজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সে তার নার্সিংহোমে নিযুক্ত করে তাদের উপরই বেশী কাজের ভারটা তুলে দিল। তুমি জান, গত বৎসর মাসখানেকের জন্য আমি বোম্বাই গিয়েছিলাম। সেই সময়ই

তার নার্সিংহোম দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। সেবারই সে কথায় কথায় আমাকে একদিন বলেছিল, নার্সিংহোমের কাজ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, আরো একজন ডাক্তার নেবে। বোধ হয় তারই জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। যাহোক তুমি দরখাস্ত পাঠাও, আমিও আজই চিঠি দিচ্ছি অনাদিকে তোমার কথা জানিয়ে। আমার বিশ্বাস তোমার যদি অত দূর দেশে যেতে কোন আপত্তি না থাকে ত তোমার ওখানে চাকরি হয়ে যেতে পারে। কারণ মনে হয় অনাদি হয়ত আমার কথা ফেলতে পারবে না। যাহোক, তুমি কি করলে না করলে পত্রপাঠ আমাকে জানাবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

ডাঃ সাহা

ডাঃ সাহার চিঠিটা পেয়ে শর্বরী যেন হাতে স্বর্গ পেল। সত্যই দীর্ঘদিন সে তার অতিপ্রিয় কর্মজীবন থেকে বলতে গেলে প্রায় সম্পর্কহীন হয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল গত এক বৎসর ধরে বহু জায়গায় দরখাস্তর পর দরখাস্ত করেও কোথা থেকেও সাড়া না পেয়ে ক্রমেই সে যেন হতাশ হয়ে পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিন ধরে এও ভাবছিল যে চাকরি না জোটে ত সে প্রাইভেট প্র্যাকটিশই শুরু করবে, কারণ বাঁচতে ত হবেই তাকে। এবং সে যদি একা হতো তবে কথা ছিল না। আজ যে সঙ্গে রয়েছে আবার গৌতম। এক দিন ছেড়ে দশ দিন সে না হয় উপোস করতে পারে। কিন্তু গৌতম! তাকে সে কেমন করে কোন প্রাণে উপোস করিয়ে রাখবে!

শর্বরী সেই দিনই বোম্বাইয়ের 'বিপ্রদাস নার্সিংহোমে'র ঠিকানায় ডাঃ অনাদি ঘোষালের কাছে বিজ্ঞাপন অনুযায়ী একটা দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দিল।

॥ ২ ॥

কিন্তু দরখাস্ত পাঠাবার পর যখন এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল অথচ তার কোন জবাব এলো না, তখন শর্বরী ক্রমে ক্রমে যেন হতাশ হয়ে পড়ল। হাতের অর্থও এদিকে একেবারে নিঃশেষিতপ্রায়। একমাত্র গৌতমের দুধের খরচ ছাড়া সব খরচই শর্বরীকে কমাতে হয়েছে ক্রমে ক্রমে।

শেষ সম্বল ছিল দুটি আংটি।

একটি বাবার দেওয়া—চুনীর, অন্যটি শৈবালের দেওয়া বাগ্‌দানঅঙ্গুরীয়—হীরার। শৈবালের দেওয়া আংটিটি বিক্রি করতে সে পারলে না, করলে বাবার দেওয়া আংটিটাই

গৌতমকে দেখাশুনা করবার জন্য একটি রাতদিনের দাসী রেখেছিল শর্বরী। ওই দেশীয়ই একটি মেয়ে, জানকী। সে হতভাগিনীরও ত্রিসংসারে কেউ ছিল না। অল্পবয়সে বিধবা হয়ে শ্বশুরের ঘরেই কিল চড খেয়ে পডে ছিল। শর্বরীর ওখানে চাকরি পেয়ে জানকী যেন বেঁচেছিল। চারদিক থেকে অর্থকষ্ট যখন আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছে, শর্বরী তখন জানকীকে বলেছিল, জানকী, তোকে ত আর রাখতে পারবো না, তুই বরং অন্য কোথাও একটা কাজ ঠিক করে নে।

কথাটা শুনে জানকী কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল, খোকাবাবুকে ছেডে কোথাও আমি যেতে পারবো না মাঈজী। অমন কথা তুই বলিস না।

কিন্তু জানকী, তোর মাইনে দেওয়ার মতও টাকা যে আজ আমার নেই রে।

কে তোর কাছে মাইনে চেয়েছে। মাইনে আজ থেকে আমাকে আর তোর দিতে হবে না!

কথাটা তুই আমার বুঝতে পারছিস না জানকী। দেখছিস ত। এর পর এখানে থাকলে তোকেও আমার সঙ্গে উপোস করতে হবে হয়ত।

তুই যদি উপোস করতে পারিস ত আমি করতে পারবো না। খুব পারবো। তোর কিছু ভাবতে হবে না।

জানকীকে কোনমতে ছাডানো যাবে না বুঝেই শর্বরী আর উচ্চবাচ্য করেনি।

জানকী যেদিন শর্বরীর বাবার দেওয়া আংটিটি বাজারে বিক্রি করে তার হাতে মাত্র ত্রিশটি টাকা এনে তুলে দিল, টাকা কটা হাত পেতে নিতে গিয়ে শর্বরীর চোখের কোল দুটি জলে ছাপিয়ে গেল। বাবার শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকুও গেল। এমনি হতভাগিনী সে যে, রাখতে পারলে না সেটা শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পডে যায় গৌতমের কথা। গৌতম? গৌতমকে যে তার যে করে হোক বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। গৌতমের চাইতে ত তার কাছে কিছুই বড নয়।

অদূরে বারান্দার একধারে গৌতম তখন কতকগুলো কাঠের টুকরোকে জোডা দিয়ে একটা খেলার ইন্‌জিন তৈরী করতেই ব্যস্ত।

অত্যন্ত ব্যস্ত গৌতম। কোনদিকেই তাকাবার তখন তার ফুরসৎ নেই। পরিধানে একটা হাফপ্যাণ্ট ও হাফসার্ট। মাথার ঝাঁকডা ঝাঁকডা চুলগুলো কপালের উপরে এসে পড়েছে।

সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শর্বরী ডাকল, গৌতম!

প্রথম ডাকে গৌতমের সাড়া পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয়বার আবার শর্বরী ডাকল, গৌতম !

দাঁড়াও মা-মণি, ইন্‌জিনটা তৈরী প্রায় শেষ হয়ে এলো।

একটিবার এসো গৌতম ?

এবারে অর্ধসমাপ্ত ইন্‌জিনটা ফেলে রেখে গৌতম মায়ের কাছে এগিয়ে এলো, মা-মণি।

দু হাতে শর্বরী গৌতমকে বুকের উপর টেনে নিল। শর্বরীর দু চোখের কোলে জলকণা তখনও টলটল করছে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গৌতম বলে, কী হয়েছে মা-মণি ? তুমি কাঁদছো ?

কই বাবা, কাঁদি নি ত !

তবে তোমার চোখে জল কেন ? জান্‌কী তোমায় বকেছে বুঝি ? দাঁড়াও, জান্‌কীকে আমি এমনি মারবো লাঠি দিয়ে—

হ্যাঁ বাবা, বড় হয়ে তুই কি হবি বল্‌ ত !

ইন্‌জিন-ড্রাইভার।

ইন্‌জিন ড্রাইভার হবি কি রে ?

হ্যাঁ, ইন্‌জিন চালাবো, আর তোমাকে নিয়ে কত দেশ ঘুরবো ! আচ্ছা মা-মণি, স্টেশনে সেদিন যে ইন্‌জিনটা দেখালে সেটা কোথায় যাচ্ছিল ?

কলকাতায়।

তবে তোমাকে নিয়ে আমি আগে কলকাতাতেই যাবো।

না বাবা, না, কলকাতায় নয় অন্য কোথাও নিয়ে যাস।

হঠাৎ এমন সময় শোনা গেল, টেলিগ্রাম !

চমকে ওঠে শর্বরী। টেলিগ্রাম ! তার কাছে কে আবার টেলিগ্রাম করল !

চোখ তুলে তাকাল শর্বরী। ডাকপিয়ন তার লাল রংয়ের সাইকেলটা গেটের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

টেলিগ্রাম ! ডাঃ এস্‌. রায়।

হ্যাঁ, আমিই। সই করে শর্বরী পিয়নের হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিল। কম্পিত হাতে খাম ছিঁড়ে টেলিগ্রামটা পড়তে পড়তে কিন্তু শর্বরীর চোখেমুখে খুশির একটা ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে।

টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন 'বিপ্রদাস নার্সিংহোম' থেকে ডাঃ অনাদি ঘোষাল। তাকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে, সে যেন টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্রই কাজে গিয়ে যোগদান করে।

আঃ ! মস্ত বড় একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে শর্বরী যেন নিষ্কৃতি পেল।

গৌতমকে বুকে তুলে নিয়ে-শর্বরী বলে, আমরা বোম্বাই যাচ্ছি গৌতম!

বোম্বাই! কোথায় সে দেশটা মা-মণি?

দূরে। অনেক দূরে, সাগরের ধারে।

কবে মা-মণি?

আজই। তারপরই চিৎকার করে শর্বরী ডাকে, জান্‌কী! এই জান্‌কী!

ডাক শুনে হন্তদন্ত হয়ে জান্‌কী ছুটে এলো, কী হয়েছে মাঈজী!

আমরা আজই বোম্বাই যাবো জানকী! বোম্বাইয়ে আমার চাকরি হয়েছে।

সত্যি মাঈজী!

হ্যাঁ রে, হ্যাঁ—

খুব ভাল হয়েছে মাঈজী! খুব ভাল হয়েছে!

হ্যাঁ, খুব ভাল হয়েছে।

কিন্তু সব গোছগাছ করতে হবে ত।

দেখ্‌ না, দু মিনিটে সব হয়ে যাবে। বলতে বলতে শর্বরী ঘরের দিকে পা বাড়াতেই পিছন থেকে জান্‌কীর ডাক শুনে দাঁড়ায়।

মাঈজী!

কি রে!

আমিও কিন্তু যাবো।

তুই যাবি, কোথায়?

কেন বোম্বাই! তোদের সঙ্গে!

শর্বরী ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করে। তারপর হেসে বলে, বেশ যাবি। হলো ত মুখপুড়ী! এখন যা, গোছগাছ করে নে শীগগির সব। তুই যে আমার ঘাড় থেকে নামবি না তা আমি আগেই জানতাম।

বোম্বাই।

বিপ্রদাস নার্সিংহোম!

বোম্বাইগামী ট্রেনে চেপে অনেকদিন পরে আবার যেন শর্বরী নিজেকে অত্যন্ত হালকা বোধ করে এবং বিধাতার কি বিচিত্র কানুন, ঠিক যেদিন রাত্রে আপ বোম্বাই মেলে শর্বরী বোম্বাই চলেছে, সেই রাত্রেই ডাউন বোম্বাই মেলে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে অকস্মাৎ তারযোগে পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে একান্ত অনিচ্ছাতেই শৈবাল আবার কলকাতায় ফিরে চলেছে, এবং ঐ লাইনেই। রাত্রির কোন একসময় আপ ও ডাউন দুটি ট্রেন পরস্পর পরস্পরের

পাশ দিয়ে চল্লিশ মাইল স্পীডে বের হয়ে গেল, কিন্তু শর্বরী বা শৈবাল চিন্তাও করতে পারল না বা ঘুণাক্ষরে জানতেও পারল না যে, মুহূর্তের জন্য অতি কাছাকাছি দীর্ঘকাল পরে এসেও আবার পরক্ষণেই দুজন দুদিকে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতই ছিটকে বের হয়ে গেল। সবচাইতে আশ্চর্য, দীর্ঘকাল পরে কলকাতা অভিমুখে যেতে যেতে শৈবাল সে-রাত্রে চলমান গাড়ির খোলা জানালার সামনে বসে ভাবছিল শর্বরীর কথাই। কোথায় আজ শর্বরী কে জানে। আজও সে বেঁচে আছে কিনা তাই বা ঠিক কি। আর, আর একটা কথা ইদানীং প্রায়ই তার মনে হতো, শর্বরীর এত দিনে নিশ্চয়ই সন্তান হয়েছে। সে ছেলে না মেয়ে। আর কার মতই বা দেখতে হয়েছে সেই সন্তান? নাই বা কোন দিনও আর ফিরে এলো শর্বরী শৈবালের কাছে, কিন্তু একটিবার তাদের সংবাদ যদি সে পেত। আশ্চর্য! কোনদিনই কি একটিবারের জন্যও তার কথা শর্বরীর মনে হয় না? চিরজীবনের মতই কি তার জীবনের পৃষ্ঠা হতে শৈবালের নামটা পর্যন্ত মুছে ফেলেছে সে। কেমন করে শর্বরী তা পারল। আজও কি সে তাকে ক্ষমা করতে পারল না! তার ক্ষণিক ভুলের সে প্রায়শ্চিত্ত কি আজও তার শেষ হয়নি।

আর শর্বরীও সে রাত্রে বোম্বাইয়ের পথে যেতে যেতে ভাবছিল শৈবালের কথাই। আশ্চর্য। সেই শৈবাল, এই দীর্ঘ পাঁচ বছর কয় মাসের মধ্যে একবারের জন্যও তার খোঁজ নিল না। মাঝে মাঝে মনে হয় শৈবাল নিশ্চয়ই এতদিনে বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে। কেমন হয়েছে দেখতে শৈবালের বৌ। সুন্দরী নিশ্চয়ই খুব। পছন্দের ব্যাপারে যে খুঁতখুঁতুনি ছিল শৈবালের। কত মেয়েকে নিয়ে কতদিন শৈবাল তার কাছে ঠাট্টা করেছে, ওর নাকটা উঁচু, অমুকের কপালটা উঁচু, অমুকের চোখ ছোট, ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে শর্বরী বলেছে, আমাকে নিয়েও তুমি কারো কাছে সমালোচনা কর না ত শৈবাল?

কেন বল ত?

না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

তার জবাবটা নাই বা শুনলে।

শর্বরী হেসে বলেছে, বেশ।

পাশেই বার্থে গৌতম ঘুমিয়ে। শর্বরী গৌতমের মুখের দিকে একবার তাকাল। আশ্চর্য রকম শৈবালের মুখের আদল পেয়েছে গৌতম। শৈবালের সন্তান। ধ্বক্ করে ওঠে যেন সহসা শর্বরীর বুকের ভিতরটা। আজও গৌতম শিশু। এখনো তার পিতৃপরিচয় সম্পর্কে কোন কৌতূহলই জাগেনি ওর। কিন্তু

একদিন ত জাগবেই। তখন। তবে কি সে গৌতমের উপরে, তার নিজের সন্তানের উপরে অন্যায় করছে। তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখে কি কোন পাপ করেছে। না, না—কোন পাপ, কোন অন্যায় সে করেনি, কে শৈবাল তার, কে শৈবাল গৌতমের। কোন অধিকার, কোন দাবিই নেই তার গৌতমের উপর। গৌতম তার কেউ নয়, সে গৌতমের কেউ নয়। গৌতম একমাত্র তারই। একমাত্র গৌতম তার মায়েরই। গৌতমকে মানুষ করে দেবে শর্বরী। তারপর সে দাঁড়াবে দশজনের মধ্যে মাথা উঁচু করে তার নিজেরই পরিচয়ে।

দাদারে একটেরে একেবারে সী-বীচের কোল ঘেঁষে 'বিপ্রদাস নার্সিংহোম' ডাঃ অনাদি ঘোষালের।

নিজে থাকবার জন্যই বলতে গেলে শখ করে বিপ্রদাস ঘোষাল দাদারের নির্জন অংশে একেবারে সমুদ্রের কিনারে 'মণি ভিলা' তৈরি করেছিলেন, তাঁর স্ত্রী মণিমালার ইচ্ছাতে। কিন্তু 'মণি ভিলা' তৈরি হবার পর দেড়টা বছরও বেঁচে রইলেন না মণিমালা। পেটের মধ্যে টিউমার হয়ে অপারেশন করতে গিয়ে মারা গেলেন। মনের মত করে 'মণি ভিলা' সাজিয়ে ছিলেন মণিমালা, কিন্তু নিজের হাতে সাজানো বড় সাধের 'মণি ভিলা' পড়ে রইলো, তিনি কোথায় অজানা অজানা দেশে চলে গেলেন।

বিরাট দোতলা বাড়ি 'মণি ভিলা'।

মৃত্যুর পর দেখা গেল 'মণি ভিলা' ও ব্যাংকের সমস্ত টাকা বিপ্রদাস ঘোষাল তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বিলাত-প্রবাসী ডাঃ অনাদি ঘোষালকেই দিয়ে গিয়েছেন। আরো দুটি ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ, তাদের এক কপর্দকও দিয়ে যাননি।

কেন যে দিয়ে যাননি, তার কারণ যেমনি তিনি নিজেও কিছু বলে যানান, জানাও তেমনি যায়নি কিছু। তবে চিরদিনই অনাদিকেই তিনি একটু বেশী স্নেহ করতেন।

অনাদি বিপ্রদাসের মৃত্যুর পর তার পেয়ে ইউরোপ থেকে ফিরে এসে দু মাসের মধ্যেই 'মণি ভিলা'র পশ্চাতে উদ্যান-সংলগ্ন যে আউটহাউসটি ছিল, সেটাকে কিছু অদলবদল করে মনোমতো ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের বাসোপযোগী করে নিলেন এবং 'মণি ভিলা'র মধ্যে খুললেন নার্সিংহোম। অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থায় বিপ্রদাস নার্সিংহোম হলো একেবারে শহরের অন্যতম সেরা নার্সিংহোম। কুড়িটি বেড, অপারেশন থিয়েটার দুটি ও থেরাপি ও একস্-রে ও প্যাথলজি

ডিপার্টমেণ্ট নিয়ে বিপ্রদাস নার্সিংহোম। ঘোষাল নিজে ধাত্রীবিদ্যায় বিশারদ, ডাঃ প্যাটেল এলেন শল্য বিশারদ হয়ে, আর এলো দুজন অল্পবয়স্ক স্বল্প-অভিজ্ঞ ডাক্তার, নারায়ণ রাও ও আনন্দ প্যাটকার। নারায়ণ রাও ত্রিচিনাপল্লী থেকে ও আনন্দ পুনা থেকে এলো। প্রথমে নারায়ণ রাও, তার বছর চারেক বাদে এলো আনন্দ। ওদের মধ্যে আবার আনন্দই সবচাইতে কমবয়েসী। নারায়ণ রাও ও আনন্দ দুজনেই সর্বদা নার্সিংহোমে থাকত। তাদের থাকবার জন্য কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছিল। ডাঃ প্যাটেল বাইরেই থাকতেন। নার্সিংহোমেরই নিচের তলায় দুটো ঘর ওদের দুজনের থাকবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল প্রথমে। পরে নতুন করে 'মণি ভিলা'র সামনে যে খালি জায়গাটা পড়ে ছিল, সেখানে একটা ছোট বাড়ি তৈরি করে তাদের কোয়ার্টার করে দেওয়া হয় নিচের তলায় এবং উপরের তলায় তিনজন নার্সের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়। বছর বারো একটানা কাজ করবার পর নার্সিংহোম থেকে ডাঃ নারায়ণ রাও চলে গেলেন সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়ায় ডাঃ ঘোষালের সঙ্গে। তারই জায়গায় এলো শর্বরী, মাস আষ্টেক বাদে।

আনন্দের বয়স মাত্র ত্রিশ বছর। রোগাটে চেহারা। গায়ের রং টকটকে গৌরবর্ণ। যেমন সরল প্রকৃতির, তেমনি আমুদে।

নারায়ণ রাওএর চলে যাবার পর গত আট মাস আনন্দই বলতে গেলে একাকী নার্সিংহোমের সব কিছু দেখাশোনা করছিল, কেননা ইদানীং বছর তিনেক ধরে ডাঃ ঘোষাল তাঁর আবাসস্থলটির উপরের অংশে একটি ছোটখাটো ল্যাবোরেটারি করে কি সব গবেষণা নিয়ে দিবা-রাত্র ব্যস্ত থাকতেন। নার্সিংহোমে বড় একটা আসতেনই না। বিশেষ প্রয়োজন না হলে আনন্দও ডাঃ ঘোষালকে বিরক্ত করতো না।

সত্যি কথা বলতে কি ডাঃ ঘোষাল লোকটি বিচিত্র ধাতুতে গড়া। রোগা ঢ্যাঙা চেহারা। একমাথা এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল। মোটা ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমার আড়াল থেকে দুটো চোখের দৃষ্টি বুদ্ধির প্রাখর্যে যেন শাণিত ছুরির ফলার মত ঝকঝক করে। খাঁড়ার মত উঁচু নাক। প্রশস্ত বুদ্ধিদীপ্ত ললাট। বয়েস পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে হলেও শরীরের কোথাও ভাঙন ধরেনি। নিজে যেমন অত্যন্ত স্বল্পবাক তেমনি অন্যের বেশী কথা বলাও পছন্দ করেন না। দিন ও রাত্রির বেশীর ভাগ সময়ই কেটে যায় তাঁর ল্যাবোরেটারির মধ্যে কি সব গবেষণা নিয়ে। একটি ভৃত্য আছে রাধু, সেই সব দেখাশোনা করে তাঁর।

একমাত্র রাধু ব্যতীত আর ল্যাবোরেটারিতে কারো প্রবেশাধিকার নেই। এমন কি আনন্দরও বিনানুমতিতে।

ডাঃ ঘোষালের বিরাট ওলডসমবিল গাড়ি নিয়ে আনন্দই স্টেশনে শর্বরীকে রিসিভ্ করতে গিয়েছিল।

সরল আমুদে আনন্দকে প্রথম পরিচয়েই শর্বরীর ভাল লাগে।

নারায়ণ রাওয়ের খালি কোয়ার্টারের দুটি ঘরই শর্বরীর বাসের জন্য স্থির হয়েছিল।

পুব ও দক্ষিণ খোলা ঘর দুটি। দক্ষিণেই সমুদ্র। খোলা জানালার সামনে দাঁড়ালেই চোখের সামনে খুলে যায় অপূর্ব এক দৃশ্য। দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। ঢেউয়ের পর ঢেউ দামাল শিশুর মত যেন সর্বক্ষণ কলহাসির মূর্ছনা তুলে বালুবেলার ওপরে এসে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

ভারি পছন্দ হয়ে গেল শর্বরীর নিজের ঘর দুটি দেখে।

ঘর পছন্দ হয়েছে আপনার ডাঃ রায়? আনন্দ জিজ্ঞাসা করে।

নিশ্চয়ই। লাভলি। খুব পছন্দ হয়েছে।

তাহলে এ বেলাটা বিশ্রাম করুন। বিকেলের দিকে নার্সিংহোম ঘুরিয়ে আনবো।

কিন্তু ডাঃ ঘোষালের সঙ্গে ত এখনো দেখাই হলো না। শর্বরী বলে।

ব্যস্ত কি, হবে।

তা বললে কি চলে? তাঁরই কাছে চাকরি নিয়ে এলাম। চলুন, দেখা করে আসি।

হবে'খন। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

শর্বরীর মনে হয় আনন্দ যেন তার প্রস্তাবটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ও কেমন যেন একটু বিস্মিতই হয়।

ডাঃ প্যাটকার!

আমাকে ডাঃ আনন্দ বলেই ডাকবেন ডাক্তার রায়। এখানে সকলে আমাকে ঐ নামেই ডাকে।

বেশ। তাই হবে। কিন্তু বলছিলাম কি একবার ডাঃ ঘোষালের সঙ্গে—

এখন তিনি ল্যাবোরেটারিতে ব্যস্ত। এসময় তাঁকে বিরক্ত না করাই ভাল ডাঃ রায়।

ওঃ আচ্ছা—

কোন চিন্তা করবেন না ডাঃ রায়। এসেছেন যখন এবং থাকবেনও, তখন

ক্রমে সবই জানতে পারবেন। ডাঃ ঘোষাল লোকজন বড় একটা পছন্দ করেন না। একটু বিশেষ রকম সলিটারী টাইপের লোক।

শর্বরী ঠিক যেন আনন্দর কথাটা বুঝতে পারে না। তাই ওর মুখের দিকেই চেয়ে থাকে।

মৃদু হেসে আনন্দ বলে, তার জন্যে ত আপনার চিন্তা করবার কিছুই নেই ডাঃ রায়। আপনি আপনার কাজ করে যাবেন। তিনি কারো কাজেই ইণ্টারফিয়ার করেন না।

শর্বরী ভাবে, সত্যিই ত! এখানে সে কাজ করতে এসেছে। তার কাজের সঙ্গেই সম্পর্ক। কি হবে তার ডাঃ ঘোষালের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে। কিন্তু আবার মনে হয়, ডাঃ ঘোষালের ব্যাপার যেমন শুনছে, কী জানি টিকতে পারবে ত সে এখানে!

আচ্ছা আপনি তাহলে বিশ্রাম নিন। বিকালে আসবো।

আনন্দ বিদায় নিয়ে চলে গেল।

নিত্য ব্যবহারের জন্য ঘরভর্তি ছিল নানা আসবাবপত্র। সোফা, কাউচ, আলমারি, খাট, ড্রেসিংটেবিল, সব কিছুই ছিল, কেবল সে সব কিছুতে নারী-হাতের চিরন্তন কল্যাণ স্পর্শ এতদিন কখনো লাগেনি বলেই, সব কিছুর মধ্যেই যেন ছিল একটা নিস্পৃহ অগোছাল ছাপ। তাছাড়া ডাঃ নারায়ণ রাও চলে যাবার পর থেকে ঘর দুটি খালি এবং তালাবন্ধই পড়ে ছিল এত দিন। সমস্ত দ্বিপ্রহর ধরে জানকীকে নিয়ে দুজনে মিলে ঝাড়পোঁছ করে মনোমত করে ঘর দুটি সাজিয়ে শর্বরী স্নান সেরে বৈকালের দিকে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে প্রসাধনে বসেছে এমন সময় বাইরে আনন্দর সাড়া পাওয়া গেল।

জানকী আনন্দকে ডেকে এনে বাইরের ঘরে বসাল।

মুগ্ধ বিস্ময়ে আনন্দ ঘরের চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র ঘরটি আমূল সংস্কৃত হয়ে যেন বিশেষ একটি রূপ নিয়েছে। দীর্ঘদিন অবিশ্যি আনন্দ এঘরে আসেনি, কিন্তু নারায়ণ রাওর থাকাকালীন ত বহুবার এঘরে সে পদার্পণ করেছে, কিন্তু আজকের মত এমনি করে কখনো ত এঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা খুশিতে ভরে ওঠেনি!

একটু পরেই শর্বরী ঘরে এসে ঢুকল।

আসুন ডাঃ রায়। আপনি নিশ্চয়ই যাদু জানেন!

যাদু জানি!

হ্যাঁ, নইলে মাত্র এই কয়ঘণ্টায় এমন মিরাকেল আপনি করতে পারতেন না। মনে হচ্ছে যেন নতুন কোন জগতে এসে হঠাৎ পা দিলাম।

শর্বরী মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। এমন সময় কলহাসির সাড়া তুলে প্রায় লাফাতে লাফাতে গৌতম এসে ঘরে ঢুকল, মা-মণি, মা-মণি, দেখ কি সুন্দর ফুল।

শর্বরী পুত্রের ডাকে চেয়ে দেখল গৌতমের হাতে মস্ত বড় একটি ব্ল্যাক প্রিন্স্ গোলাপ।

ওরে দুষ্টু, কোথা থেকে তুই ও গোলাপ নিয়ে এলি বল্ ত?

বাগান থেকে মা-মণি। কত ফুল দেখবে চল না, একটা দুটো পাঁচটা দশটা —এতো—এতো ফুল। খালি খালি ফুল।

হঠাৎ এমন সময় আনন্দর কথায় শর্বরী যেন চমকে ওঠে। আনন্দ বলে, আপনার খোকাকে একটু সাবধানে রাখবেন ডাঃ রায়।

সাবধানে রাখবো, কেন বলুন ত!

ফুলের বাগানে না যাওয়াই ভাল।

কী ব্যাপার ডাঃ আনন্দ! শর্বরীর কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে।

ডাঃ ঘোষাল একদম পছন্দ করেন না তাঁর বাগানে কেউ গিয়ে তাঁর ফুল গাছে হাত দেয়। এত ফুল বাগানে ফোটে তবু নার্সিংহোমের জন্য ফুল আসে আমাদের মার্কেট থেকে।

ফুলবাগানটি বুঝি ডাঃ ঘোষালের খুব প্রিয়!

ওঁর যে কি প্রিয় আর কি প্রিয় নয় তা একমাত্র উনি নিজে জানেন আর জানেন ওঁর বিধাতা। তবে ওঁর এলাকাটা যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।

আনন্দ জাতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ হলেও চমৎকার বাংলা বলে। কারণ সে স্কুলজীবন থেকে আই. এস-সি. পাস করা পর্যন্ত তার এক কাকার কাছে কলকাতাতেই ছিল। তারপর চলে আসে বোম্বাইয়ে। সেখানকার মেডিকেল কলেজে থেকেই এম. বি. বি. এস. পাস করে।

কি জানি কি একটা শঙ্কায় শর্বরীর বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। এ সে কোথায় এলো! গৌতমকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চেপে ধরে। মৃদুকণ্ঠে বলে, গৌতম, ফুলগাছে আর হাত দিও না বাবা।

কেন মা-মণি?

ওটা যে সেই দৈত্যের ফুলগাছ!

তাড়াতাড়ি মার কোলের উপর উঠে বসে, দু হাতে মার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে, কোন্ দৈত্য মা! যে সেই মস্ত বড় পাহাড়ের উপরে লোহার ঘরে রাজ-

কন্যাকে বন্দী করে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল!

হ্যাঁ!···

আমার তীর-ধনুক দিয়ে এবারে তাহলে সে দৈত্যকে আমি ঠিক মেরে ফেলবো দেখো মা-মণি!

সে কি!

হ্যাঁ, এতদিন তাকে খুঁজে পাই নি, এবারে যখন পেয়েছি ঠিক মারবো তাকে।

শর্বরী হাসতে থাকে ছেলের কথা শুনে। আনন্দও সে হাসিতে যোগ দেয়।

ওই বাগানের মধ্যেই বুঝি থাকে সেই দৈত্য মা-মণি!

এবারে জবাব দেয় আনন্দই, হ্যাঁ, বাগানের সামনে যে ,বাড়িটা সেইখানেই ত থাকে দৈত্য!

আমি দৈত্যকে দেখবো মা-মণি!

সেকি!

হ্যাঁ। দেখবো।

উহুঁ, খবরদার ওদিকে যেও না। আনন্দই এবারে বলে, ভীষণ রাগী সে দৈত্য।

তাতে কি. আমার তীর-ধনুক দিয়ে ঠিক তাকে মেরে ফেলবো দেখো!

তীর-ধনুক দিয়ে ত তাকে মারা যাবে না!

কেন যাবে না! আমার কাছে আছে যে সেই ব্রহ্মাস্ত্র।

ব্রহ্মাস্ত্র! আনন্দ বিস্ময়ে তাকায়।

হ্যাঁ, মহাভারত তুমি জান না! কর্ণের ছিল সেই ব্রহ্মাস্ত্র!

আনন্দ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এবারে হেসে ওঠে।

জানকী ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলো।

জানকী, গৌতমকে নিয়ে গিয়ে হাতমুখ ধুইয়ে জামা কাপড়টা বদলে দে শর্বরী বললে।

॥ ৩ ॥

চা পানের পর শর্বরী বের হলো আনন্দের সঙ্গে নার্সিংহোম দেখতে। কাচের দরজা ঠেলে আনন্দের সঙ্গে নার্সিংহোমের ভিতরে প্রবেশ করতেই ইথার ক্লোরোফরম ও লাইজলের মিশ্রগন্ধ নাকে এসে লাগল শর্বরীর আবার অনেকদিন পরে।

আঃ! অনেক—অনেকদিন পরে পরিচিত প্রিয় গন্ধটা শর্বরীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন একটা শিহরণ তোলে। আবার সে তার পরিচিত জগতে ফিরে এলো।

এই গন্ধ, এই পরিবেশ, এই নিস্তব্ধ সতর্কতার মধ্যে লঘুপদ-সঞ্চার বড় ভাল লাগে শর্বরীর। কেমন একটা আনন্দের ঝিমঝিম নেশা ধরায়।

হাসপাতাল, রোগী, তার বিচিত্র পরিবেশ এর মধ্যেই যেন শর্বরী নিজেকে সত্যিকারের খুঁজে পায়। এদের মৃদুচ্চারিত রোগযন্ত্রণার শব্দ, আশা, হতাশা, সুখদুঃখ যেন মানুষের স্বাভাবিক জীবন-গণ্ডির বাইরে অন্য এক জগৎ। দীর্ঘ দিন ধরে এদের সঙ্গে সঙ্গে এদের পাশে পাশে থেকে, যেন শর্বরী নিজের অজ্ঞাতে এদেরই একজন হয়ে গিয়েছিল। মীনুদি ত কতদিন ঠাট্টা করে শর্বরীকে বলেছে, রোগীদের সঙ্গে থেকে থেকে তুইও মনে মনে ওদেরই একজন হয়ে গিয়েছিস।

কথাটা নেহাৎ একেবারে মিথ্যে নয়।

ব্রংকাইটিস্, সেলুলাইটিস, ফেরিনজাইটিস্, নিমুনিয়া, টাইফয়েড, মেনিনজাইটিস ফাইব্রোয়েড, কয়েসিনোমা—নামগুলো সব শর্বরীর মনে হয় যেন টুক্‌রো টুক্‌রো কাব্য। নামগুলোর মধ্যে আছে একটা অদ্ভুত ছন্দের দোলা।

গ্লুকোজ, মালটিভিটামিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিটিন, এ্যমিটিন, বারবিটন, ফিনোবারবিটন, লুমিনল, ভেরানল, ম্যকরাবিন, অ্যানাথকল, ভিটাপ্লেকস্, লারগ্যাকটিল, স্যাণ্ডোসটিন নামগুলো যেন টুকরো টুক্‌রো গীতি-কবিতার লাইনের মতই শর্বরীর কানে তোলে সুরের ঝঙ্কার।

তাই জবাবে শর্বরী বলতো, সত্যিই তাই ভাই মীনুদি। এ রসে বঞ্চিতা তুই গোবিন্দদাস থুড়ি দাসী, তুই এসবের মর্ম কি বুঝবি! মানবদেহের সূক্ষ্ম একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষে কোষে রোগ যে ক বিপর্যয় ঘটায় তুই যদি জানতিস ত দেখতিস তোদের যে-কোন রোমাঞ্চকর ঘটনার চাইতেও বিস্ময়কর।

টানা বারান্দার দুপাশে কেবিন। প্রায় প্রত্যেকটি কেবিনেই রোগী বা রোগিণী আছে। সবরকম রোগেরই এই নার্সিংহোমে চিকিৎসা হয়।

আনন্দের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল শর্বরী।

ওরা একতলা শেষ করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, সিঁড়ির মাঝামাঝি সিস্টার ললিতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল।

এই যে ডাঃ আনন্দ, টেলিফোনে একজন পেসেণ্ট ডাকছে।

দোতলায় একটি অফিসঘর আছে। সেইখানেই টেলিফোন। আনন্দ দ্রুতপদে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, ডাক্তার আনন্দ স্পিকিং। হ্যাঁ

হ্যাঁ, এখুনি পাঠিয়ে দিন, বেডের ব্যবস্থা হবে।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আনন্দ সিস্টার ললিতার দিকে তাকিয়ে বললে, সিস্টার, অপারেশন থিয়েটার রেডি করুন। ইনকমপ্লিট্ অ্যাবরশন কেস বলে মনে হচ্ছে।

কি ব্যাপার ডাঃ আনন্দ? শর্বরী শুধায়।

ইনকমপ্লিট্ অ্যাবরশন কেস বলেই ত মনে হলো!

কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই গাড়ি করে রোগিণী এসে গেল। স্ট্রেচারে করে সোজা একেবারে অপারেশন থিয়েটারের পাশের ঘরে রোগিণীকে টেবিলে এনে শোয়ানো হলো। পরীক্ষা করে দেখা গেল আনন্দের অনুমান সত্য। কেসটা ইনকমপ্লিট্ অ্যাবরশনই।

মিঃ ধরমবীর, বিখ্যাত কনট্রাকটার একজন। তারই স্ত্রী—মধুমালা।

অপারেশন থিয়েটার ইতিমধ্যে রেডি হয়ে গিয়েছিল, প্রস্তুত হতে হতে আনন্দ সিস্টারকে বললে, পেসেণ্টকে ও. টি.-তে নিয়ে যান সিস্টার।

শর্বরী এগিয়ে এসে বললে, যদি কিছু মনে না করেন ডাঃ আনন্দ, আমিই কেসটা অ্যাটেণ্ড ক'রি।

আপনি! থাক না আজকের দিনটা। কাল থেকে ত—

তা হোক। আমিই করি।

বেশ। আনন্দ সরে দাঁড়ালো।

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই শর্বরী প্রস্তুত হয়ে নিল। অনেকদিন পরে আবার সে ও. টি-তে প্রবেশ করেছে। একটা অদ্ভুত উত্তেজনার ঢেউ যেন রক্তের মধ্যে ও অনুভব করে। সাবান জল ও স্পিরিটে হাত ধুয়ে রাবার গ্লাবস্ হাতে পরে নেয় শর্বরী। ললিতা অ্যাপ্রনটা পরিয়ে পিছন থেকে বেঁধে দেয়। মুখে এঁটে দেয় ম্যাস্ক্।

ও. টি-তে এসে প্রবেশ করল শর্বরী।

চারপাশের ধবধবে সাদা দেওয়াল। অত্যুজ্জ্বল আলোর রূপালী ধারা যেন তার গায়ে গায়ে পিছলে যাচ্ছে। সেই পরিচিত ক্লোরোফরম ইথারের মিশ্র নেশা ধরানো মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ! স্নায়ু ঝিমঝিম করে।

অপারেশন টেবিলে শোয়ানো হয়েছে রোগিণীকে। বিরাট ডোমে ঢাকা হাজার শক্তির বিদ্যুৎবাতির আলো, ঠিক নিচে টেবিলের ওপরে শায়িত রোগিণীর

উপরে এসে পড়েছে।

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল গ্লাবস্ পরিহিত হাত দুটি জড়ো করে শর্বরী।

রোগিণীর বয়স বড় জোর উনিশ কি কুড়ি। একগুবক শুকনো ফুলের মতই যেন রোগিণী টেবিলের উপরে নেতিয়ে পড়ে আছে। ক্লান্তিতে দুটি চক্ষু বোজা, শিথিল দেহ শিথিল কেশ ও বাস।

দুই মাসের ইনকমপ্লিট অ্যাবরশন! এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। আগেরটি মাস দশেক আগে দুই-তিন মাসের মাথায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রোগিণীর পালস্ দেখে শর্বরী বললে, ব্লাড রেডি করুন, পেসেণ্টের খুব লো কনডিশন বলেই মনে হচ্ছে।

হোল ব্লাড্ ত? ললিতা প্রশ্ন করে শর্বরীকে।

হ্যাঁ। ওর স্বামীকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসুন ত ডাঃ আনন্দ, ওর ব্লাড্ গ্রুপটা জানা আছে কিনা? নইলে গ্রুপটা একবার দেখে নিতে হবে। ভাল কথা, হোল ব্লাড পাওয়া যাবে ত?

আমাদের ল্যাবোরেটারিতে 'ও' গ্রুপের ব্লাড আছে, যদি গ্রুপে মিলে যায় ত এখান থেকেই দিতে পারব, নচেৎ ব্লাড ব্যাঙ্কে পাঠাতে হবে।

আনন্দ নিচে চলে গেল।

স্বামীর কাছে সংবাদ নিয়ে জানা গেল, এর আগেরবারও ব্লাড দেওয়া হয়েছিল এবং গ্রুপটা 'ও'।

নিশ্চিন্তে ব্লাড্ ট্রান্সফিউশনের ব্যবস্থা করে শর্বরী অপারেশন শুরু করে।

দিন সাতেক বাদে, মনের মধ্যে কেমন সন্দেহ হওয়ায় শর্বরী মধুমালার রক্ত ডব্লিউ. আর. ও কান (W. R. and kahn) টেস্টের জন্য পাঠিয়েছিল। রিপোর্ট এলে দেখা গেল তার সন্দেহ মিথ্যে নয়। ডব্লিউ. আর. ও কান দুটো টেস্টই স্ট্রংগলি পজিটিভ্। মিসক্যারেজের কারণ তাহলে সিফিলিস রোগ।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা মিঃ ধরমবীর যখন তার স্ত্রীকে নার্সিংহোমে দেখতে এলেন, শর্বরী তাঁকে অফিসে ডেকে পাঠাল।

আমাকে ডেকেছিলেন ডাঃ রায়? অফিস ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করেন মিঃ ধরমবীর।

হ্যাঁ, বসুন।

মিঃ ধরমবীর শর্বরীর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলেন।

রোগিণী, আপনার স্ত্রী সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলবার জন্যই আপনাকে

ডেকেছি।

·লুন।

কিছু মনে করবেন না মিঃ ধরমবীর। আপনার স্ত্রীর মুখে যে কাহিনী আমি শুনেছি তা অত্যন্ত দুঃখের হলেও মূলতঃ তার জন্য দায়ী কিন্তু আপনিই।

বুঝতে পারছি না তো, আপনি কি ঠিক বলছেন ডাঃ রায়? শর্বরীর মুখের দিকে তাকালেন ধরমবীর।

সত্যই দুঃখের সে কাহিনী। মধুমালার কাছ থেকে সে কাহিনী শোনা অবধি শর্বরী ভেবে রেখেছিল, আজ ধরমবীর এলেই তাঁকে শর্বরী সব কথা বলবে।

বিখ্যাত ধনী কনট্রাকটর মিঃ রঘুনাথ ধরমবীরের তৃতীয় স্ত্রী ঐ হতভাগিনী মধুমালা। পুত্রলাভের আশায় পর পর দুবার বিবাহ করেও যখন দুই স্ত্রীর কারোরই সন্তানাদি হলো না—মানে জীবিত সন্তান তারা কেউ তাদের স্বামীকে উপহার দিতে পারল না, তখন তৃতীয়বার বিবাহ করে মধুমালাকে নিয়ে এলেন ধরমবীর। কিন্তু মধুমালাও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করলো। গরীবের ঘরের মেয়ে, ধনীর ঘরের বধূর স্বীকৃতি পেয়েছিল কেবলমাত্র তার অসামান্য রূপের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েই এবং পুত্রবতী হবে এই আশাতেই। অনাঘ্রাত নির্মল পুষ্পটি। দেহকোষে তার মাতৃত্বের সমস্ত নিশ্চিত সম্ভাবনাই ছিল, কিন্তু মাতৃত্বকে তবু সে ফলদায়িনী করতে পারলো না। পূর্বগামিনীদের মতই বার বার দুবার ব্যর্থ প্রতিপন্ন হলো তারও মাতৃত্বের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই। তাই তাকে আজ চিন্তিত করে ফেলেছে। কারণ সে বুঝতে পেরেছে ঐ ব্যর্থতা তার পূর্ব-গামিনীদেরই পথরেখা ধরে অগ্রসর হবার সূচনা দিচ্ছে। তাকেও এবার সরে যেতে হবে। কারণ যে প্রয়োজনে স্বামী তাকে ঘরে এনেছিলেন, সে প্রয়োজন যখন সে মিটাতে পারল না, তখন তারও আর স্বামীর গৃহে স্থান হবে না। কিন্তু স্বামীর গৃহে তার স্থান হবে না কথাটা যে তার পক্ষে কত বড় মারাত্মক, সেটা তার চাইতে ত আর কেউ বেশী জানে না। হতভাগিনী মধুমালা মা-বাপকে ছোট বেলাতেই হারিয়ে, মাতুলালয়ে কোনমতে চারটি খেয়ে পরে টিঁকে ছিল, যার জন্য তাকে একাধারে দাসী ও রাঁধুনীর কাজ সবই করতে হতো মুখ বুঁজে। এবং কাজে কোনপ্রকার খুঁত থাকুক আর নাই থাকুক, উঠতে বসতে গঞ্জনা ছিল তার সঙ্গের সাথী।

চোখের জল না মুছতে মুছতে একদিনও তার কপালে অন্ন জুটতো না। এমনি সময় একদিন তার মাতুলালয়ে এলো প্রৌঢ় ধরমবীর। খাদ্য পরিবেশন করতে গিয়ে তাকে দেখে ধরমবীরের হলো পছন্দ, এবং তারই দিন দশেকের

মধ্যে ধরমবীরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গেল। ফুলের মত কিশোরী মধুমালাকে প্রৌঢ় ধরমবীরের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য পাড়া-পড়শী সকলেই ছি-ছি করলে, মধুমালা চোখের জল মুছতে মুছতে বারংবার নিঃশব্দ প্রণাম জানিয়েছিল ভগবানের কাছে।

স্বামীগৃহে এসে যখন মধুমালা দেখলো স্বামীর ঐশ্বর্য, আর সেই সঙ্গে পেল স্বামীর ভালবাসা ও প্রীতি, তখন আবার সে তার ভাগ্যনিয়ন্তাকে জানিয়েছিল প্রণাম। প্রথমটা তার মনে হয়েছে এ বুঝি সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নই দেখছে। হঠাৎ কোন এক জাগরণের মুহূর্তে এ স্বপ্ন তার ভেঙে যাবে। তারপর একটা মাস না যেতেই বাড়ির পুরাতন দাসী রুক্মিণীর মুখে শুনলে এ গৃহে তার মত আগে আরও দুজন এসেছিল এবং তাদের দুজনকেই এবাড়ি ছেড়ে আবার চলে যেতে হয়েছে তাদের নিষ্ফলতার অপরাধে, আতঙ্কে তার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করে উঠেছিল। তার পূর্ববর্তিনীকে তার স্বামীগৃহে আসবার মাত্র দশ দিন পূর্বে বিদায় নিতে হয়েছিল। সেইদিন থেকেই স্বামীগৃহের সমস্ত সুখ মধুমালার কাছে আতঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছিল। তারপর প্রথমবার সন্তানসম্ভবা হবার পর তিন মাসের মাথাতেই নষ্ট হয়ে গেল, দুদিন সে ভয়ে ভয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। কিন্তু ধরমবীর নিজে থাকতে যখন মধুমালার মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা জানালো, তখন যেন সে কতকটা নিশ্চিন্ত হলো।

ধরমবীরের পরিবারটা ছিল অত্যন্ত সেকেলে, পর্দানশীন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। পুরুষ ডাক্তারদের কোন প্রবেশাধিকারই ছিল না তাঁর গৃহে। কিন্তু মধুমালার প্রথম সন্তান তিন মাসের হয়ে নষ্ট হওয়ায়, কথায় কথায় একদিন ধরমবীর যখন তাঁর এক বন্ধুর কাছে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করে তাঁর বন্ধু তাকে কোন একজন ভাল স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে বলে। প্রথমটা ধরমবীর যেন বন্ধুর প্রস্তাবে সায় দিতে পারেনি মন থেকে, তারপর আবার কি ভেবে শেষটায় রাজী হয়ে যায়, এবং ঠিক করে এবারে সেরকম কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সে ডাক্তারের পরামর্শ নেবে। বিপ্রদাস নার্সিংহোমের নাম আগেই শোনা ছিল ধরমবীরের, তাই হঠাৎ সেদিন যখন সন্ধ্যার দিকে মধুমালার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে ব্লিডিং শুরু হলো, ধরমবীর নার্সিংহোমে ফোন করে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিল।

ধরমবীর বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন শর্বরীর মুখের দিকে।

কি বলছেন আপনি ডাঃ রায়! আমি দায়ী?

হ্যাঁ। আপনার শরীরের রক্তে রয়েছে মারাত্মক সিফিলিস রোগের বিষ।

সিফিলিস?

হ্যাঁ। আর সেই বিষ আপনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সম্পূর্ণ নিরপরাধা আপনার স্ত্রীর দেহরক্তে। যার ফলে এইভাবে বার বার আপনার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু—

এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই মিঃ ধরমবীর। আপনার রক্ত পরীক্ষা করালেই আপনি তা জানতে পারবেন। আর সর্বাগ্রে আপনাকে তাই করতে হবে। রক্ত পরীক্ষা করিয়ে আপনি চিকিৎসা এখুনি শুরু করে দিন, যদি ভবিষ্যতে আরো বড রকমের কোন সর্বনাশ না ডেকে আনতে চান আপনার স্ত্রী এবং আপনার নিজেরও।

সর্বনাশ!

হ্যাঁ। আপনি কি জানেন না ভয়াবহ সাংঘাতিক ঐ সিফিলিস ব্যাধি! কি না হতে পারে ঐ রোগ দেহে পুষে রখেলে। চিরজীবনের মত অন্ধ হয়ে যেতে পারেন, পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন, কিম্বা একেবারে উন্মাদ হয়েও যেতে পারেন।

আপনি ঠিক বলছেন ডাঃ রায়?

যা আমি বললাম জানবেন তার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। নিজের মঙ্গল চান ত তাই করুন আর একটি দিনও দেরি না করে।

ভীত আতঙ্কিত ধরমবীর তখন বলেন, কিন্তু কি করে এলো এ রোগ আমার দেহে ডাঃ রায়?

কি করে এলো সে ত আপনারই বেশী জানবার কথা মিঃ ধরমবীর। মনে করে দেখুন আপনার নিজের অতীত যৌবনের ব্যক্তিগত দিনগুলো। হয়ত সেখানেই খুঁজে পাবেন আজকের এই সর্বনাশের বীজগুলো।

মিঃ ধরমবীর অকপটেই এবারে স্বীকার করেন সব কথা। মনে পড়ে যায় তাঁর যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল দিনগুলো। প্রথম যৌবনে অর্থের প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেহের প্রতি তাঁর রাতের পর রাত কুৎসিত আসক্তি! এবং আজ শর্বরীর স্পষ্ট কথায় সর্বপ্রথম তিনি বুঝতে পারেন ইতিপূর্বে আরো দুজন জীবন-সঙ্গিনীকে তাঁরই পাপের বোঝায় ব্যর্থ মনে ত্যাগ করেছেন। অথচ তারা কোন দোষেই দোষী নয়, কোন অপরাধেই অপরাধী নয় তারা। তিনিই ভুলে

দিয়েছেন তাদের দেহে বিষ, যে বিষে তারা জর্জরিত হয়ে মাতৃত্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে।

তারই পাপের ও দুষ্কৃতির অবশ্যম্ভাবী অভিশাপকে তারা মাথা পেতে নিয়ে তারই হৃদয়হীনতার কাছে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করেছে।

সে রাত্রে নিজে কোয়ার্টারে ফিরে বার বার ধরমবীরের কথাই মনে পড়ে শর্বরীর। ধরমবীর জাতীয় পুরুষের নজিরের এদেশে অভাব নেই। কলকাতার হাসপাতালে আরো এ ধরনের বহু কেস তার চোখে পড়েছে। কি অসহায়ই না এদেশের মেয়েরা। নির্বিচারে স্বামীর পাপ বহন করে হাসিমুখে পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখায়, তবু জানায় না একটুকু প্রতিবাদ কোন দিন। সত্যই কি এর কোন প্রতিকার নেই!

॥ ৪ ॥

কাজের মধ্যে যেন আবার ডুবে গেল শর্বরী।

নার্সিংহোম, রোগী আর রোগ। সকাল বেলা উঠে চা ও কিছু জলখাবার খেয়ে চলে যায় নার্সিংহোমে, ফিরতে হয় সেই বেলা একটা দেড়টা। কোন কোন দিন বেলা দুটোও বেজে যায়। কিন্তু রাত্রে যত কাজই থাক, রাত নটা নাগাদ কিছুক্ষণের জন্য একবার কোয়ার্টারে তাকে ফিরতেই হয়।

ও সময়টা তাকে একবার কোয়ার্টারে আসতে হয় গৌতমের জন্যই। সমস্ত দিনটা গৌতম জানকীর তত্ত্বাবধানেই থাকে, কিন্তু রাত নটায় গৌতমের ঘুমাবার সময়। ঐ সময়ে শয্যায় তার পাশে মা-মণিকে না পেলে গৌতম কিছুতেই ঘুমাবে না। শর্বরী বলবে তাকে পাশে শুইয়ে বুকের কাছটিতে জড়িয়ে ধরে ঐ সময়ে যত রাজ্যের গল্প! কখনো রামায়ণ মহাভারতের গল্প, কখনো রূপকথা।

গল্প শুনতে শুনতে একসময় যখন গৌতমের দুটি চোখের পাতায় নেমে আসে ঘুম, তখন শর্বরীর ছুটি। নার্সিংহোমে কাজ থাকলে তারপর সে সেখানে যায়।

সারাটা দিন গৌতম তাকে একপ্রকার বলতে গেলে পায় না, কিন্তু সামান্য ঐ সময়টুকুর জন্যও যদি সে তাকে না পায় ত মার সঙ্গে তার যোগাযোগটা রইল কোথায়! তাই শর্বরীর যত কাজই থাক ঐ সময়টিতে সে গৌতমের কাছে থাকে।

সেদিনও বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করছিল শর্বরী গৌতমের কাছে।

গৌতম প্রশ্ন করে, তারপর কি হলো মা-মণি! মহর্ষি গৌতম বললেন তোমার বাবা কে—তার কি পরিচয় জেনে আসতে হবে।

হ্যাঁ, সেই কথা শুনে ফিরে এলো সত্যকাম তার মা জবালার কাছে। এসে জিজ্ঞাসা করলো, মা! আমার বাবা কে?

মা জবালা বললেন, কেন বাবা!

পুত্র বললে, মহর্ষি আমাকে আমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু আমি ত বলতে পারলাম না।

মা জবালা ছেলের মাথায় তখন হাত রেখে সস্নেহে বললেন, বৎস সত্যকাম, মহর্ষিকে বলো, মা বলেছেন যৌবনে দারিদ্র্য দুঃখে বহুর পরিচর্যা করে মা আমাকে পেয়েছেন। এর বেশী কিছু জানি না।

তারপর। গৌতম শুধায় শর্বরীকে।

তারপর পরের দিন সত্যকাম গিয়ে মহর্ষি গৌতমকে তাই বললেন। মহর্ষি তখন স্নেহভরে সত্যকামকে বুকের উপর টেনে নিয়ে বললেন—বৎস, তোমার জন্ম-পরিচয় কারো জন্ম-পরিচয় থেকেই ছোট নয়, তুমি অব্রাহ্মণ নও, তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত। জবালার সন্তান তুমি, সেই পরিচয়েই আজ থেকে তোমাকে আমি বিদ্যাদান করবো। থাকো তুমি আমার আশ্রমে।

হঠাৎ এমন সময় অদ্ভুত এক প্রশ্ন করে বসল গৌতম শর্বরীকে, আচ্ছা মা-মণি, সকলেরই বুঝি বাবা থাকে?

চমকে ওঠে শর্বরী। আশ্চর্য! এ প্রশ্ন ত আজ পর্যন্ত গৌতম তাকে কখনো করেনি। হঠাৎ আজ এ প্রশ্ন কেন?

কিন্তু শর্বরী জানত না, গৌতমের প্রশ্ন করবার কারণ ঘটেছিল। বিপ্রদাস নার্সিংহোমেরই অল্পদূরে এক বাঙালী পরিবার থাকে। বিকালের দিকে জানকী যখন গৌতমকে সি-বীচে বেড়াতে নিয়ে যায়, সেইখানেই সেই বাঙালী পরিবারের সীতা নামে ছোট একটি ওরই প্রায় সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে দিন দুই হলো ওর ভাব হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওরা যখন খেলছে, সীতার মা-বাবা দুজনেই এসেছিল সীতাকে ডাকতে। মা-বাবাকে দেখে সীতা 'বাবা! বাবা!' বলে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে তাদের কাছে চলে যায়, এবং পরের দিনও যখন আবার দুজনার দেখা হলো, বিকেলে তারই কিছু বাদে সীতার বাবা আসতেই সীতা চলে যায়। সেই থেকেই 'বাবা' ডাকটা গৌতমের কানে লেগেছিল। আজ সত্যকামের গল্প শুনতে শুনতে আবার সেই বাবা নামটা শুনেই, গৌতম শর্বরীকে প্রশ্ন করল শিশুমনের কৌতূহলে!

শর্বরীকে চুপ করে থাকতে দেখে গৌতম প্রশ্নটার আবার পুনরবৃত্তি করে, বল না মা-মণি, সকলেরই বাবা থাকে নাকি।

হ্যাঁ। মৃদুকণ্ঠে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের কতকটা অজ্ঞাতেই জবাবটা দিল শর্বরী।

আমার! আমারও তাহলে বাবা আছে?

নিশ্চয়ই। আছে বৈকি।

আমার বাবা তবে কোথায় মা-মণি?

এবারে সহসা শর্বরীর দু চোখের কোল জলে ঝাপসা হয়ে আসতে চায়। জীবনে এত বড় কঠিন প্রশ্নের সামনে আজকের মত আর বুঝি তাকে কখনো দাঁড়াতে হয়নি। শিশুমনের কৌতূহলের জবাব ত তাকে দিতেই হবে।

কিন্তু কি জবাব দেবে সে আজ!

গৌতম আবার ডাকে, মা-মণি!

তিনি আছেন গৌতম! বড় হও, তুমি আরও বড় হও। সব কথা তারপর একদিন নিজেই জানতে পারবে।

ও বুঝতে পেরেছি, তিনি আমার সেই বিড়াল বাচ্চাটার মত খেলতে গিয়ে রাঁচির বাগানে হারিয়ে গেছেন আমি যখন খুব ছোট্টটি ছিলাম, তাই বুঝি মা-মণি!

হ্যাঁ।

তুমি কিছু দুঃখ করো না মা-মণি। দেখো আমি ঠিক তাকে খুঁজে বের করবো। তারপর এমন বকে দেবো! বলবো খেলতে গিয়ে হারিয়ে যাও কেন দুষ্টু ··

শর্বরী নিঃশব্দে ছেলের মাথায় হাত বুলাতে থাকে।

গৌতম দু হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে নার্সিংহোম থেকে শর্বরী সবে ফিরেছে, ডাঃ ঘোষালের প্রিয় ভৃত্য রাধু এসে জানাল, শর্বরীকে ডাঃ ঘোষাল একবার তাঁর ল্যাবরেটরিতে দেখা করতে বলেছেন।

সংবাদটা শুনে শর্বরী একটু আশ্চর্যই হলো!

এখানে এসে সে কাজে যোগদান করেছে আজ প্রায় এক মাস হতে চললো। এখানে আসবার পরই শর্বরী আনন্দকে বলেছিল ডাঃ ঘোষালের সঙ্গে একবার গিয়ে দেখা করবে। আনন্দ বলেছিল, তার কোন প্রয়োজন নেই, দরকার হলে

তিনিই ডেকে পাঠাবেন, এবং ডাঃ ঘোষাল একটু নিরিবিলি ও একাকী থাকতেই ভালবাসেন ; লোকজন তিনি আদপেই পছন্দ করেন না। তাই নিজের দিক থেকে ডাঃ ঘোষালের সঙ্গে একটিবার দেখা করা কর্তব্য মনে করলেও এবং ইচ্ছা থাকলেও ওদিকে আর যায়নি। এবং ডাঃ ঘোষালের কথা বলতে গেলে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সে।

আজ তাই সেই ডাঃ ঘোষালের কাছ থেকে যখন ডাক এলে, তখন শুধু সে বিস্মিতই নয়, কেমন যেন একটা আশঙ্কাও তার হলো।

আনন্দের কথা শুনেই সে ত এতদিন ডাঃ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করেনি, কিন্তু তিনি যদি শুধান, একবার এসে কি আমার সঙ্গে আপনার দেখা করা উচিত ছিল না! কি জবাব দেবে সে? ছি ছি, হয়ত খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে। কেন আনন্দের কথা শুনে অবশ্য কর্তব্যকে সে অবহেলা করলো!

যা হোক শর্বরী আর দেরি করলো না। কোনমতে চারটি মুখে গুঁজেই শর্বরী ডাঃ ঘোষালের কোয়ার্টারের দিকে অগ্রসর হলো।

দুপাশে লতার কেয়ারী করা যে সুরকিঢালা রাস্তাটা গেট থেকে শুরু হয়ে এগিয়ে এসেছে, তারই দুটো শাখা দুদিকে চলে গেছে। একটা গিয়েছে বিপ্রদাস নার্সিংহোমের করিডোরের নিচ পর্যন্ত—অন্যটা গেছে বাঁয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে একেবারে ডাঃ ঘোষালের কোয়ার্টারের সামনে।

দোতলা কোয়ার্টার।

নিচে বড় বড় তিনখানি ঘর, উপরে একখানি হলঘর ও পাশে মাঝারি গোছের একটি ঘর। উপরের হলঘরটিতেই ডাঃ ঘোষালের ল্যাবরেটরি। অন্য সংলগ্ন ঘরটি ডাক্তারের নিভৃত শয়নকক্ষ। নিচের ঘরগুলোর মধ্যে একটি লাইব্রেরী, একটি বসবার ঘর, অন্যটিতে থাকে ভৃত্য রাধু—সংসারের যাবতীয় গৃহস্থালি নিয়ে।

কোয়ার্টারের পেছনদিকে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত ফুলের বাগান। বাগানের ওপাশে সমুদ্রতীর।

দিনে বা রাত্রে কখনো-সখনো ডাক্তার ঐ বাগানের মধ্যে আপন খেয়াল খুশিতে একটু-আধটু ঘুরে বেড়ান। ল্যাবরেটরি তাঁর যেমন প্রিয়, বাগানটিও তেমনি। অনেক দুষ্প্রাপ্য দেশী ও বিলাতী ফুলের গাছ সেই বাগানে। যদিও বাগানটি দেখাশুনা করার জন্য দিবারাত্রের একটি মালী আছে, তবুও ডাক্তার নিজেও বাগানটির পরিচর্যা করেন।

সংসারের যাবতীয় সব কিছুর ভার ভৃত্য রাধুর উপরেই। প্রায় বছর দশেক সে আছে ডাক্তারের সঙ্গে। একজন ল্যাবরেটরি অ্যাসিসটেণ্ট আছে, সেও বাঙালী, এম. এস-সি. পাস রসায়নে। নাম নির্মল ঘোষ।

নির্মল নিচের লাইব্রেরী ঘরেরই একপাশে রাত্রে থাকে।

শর্বরী যখন ডাঃ ঘোষালের কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়াল তখন দেখলো রাধু দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় ওর অপেক্ষাতেই ছিল।

সোজা আপনি উপরে চলে যান। ডাক্তারবাবু ল্যাবরেটরিতেই আছেন—বলে রাধু নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। আর দাঁড়ালো না।

সামনেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি দোতলায় উঠে গিয়েছে। অদ্ভুত স্তব্ধ বাড়িটা। সূঁচ পড়লেও বোধ হয় শব্দ শোনা যায়।

কয়েকটা মুহূর্ত নিচের ধাপে দাঁড়িয়ে থেকে শর্বরী ধাপগুলো অতিক্রম করে উপরে উঠতে লাগল। সিঁড়িতে নিজের পায়ের চপ্পলের শব্দটা যেন নিজের কানেই বেশ্রী লাগছিল। চারিদিককার অস্বাভাবিক স্তব্ধতার মধ্যে সামান্য সেই শব্দটুকুও যেন বড্ড বেশী মনে হচ্ছিল।

সিঁড়িটা যেখানে দোতলায় এসে শেষ হয়েছে, তার সামনেই একটা সরু প্যাসেজ মত। তিনটি দরজা ও মধ্যে মধ্যে তার জানালা। জানালার পাল্লায় কাচের সার্শী বসানো। জানালার পাল্লাগুলো খোলা, কিন্তু তিনটি দরজার মধ্যে দুটো দরজার পাল্লা বন্ধ, একটিমাত্র খোলা। সেই খোলা দরজায় ঝুলছে সবুজ রঙের ভারী একটা পর্দা।

প্যাসজের উপরে দাঁড়াতেই একটা কটু উগ্র অ্যাসিডের গন্ধ নাকে এসে লাগল।

নিচের তলার মত উপরের তলাটাও অদ্ভুত স্তব্ধ।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল শর্বরী খোলা দরজাটার দিকে, এবং নিঃশব্দে পর্দা তুলে ভিতরে পা দিল।

লম্বা টানা একটা হলঘর।

চারিদিকে র‍্যাক্‌, আলমারি ও শেল্‌ফ, ঔষধ ও নানা জাতীয় জিনিসপত্র নানা আকারের শিশিতে বোঝাই। একপাশে রেফ্রিজারেটার পর পর দুটো, তারই একধারে অটো-ক্লেভ্‌। কাচের কেসে ওয়েয়িং অ্যাপারেটাস, একধারে খাঁচায় দশ-বারোটা সাদা ইঁদুর কিচ্‌কিচ্‌ করে ছুটাছুটি করছে। তার পাশে একটা খাঁচায় গোটাচারেক সাদা খরগোস।

সোঁ সোঁ একটা মৃদু শব্দ শোনা যায় বোধ হয় প্রজ্বলিত বুনসেন বার্ণারের।

লম্বা একটা টেবিল : তার উপরে মাইক্রোসকোপ্ ও নানা ধরনের বিচিত্র সব কাচের যন্ত্রপাতি। ঘরের অন্যপ্রান্তে একটা টেবিলের সামনে গোটা চার-পাঁচ বড় বড মোটা মোটা বই ছড়ানো, দীর্ঘ দেহ সাদা অ্যাপ্রন গায়ে কে একজন পুরুষ একটা উঁচু টুলের ওপরে বসে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছেন। আর লম্বা টেবিলটার সামনে অন্য একজন অল্পবয়সী যুবক বুন্‌সেন্ বার্ণারের স্ট্যাণ্ডের উপরে সাদা একটা বিকারে কি ফোঁটা ফোঁটা ফেলছে লম্বা একটা কাচের টিউবের সাহায্যে পাশের একটা বিকার থেকে নিয়ে মধ্যে মধ্যে।

শর্বরী প্রথমটায় কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। তারপর কি ভেবে পায়ে পায়ে টেবিলের সামনে টুলের উপরে উপবিষ্ট দীর্ঘ মূর্তির দিকে এগিয়ে গেল। কাছে, আরো কাছে এসে দাঁড়াল।

একটা সাদা খাতায় রসায়নের কি সব ফর্মুলা লিখে যাচ্ছেন উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি।

ধ্যানগম্ভীর সেই লোকটিকে ডাকতে শর্বরীর যেন কেন সাহসে কুলায় না। সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েই থাকে, মিনিটের পর মিনিট!

হঠাৎ একসময় তিনি মৃদুকণ্ঠে ডেকে উঠলেন, নির্মল!

এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে ফিরে তাকাতেই অদূরে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান শর্বরীর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে যেতেই রোমশ ভ্রূদুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। কালো চওড়া ফ্রেমের মধ্যে পুরু একজোড়া লেন্সের ওধারে তীক্ষ্ণ এক জোড়া চোখের মণি বিরক্তিতে যেন ছোট হয়ে গেল।

কে! কে তুমি? কি চাও, হোয়াই ইউ হ্যাভ কাম্ হিয়ার! হু। হু আস্কড ইউ টু এন্‌টার ইন দিস্ রুম?

নির্মল ততক্ষণে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছিল।

আচম্‌কা ডাঃ ঘোষালের কথার আক্রমণে শর্বরী যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। কি জবাব দেবে, কি বলবে কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারে না।

ডোণ্ট স্ট্যাণ্ড দেয়ার লাইক এ ফুল! কে? কে তুমি?

শর্বরী নির্নিমেষে ডাঃ ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল, তৈলহীন রুক্ষ। প্রশস্ত কপাল। উন্নত নাসা। চওড়া দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল, নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো। কপালের রেখাগুলি বিরক্তিতে কুঞ্চিত। সমগ্র চোখেমুখে একটা নির্দয় রুক্ষ কাঠিন্য যেন অত্যন্ত স্পষ্ট। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। গায়ের বর্ণ শ্যাম। গেঞ্জির উপর

বোতামখোলা অ্যাপ্রন। গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে বক্ষের রোমরাজি উঁকি দিচ্ছে! পরিধানে ঢোলা পায়জামা ও পায়ে রবারের চপ্পল।

হু হজ শী নির্মল! ওকে কে এখানে ঢুকতে দিল!

আমি—বলতে গিয়েও থেমে যায় শর্বরী।

কে! কে তুমি?

আমি ডাঃ শর্বরী রায়—বিপ্রদাস নার্সিংহোমে নতুন চাকরি নিয়ে এসেছি।

বিপ্রদাস নার্সিংহোমে চাকরি নিয়ে এসেছো—তা এটা কি নার্সিংহোম! দেখতে পাচ্ছ না এটা ল্যাবরেটরি!

জানি, কিন্তু আপনি যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তোমাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম! নো! হোয়াই শুড আই? আই হ্যাভ নেভার ইভন্ সীন্ ইওর ফেস্ ইন লাইফ্! যাও! যাও, বিরক্ত করো না—বলেই চিৎকার করে ওঠেন, রাধু! রাধু। এই বেয়াদব রাধু, ওকে আজই তাড়িয়ে দেবো! বলতে বলতে হঠাৎ নির্মলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, এনজাইমটা বের হলো নির্মল!

শর্বরীর উপস্থিতি সম্পর্কে হঠাৎ যেমন সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি হঠাৎই যেন তাকে একেবারে সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন!

না। এখনো সামান্য সেডিমেন্ট পড়ছে। নির্মল জবাব দেয়।

ভাইটামিন ডি টু কত ইউনিট দিলে?

টোয়েন্টি থাউসাও্ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট! নির্মল বলল।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ভৃত্য রাধু ছুটে এল। এসে বললে, আমাকে ডাকছিলেন?

ডাকছিলাম তোকে? না ত! বলেই ফিরে তাকালেন ডাঃ ঘোষাল আবার শর্বরীর দিকে, এখনো আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন! কি চান আপনি! দেখছেন আমি ব্যস্ত—

শর্বরী অসহায়ের মত এবারে রাধুর মুখের দিকে তাকাল। এতক্ষণে সে যেন ডাঃ ঘোষালের চরিত্র কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। সে এবারে রাধুকেই লক্ষ্য করে মৃদুকণ্ঠে বললে, উনি ডেকেছেন তুমি আমাকে বলে এসেছিলে না!

আজ্ঞে হ্যাঁ! বলেই রাধু এবারে ব্যাপারটা বোধ হয় কিছুটা বুঝতে পারে। কারণ এই দীর্ঘ দশ বৎসরের সাহচর্যে মনিব-চরিত্র তার বুঝতে বাকী থাকেনি। সে-ই এবারে বললে, ডাক্তারবাবু, আপনি ত ওঁকে ডেকেছিলেন।

আমি ডেকেছিলাম!

হ্যাঁ, আপনি তখন খাবার টেবিলে বসে বললেন না, হাসপাতালে যে নতুন ডাক্তার এসেছেন তাঁকে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বলতে।

বলেছিলাম ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন বলেছিলাম বল্ ত রাধু!

দেখুন না মনে করে !

এবারে ডাঃ ঘোষাল নির্মলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, নির্মল তুমি জান, ওঁকে কেন ডেকেছিলাম।

আজ্ঞে বোধ হয় ত—নির্মল আমতা আমতা করে।

খিঁচিয়ে উঠলেন যেন ডাঃ ঘোষাল এবারে বিরক্তিতে, জান না! তা জানবে কেন ? একটা ব্যাপারেও যদি তোমার পরামর্শ পাই। কি কর বল ত যে সব ভুলে বসে থাকো! যাও! নিজের কাজ করো গে! কালকের ক্যালকুলেশনটা সব আজ আমাকে কমপ্লিট্ করে দেবে। যাও!

নির্মল চলে গেল তার জায়গায়।

এবারে ফিরে তাকালেন শর্বরীর দিকে আবার ডাঃ ঘোষাল। বললেন, এস্টিমেশন করতে পারবেন একটা ?

এস্টিমেশন ?

হ্যাঁ। ঐ দেখুন টেবিলের উপরে ঐ বিকারটায় একটা স্লুশন আছে। সুগারটা এস্টিমেশন করে বলুন কত প্যার্সেন্টেজ আছে। যান! বলেই আর দ্বিরুক্তি না করে ডাঃ ঘোষাল নিজের টুলটার উপরে বসে একটা মোটা বই সামনে টেনে নিলেন। ধ্যানমগ্ন হলেন আবার।

শর্বরী কিছুক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো ডাঃ ঘোষালের দিকে কিন্তু সে মানুষ যেন আর বাস্তবে নেই। আপন ধ্যানে নিমগ্ন।

তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় মৃদু একটা হাসির রেখা জেগে ওঠে তার ওষ্ঠপ্রান্তে। এবং ধীরে ধীরে সে টেবিলের নির্দিষ্ট জায়গায় এগিয়ে গেল।

একটা বিকারে খানিকটা তরল পদার্থ ছিল ঈষৎ হলদে রংয়ের। বিকারটার দিকে তাকিয়ে দেখছে, এমন সময় পাশে নিঃশব্দে দাঁড়ালো এসে নির্মল এবং নিম্নকণ্ঠে ডাকল, শুনুন!

ফিরে তাকাল শর্বরী নির্মলের মুখের দিকে, আমাকে বলছেন ?

হ্যাঁ। ডাঃ ঘোষাল যা বললেন—এস্টিমেশন কয়া আপনার অভ্যাস আছে ?

বোধ হয় পারবো।

পারবেন ?

হ্যাঁ, আপনি কেবল বলে দিন রিএজেন্ট্ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কোথায় পাবো।

মুহূর্তের জন্য নির্মল যেন কি ভাবল। তারপর পাশের একটা র‍্যাক্ দেখিয়ে বলল, আপনার যা প্রয়োজন ঐ র‍্যাকেই সব পাবেন।

কতকটা কৌতূহলের সঙ্গেই কথাটা বলে নির্মল পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল শর্বরী কি করে। কিন্তু নির্মল ত জানত না যে, শর্বরী যেমন সাধারণ ছাত্রী ছিল না, তেমনি তার দীর্ঘ চার বৎসর কেটেছে বিখ্যাত ডাঃ নির্বাণ চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে—বলতে গেলে প্রায় দিন ও রাত্রির বেশীর ভাগ সময়ই। ডাঃ চৌধুরী গত কয়েক বৎসর ধরে যে একটা ব্যালেন্সড বেবীফুড নিয়ে রিসার্চ করছিলেন, সেই ব্যাপারে শর্বরীই তাঁকে অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে সর্বদা সাহায্য করছিল। সেজন্য তার পড়াশুনাও যেমন আছে, তেমনি হাতেনাতে কাজ করবার দরুন অভিজ্ঞতাও কিছু সঞ্চিত হয়েছিল ল্যাবরেটরির কাজে এবং আরো একটা কথা—ঐ ধরনের কাজ করতে করতে শর্বরীর মনে একটা আকর্ষণও দানা বেঁধে উঠেছিল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার।

শর্বরী কাজ শুরু করে দিল। এবং কাজ করতে করতে সমস্ত জগৎ যেন তার কাছে লুপ্ত হয়ে গেল। সে ভুলে গেল নার্সিংহোমে তার কাজ আছে। সেখানে তাকে যেতে হবে।

ক্রমে বেলা ফুরিয়ে গেল। রৌদ্র ঝিমিয়ে এলো। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

শেষ পর্যন্ত রাত প্রায় আটটা নাগাদ এস্টিমেশন শেষ হলো শর্বরীর।

একটা কাগজে সুগারের পারসেনটেজটা লিখে নিয়ে শর্বরী এসে দাঁড়াল ডাঃ ঘোষালের পাশে।

ডাঃ ঘোষাল তখন একটা টেস্ট্‌টিউবে কি একটা তরল পদার্থ হিট করে তার মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা একটা রিএজেন্ট্ মেশাচ্ছিলেন।

শর্বরী মৃদুকণ্ঠে ডাকল, ডাঃ ঘোষাল!

ইয়েস্!

এস্টিমেশনটা হয়েছে। 67% সুগার আছে।

গুড্! ভেরি গুড্! বলেই টেস্ট্‌টিউবটা হাতে—শর্বরীর দিকে ফিরে

তাকিয়েই বললেন, আপনি!

ডাঃ শর্বরী রায়। পাশ থেকে বলে উঠ্‌লো নির্মল।

ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে। তাহলে আপনি এসব কাজ জানেন ডাঃ রায়?

সামান্যই জানি। ডাঃ নির্বাণ চৌধুরীর সঙ্গে—

হ্যাঁ। হ্যাঁ—ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে আপনি রিসার্চ করছিলেন সাহা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন। ডাঃ সাহাই ত আপনাকে আমার নার্সিংহোমের জন্য রেকমেণ্ড করেছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

ইয়েস্। এখন আমার মনে পড়েছে। আজ আবার সাহার একটা চিঠি পেয়েছি সকাল বেলা। আমি একটা বেবীফুড বের করবার চেষ্টা করছি। তাকে লিখেছিলাম তাই সে আপনার কথা লিখেছে এক জায়গায়। হ্যাঁ তাই। তাই ত আপনাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

শর্বরী চুপ করেই থাকে।

আপনি ত আমার বিপ্রদাস নার্সিংহোমে কাজ করছেন ডাঃ রায়, তাই না?

হ্যাঁ।

কতদিন এসেছেন?

তা প্রায় মাসখানেক হলো।

ডু ইউ লাইক মাই নার্সিংহোম?

হ্যাঁ। খুব ভালই লাগছে আমার।

দেন ইউ লাইক ইট্, ইউ নো ডাঃ রায়, এই বিপ্রদাস নার্সিংহোম নিয়ে আমার একটা স্বপ্ন ছিল, কিন্তু মাঝখানে এই কাজটা ঘাড়ে চাপায় ওদিকে একদম নজর দিতে পারি না। প্র্যাক্‌টিক্যালি আনন্দই এখন দেখছে সব কিছু। ভেবেছিলাম একদম বিনা পয়সায় বা সামান্য মাত্র চার্জ নিয়ে দুঃস্থ গরীব যারা তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো আমার বিপ্রদাস নার্সিংহোমে, কিন্তু পারলাম না। কিন্তু কেন পারলাম না, জানেন?

বিস্মিত শর্বরী তাকিয়ে থাকে ডাঃ ঘোষালের মুখের দিকে।

পারলাম না, কারণ নার্সিংহোম সাজাতেই আমার হাতে যা ছিল সব প্রায় ফুরিয়ে এলো, দ্বিতীয়তঃ এমন কাউকে পেলাম না যার ও ব্যাপারে এতটুকু সহানুভূতিও আছে। আজব চিজ এই ধনীগুলো আমাদের দেশের ডাঃ রায়। বিচিত্র এক ধাতুতে গড়া। দেশে অনেক বড় বড় ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী আছে যারা ইচ্ছা করলেই তাদের আয়ের সামান্য উদ্বৃত্ত থেকে অনায়াসেই দু-দশ লাখ

টাকা এসব কাজে দিতে পারে; কিন্তু আশ্চর্য ঠিক এই জায়গাতেই তাঁরা তাঁদের হাত গুটিয়ে নেয়, অথচ দেখুন বছরে একশটা বাজে ছবি করে তারা দশ লাখ পঁচিশ লাখ টাকা খরচ করছে অথচ দেশের লোক যে বিনা চিকিৎসায়, ঔষধের অভাবে, ভাল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, শিক্ষার অভাবে মরে হেজে যাচ্ছে, সেদিকে এতটুকু খেয়াল নেই বা এতটুকু নজর নেই। শুধু তাই নয়, নিজেদের হাত গুটিয়ে ত নেয়ই—সেই সঙ্গে তারাই আবার তাদের প্রয়োজনে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিতে এসে নির্লজ্জের মত ভিড় জমায় টাকা দিয়ে—গরীব যারা, নীড়ি যারা, তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে। তাই দেখতে দেখতে নার্সিং-হোমগুলোতে হয় তাদেরই একচেটিয়া অধিকার। তারা না দেবে টাকা, না দেবে সেখানে গরীবদের প্রবেশাধিকার। দুনিয়ার যত কিছু ভাল, যত কিছু সুখ-সুবিধা-সুযোগ, তাতে যেন ওদেরই কেবল জন্মগত একচেটিয়া অধিকার! উচ্চতর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিদেশীর দেওয়া যত বৃত্তি এদেশে আছে, তার মধ্যেও তারা দাঁত বসাবে। যত ধনী, প্রতিপত্তিশালী তাদেরই সন্তান ও আত্মীয়বর্গ পাবে বৃত্তি। নিজেরা ত দেবেই না, পরে যা দেবে তার মধ্যেও আধিপত্য বিস্তারের নোংরামি। তাই বুঝলেন, তাই সরে এসেছি দূরে। মিথ্যে পণ্ডশ্রমে লাভ কি!

॥ ৫ ॥

রাত প্রায় নটা নাগাদ নিজের কোয়ার্টারে ফিরতে ফিরতে শর্বরী ডাঃ ঘোষালের কথাই ভাবছিল। ভাবছিল কতবড় অনুভূতির ফল্গুই না নিঃশব্দে বয়ে চলেছে লোকটার মনের নিভৃতে, বাইরের ঐ রুক্ষ কর্কশ প্রকৃতির অন্তরালে।

নিজের কোয়ার্টারের দোরগোড়ায় আসতেই আনন্দর কণ্ঠস্বরে ওর চমক ভাঙল।

ডাঃ রায়!

কে! ও ডাঃ আনন্দ! কি খবর?

সেই দুপুর থেকে আপনি কোথায় ছিলেন? দশবার দাইকে পাঠিয়েও আপনার সংবাদ না পেয়ে ঘণ্টাখানেক হলো নিজেই এসে আপনার অপেক্ষায় বসে আছি। কোথায় গিয়েছিলেন বলুন ত?

ডাঃ ঘোষাল ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

আর এদিকে দু-দুটো কেস এসে হাজির নার্সিংহোমে!

কি কেস?

একটি থ্রেটেণ্ড অ্যাবরসন, আর একটি অ্যাকলামসিয়া।

আমি দুঃখিত, চলুন যাই।

এক মুহূর্তও আর শর্বরীর বিশ্রাম নেওয়া হলো না। তখুনি সে চলল আবার নার্সিংহোমের দিকে। দু পাও বোধ হয় অগ্রসর হয়নি, পিছন থেকে জানকীর গলা শোনা গেল—মাঈজী ?

চলতে চলতে ফিরে দাঁড়াল শর্বরী, জানকী! কি রে ?

সেই দুপুরে খেয়েছিলে, এখন পর্যন্ত কিছুই খেলে না!

কথাটা শুনে আনন্দও লজ্জিত হয়।

সে বলে, ছি ছি, আমি ত তা জানতাম না। আপনি বরং কিছু খেয়ে নিন, আমি একটু বসছি।

না। না—সে হবে'খন, আপনি চলুন—

নাছোড়বান্দা জানকী, সে বলে, চা খেয়েছো, না তাও খাওনি! সারারাত ত তারপর মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করবে'খন।

না। চলুন মিস্ রয়, রোগিণীদের প্রাথমিক চিকিৎসা আমি করেই এসেছি। দু-চার মিনিট দেরি হলে বিশেষ তেমন ক্ষতি হবে না। আপনি চা আর কিছু খেয়ে নেবেন চলুন।

কিন্তু—

না, চলুন। আমারও চায়ের পিপাসা পেয়েছে।

মৃদু হেসে শর্বরী বলে, বেশ। চলুন তবে এক কাপ করে চা-ই না হয় খেয়ে যাওয়া যাক।

দুজনে এসে বাইরের ঘরে বসল।

গৌতম মায়ের সাড়া পেয়ে ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে দু হাতে মাকে জড়িয়ে ধরল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ মা-মণি ? তারপর হঠাৎ মায়ের পাশে আনন্দকে দেখে বলে ওঠে, আপনি! আমার সেই জাহাজটা তৈরি করেছেন ?

হ্যাঁ, তৈরি হচ্ছে!—আনন্দ হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

বিস্মিত শর্বরী আনন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, জাহাজ! কিসের জাহাজ ডাঃ আনন্দ ?

জানেন না বুঝি! গৌতমবাবুকে যে আমি প্রমিস করেছি একটা জাহাজ তৈরি করে দেবো। তারপর সেই জাহাজে চেপে—কে কে যেন যাবে গৌতমবাবু ?

আমি, মা-মণি আর আপনি। রবিনসন ক্রুসোর মত সেই জাহাজে চেপে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে প্রথমে যাবো কোথায় জান ?

কোথায়? এবারে শর্বরীই শুধায়।

লিলিপুটিয়ানদের দেশে গ্যালিভারের মত।

তারপর?—

তারপর যাবো সেই দৈত্যদের দেশে!

আপনার সঙ্গে বুঝি গৌতমের ভাব হয়ে গিয়েছে? শর্বরী আনন্দের দিকে চেয়ে বলে।

হ্যাঁ। আপনাকে বলাই হয়নি ডাঃ রায়, ওর সঙ্গে আমার বেজায় ভাব হয়ে গিয়েছে। হাসতে হাসতে আনন্দ বলে।

জান্‌কী ট্রেতে করে চা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। সঙ্গে একটা প্লেটে কিছু পেসট্রি ও স্যাণ্ডউইচও ছিল। শর্বরীই চা তৈরি করে এক কাপ এগিয়ে দেয় আনন্দের দিকে, এক কাপ নেয় নিজে।

জান্‌কী গৌতমকে বলে, চল খোকাবাবু, খাবে চল।

এখন আমি খাবো না। গৌতম প্রতিবাদ জানায়ঃ এখন আমি গল্প শুনবো।

না। এখন আর গল্প নয়। তোমার খাবার সময় হয়েছে গৌতম। যাও খেয়ে শুয়ে পড়গে। শর্বরী বলে।

আর তুমি!

আমি! আজ আমার একটু কাজ আছে। জান্‌কী আজ তোমাকে ঘুম পাড়াবে।

না।

ছি গৌতম। যাও—

গৌতম আর দ্বিরুক্তি করে না। জান্‌কী সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শর্বরীও আনন্দকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল হাসপাতালে যাবার জন্যে।

পথ দিয়ে যেতে যেতে একসময় মৃদুকণ্ঠে আনন্দ ডাকল, ডাঃ রায়!

আমাকে কিছু বলছিলেন ডাঃ আনন্দ!

হ্যাঁ। একটা অনুরোধ আছে।

বলুন না।

আপনি আমাকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলে ডাকলে আমি কিন্তু খুব খুশি হবো।

কিন্তু—

না। 'আপনি' ডাকটার মধ্যে যেন কেমন একটা সম্ভ্রম, একটা দূরত্ব—একটা স্পর্শকাতরতা আছে। আপনি আমাকে তুমি বলে—কেবল আনন্দ বলেই ডাকবেন।

তাহলে আপনিও আমাকে 'তুমি' বলেই ডাকবেন।

আমি!

হ্যাঁ। যদি আমি আপনাকে 'তুমি' বলি, আপনিও আমাকে বলবেন 'তুমি'।

বেশ।

দুজনে সোজা নার্সিংহোমের দোতলায় প্রথমে ৩নং কেবিনে, তারপর ৫নং কেবিনে প্রবেশ করে রোগিণীদের পরীক্ষা করল। একলামসিয়া কেসটা ঔষধের প্রভাবে তখন ঘুমাচ্ছে।

নার্স বললে, আর কোন তড়কা হয়নি।

কিন্তু থেটেও অ্যাবরসন কেসটা তখুনি ও-টিতে নিয়ে যাবার প্রয়োজন, শর্বরী বললে।

নার্সকে সব প্রস্তুত করতে বললে।

অপারেশন শেষ করে শর্বরী কোয়ার্টারে ফিরল যখন রাত তখন পৌনে এগারটা।

প্রথমেই গিয়ে ঢুকল শয়নঘরে।

মেঝেতে জান্‌কী ঘুমিয়ে। আর শয্যার উপরে চোখ বুঁজে পড়ে আছে গৌতম। ঘরের উজ্জ্বল আলোটা নিবানো।

জ্বলছে ডোমে ঢাকা নীলাভ আলোটা।

একটিবার মুদ্রিতচক্ষু গৌতমের মুখের দিকে তাকাল শর্বরী। যাক্! ঘুমিয়ে পড়েছে। স্নানের ঘরে ঢুকে স্নান করে জামাকাপড় বদলিয়ে জান্‌কীকে তুলে দেবার আগে আর একবার এসে দাঁড়াল গৌতমের সামনে শর্বরী।

এবারে ভাল করে তাকাতেই নজরে পড়ল, মুদ্রিত চোখের পাতা দুটো যেন মৃদু মৃদু কাঁপছে।

নিঃশব্দে সস্নেহে ডান হাতখানি আলতোভাবে গৌতমের কপালে স্পর্শ করতেই গৌতম চোখ মেলে তাকাল।

মা-মণি!

ওরে দুষ্টু! চোখ বুঁজে পড়েছিলে, ঘুমাওনি তুমি?

সেই গল্পটা মা-মণি!

পাশে বসে পড়ে শর্বরী পুত্রের রেশমের মত চুলগুলিতে নিঃশব্দে হাত বুলাতে বুলাতে বললে, কোন্ গল্পটা শুনি?

এই যে একলব্যের গল্প!

এদিকে শর্বরীর কণ্ঠের সাড়া পেয়ে জান্‌কী ততক্ষণে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। সে বললে, মাঈজী! কখন ফিরলে মাঈজী! ও কি খোকাবাবু এখনও ঘুমায় নি!

মৃদু হেসে পুত্রের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে শর্বরী বললে, না। তুই টেবিলে আমার খাবার দে।

কি দুষ্টু দেখেছো মাঈজী। বললে, জান্‌কী তুইও ঘুমো, আমিও ঘুমাই! চোখ বোঁজ। আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আর ও দিব্যি জেগে!…

তুই যা, খাবার দে।

জান্‌কী চলে গেল।

॥ ৬ ॥

রাত আরো অনেক হয়েছে।

ঘুমিয়ে পড়েছে গৌতম। শিয়রের কাছে ডোমে ঢাকা মৃদু নীলাভ আলোর খানিকটা ওর ঘুমন্ত মুখের ওপরে যেন স্বপ্নের মতই ছুঁয়ে আছে।

শর্বরী খোলা জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। দূরে সমুদ্র, নিশীতের অন্ধকারে একটানা গর্জন করে চলেছে। যেন মনে হয় কার চাপা কান্নার শব্দ।

গৌতমকে এবারে কিণ্ডারগার্টেনে ভর্তি করা প্রয়োজন। কাজের চাপ ক্রমশই যেমন বেড়ে চলেছে, এর পর আর শর্বরী ওকে দেখাশোনা করবার হয়ত আদপে সময়ই পাবে না। অথচ গৌতমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখন থেকেই সচেতন না হলে ত চলবে না।

কিন্তু আজ যেন ঘুম কিছুতেই আসছে না।

সকাল থেকে কাজের ভিড়ে আজকের সংবাদপত্রটাও পড়া হয়নি শর্বরীর। টেবিল ল্যাম্পটা জেলে সংবাদপত্রটা টেনে নিল শর্বরী।

প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইন নিউজগুলোতে চোখ বুলিয়ে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আসতেই একটি ফটোর উপরে দৃষ্টি তার হঠাৎ স্থিরনিবদ্ধ হলো।

শৈবাল, শৈবালের ফটো!

বিলাত প্রত্যাগত ডাঃ শৈবাল ঘোষের হাসপাতালে নতুন অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের নিউজ ছাপা হয়েছে।

বিলাত থেকে এম. আর. সি. পি. ও টি. ডি. ডি. হয়ে ফিরেছে শৈবাল এবং তাদের হাসপাতালেই জুনিয়ার ভিজিটিংয়ের পোস্টে অ্যাপয়েণ্ট্‌মেণ্ট পেয়েছে।

নিনিমেষে চেয়ে থাকে ছবিটার দিকে শর্বরী।

মধ্যরাত্রির এই স্তব্ধতায় কেউ পাশে নেই। কেউ জেগে নেই। মুখোমুখি সে আর শৈবাল!

বিলেত থেকে ফিরে দুজনে মনোমত একটা নার্সিংহোম খুলবো আমরা শৈবী! কাজ করবো সেখানে তুমি আর আমি পাশাপাশি। পরস্পরকে দেবো উৎসাহ! শৈবাল কতদিন বলেছে তাকে।

কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল। কক্ষচ্যুত দুটি নক্ষত্রের মত দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়ল। দূরে কতদূরে আজ তারা পরস্পর পরস্পর থেকে। আর এ জীবনে কখনো তারা একে অন্যের নগাল হয়ত পাবে না।

কেন এমন হলো! কেন তারা পরস্পরকে পেয়েও পেল না।

মুখ তুলে তাকাল শর্বরী অদূরে শয্যায় শায়িত ঘুমন্ত গৌতমের মুখের দিকে। আজ হয়ত তারা দুজনেই দুজনের কাছে মৃত।

তাদের অতীতের কেবল শেষ চিহ্ন রয়েছে ঐ গৌতমের মধ্যে। ঐ গৌতমের মধ্যেই রয়েছে আজও অতীতের শৈবাল ও শর্বরী দুজনাই বেঁচে। আর সব গেছে হারিয়ে।

না। না—এসব কি সে ভাবছে! কেউ নয় শৈবাল তার! কেউ নয়!

কিন্তু সে রাত্রে ঘুমের মধ্যেও বার বার শৈবাল যেন তার সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল।

কেবলই ডাকতে লাগলো, শর্বরী! শবী শোন! যেও না, দাঁড়াও, শোন!

বার বার শর্বরীর ঘুম ভেঙে যেতে লাগল।

॥ ৭ ॥

ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে সেই যে বাড়িতে ঢুকেছিল শৈবাল, দশ-পনের দিনের মধ্যে কোথায়ও আর বেরও হলো না।

হাওড়া স্টেশনে যে কয়জন পরিচিত বন্ধু-বান্ধব তাকে রিসিভ করতে এসেছিল তারা বাদে অনা দু-তিন জন বাড়িতে এসেছিল দেখা করতে। তাদের সঙ্গেই যা দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল। আর কারো সঙ্গেই সে নিজে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্ত করেনি।

বাবার অসুখটা তখন কমের দিকে। হাইপারটেনসন ছিল বাবার, একটা

মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছিল। ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। একবার হাসপাতালে যাওয়া দরকার। বাবার বন্ধু ডি. এইচ. ও. প্রফেসার বোসের সঙ্গে দেখা করা একবার বিশেষ প্রয়োজন, তাও সে দেখা করেনি।

আসল কথা কোন কাজেই যেন শৈবাল এতটুকু উৎসাহ পাচ্ছিল না।

কত আশা মনে মনে ছিল তার, বিলাত থেকে ফিরে এসে সে ও শর্বরী নতুন-জীবন শুরু করবে, কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল!

কোথায় চলে গেল শর্বরী। কোন্ অজ্ঞাতবাসের অন্ধকারে নিজেকে সে লুপ্ত করে দিল।

শর্বরী! শর্বরী! আর কি সত্যি সত্যিই তার দেখা এ জীবনে পাওয়া যাবে না!

পরক্ষণেই মনে হয়, পাবে, পাবে নিশ্চয়ই সে আবার দেখা তার শর্বরীর। শর্বরীকে ফিরে আবার একদিন আসতেই হবে তার কাছে। শুধু তো শর্বরীই নয়, তার অন্তর হতে অন্তরতম, প্রিয় হতে প্রিয় আজও আছে শর্বরীর কাছেই। তার আত্মজ, তার সন্তান। তার ও শর্বরীর প্রেমের গন্ধপুষ্পটি। ছেলেই হোক মেয়েই হোক, আজ সে পাঁচ বছরের হয়েছে।

হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো।

ভৃত্য পরেশ এসে ঘরে ঢুকলো, দাদাবাবু!

কি রে পরেশ?

একজন মেমসাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

মেমসাহেব! মেমসাহেব আবার কে এলো! বিস্মিত শৈবাল প্রশ্ন করে।

তা কি করে জানবো। দেখুন না নিচে গিয়ে।

বসতে দিয়েছিস?

হ্যাঁ।

আচ্ছা তুই যা, আমি যাচ্ছি।

পায়জামা ও গেঞ্জির উপরে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে শৈবাল নিচে নেমে এলো।

বাইরের ঘরে ঢুকেই কিন্তু থমকে দাঁড়াল।

সিস্টার জেইমী ব্রাক্। ওদের কলেজ হাসপাতালের অত্যন্ত পরিচিত স্টাফ-নার্স। [illegible] এতক্ষণে সিস্টার ব্রাক্ও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

কেন যে পরেশ ব্রাক্কে মেমসাহেব বলে পরিচয় দিয়েছিল বুঝতে পারে এতক্ষণে শৈবাল। ব্রাকের পরিধানে বাঙালীর মত শাড়ি থাকলেও তার গায়ের

রংই পরেশকে বিভ্রান্ত করেছিল।

অ্যাংলো নেপালী মেয়ে সিস্টার ডেইজী। টকটকে গৌরবর্ণ গায়ের রঙ। রোগা ছিপছিপে দেহের গঠন। চোখেমুখে একটা মঙ্গোলিয়ান ছাপ। চ্যাপটা নাক, ছোট ছোট চোখ।

ডেইজী!

গুড্ ইভনিং ডক্টর ঘোষ।

বোস। বোস—তারপর কি খবর!

ডেইজী একটা সোফার ওপরে বসতে বসতে বলে, ভেবেছিলাম হাসপাতালেই দেখা হবে, কিন্তু এ কদিনেও যখন গেলে না নিজেই এলাম—

তারপর তোমাদের এখানকার কি খবর বলো!

আমাদের আবার খবর কি! জাতিচ্যুত সেবাদাসী নার্সের দল।

ডেইজীর কণ্ঠস্বরে যেন একটা করুণ বিষণ্ণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শৈবাল ডেইজীর মুখের দিকে তাকায়।

সঙ্গে সঙ্গে আচমকা মনে পড়ে যায় রমেন্দ্র সেন—ওদের সতীর্থের কথা।

রমেন্দ্র এখন বিলাতেই আছে। এখানে আসবার কিছুদিন আগেও রমেন্দ্র তার ইউরোপীয়ান স্ত্রী হসাবেলাকে নিয়ে ওর হোটেলে দেখা করতে এসেছিল।

এফ. আর. সি. এস. দেবার জন্য বছর তিনেক আগে রমেন্দ্র বিলাত গিয়েছিল। গত বছর ফেলোসিপ সে পেয়েছেও। কিন্তু শীঘ্র আর বোধ হয় ফিরবে না ভারতবর্ষে।

গ্লাসগোর একটা হাসপাতালে চাকরি নিয়েছে এবং বিবাহও করেছে একজন ইউরোপীয়ান ভদ্রমহিলাকে।

অথচ—

আবার তাকাল শৈবাল সিস্টার ডেইজীর দিকে।

এক বছরে যেন ডেইজীই আরো রোগা হয়ে গিয়েছে।

ফিফথ্ ইয়ারে যখন ওরা পড়ে, যেবার রুমে ওর আর রমেন্দ্রের ডিউটি পড়েছে, ঐ সিস্টার ডেইজী ছিল সেখানে সিস্টার-স্টাফ-নার্স।

চমৎকার মেয়েটি।

সেই সময়ই ওদের পরিচয় হয় ডেইজীর সঙ্গে এবং রমেন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়টা ক্রমশ বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ডেইজীর। ঘনিষ্ঠতাটা উভয়ের এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল শেষের দিকে যে সে সময় সিস্টার মহলে ও ডাক্তারদের মহলে সকলেই জেনেছিল অদূর ভবিষ্যতে উভয়ের সম্পর্কটা সুনিশ্চিত হবে।

রমেন্দ্ররই সুবিধার জন্য, সে তখন হাউস স্টাফ, ডেইজী সিস্টারস্ মেস ছেড়ে দিয়ে আলাদা একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া নিয়েছিল নিজের ব্যয়ে। এবং সে ফ্ল্যাটে কত রাত্রে ডেইজীর হাতে তৈরী চিকনকারী ও টোস্ট্ খেয়ে এসেছে শৈবাল ও তাদের আরো দু-চারজন বন্ধু-বান্ধব। ডেইজীকে শেষের দিকে তো তারা মিসেস্ সেন বলেই ডেকেছে। আর কেউ না জানুক, শৈবাল জানতো রমেন্দ্রের বেশীর ভাগ রাত ডেইজীর সেই ফ্ল্যাটেই কেটেছে।

শৈবালের মাসছয়েক আগে রমেন্দ্র বিলেত গিয়েছিল।

সী অফ্ করতে ওরা সেরাত্রে স্টেশনে অনেকেই গিয়েছিল, গাড়ি ছাড়ার আগে ডেইজীর সেদিনকার প্রবহমান অশ্রুধারা আজও শৈবালের চোখে স্পষ্ট হয়ে আছে।

তাই বিলেতে যাবার মাসচারেক পর রমেন্দ্রের সঙ্গে শৈবালের যখন দেখা হলো এবং শৈবালকে রমেন্দ্র তার গৃহে এক রাত্রে আমন্ত্রণ জানালো, তার ওখানে গিয়ে ইসাবেলাকে দেখে ও তার পরিচয় পেয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল শৈবাল।

সে-রাত্রে রমেন্দ্রের গৃহে ভাত ও মুর্গীর ঝোল কুইনিনের চাইতেও বিস্বাদ ঠেকেছিল শৈবালের মুখে।

তাই আজ ডেইজীকে দেখে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে শৈবাল বেদনায় মূক হয়ে গিয়েছিল, এবং সে বেদনা আরো মর্মান্তিক হলো যখন ডেইজী প্রশ্ন করলো, রমেন্দ্রকে কেমন দেখলে ডক্টর ঘোষ। সে ভাল আছে তো।

আছে।

তার বৌ, ইসাবেলা?

তুমি—তুমি জানো ডেইজী, সে বিয়ে করেছে সেখানে?

হ্যাঁ।

তা সত্ত্বেও তুমি আজও তার কথা মনে রেখেছো?

ভোলাই উচিত ছিল, তাই না? মৃদু করুণ হেসে পাল্টা প্রশ্ন করে ডেইজী। তারপর মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে আরো মৃদুকণ্ঠে বলে, কিন্তু কই ভুলতে পারি নি তো।

কিন্তু—

না ডক্টর ঘোষ! সে যদি ইসাবেলাকে বিয়ে করে সুখী হয়ে থাকে হোক না! সে সুখী হোক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সত্যই যেন সে সুখী হয়।

ডেইজী!

কি! ভাবছো আমার কথা নয়! কিন্তু আমি তার কথাই ভাবি! সে অত্যন্ত সুখী আর অভিমানী! ওদেশের মেয়ে ইসাবেলাকে পারবে কি রমেন্দ্র মন রেখে চলতে? ওদেশের মেয়েদের তো জানি, নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে খুব কম মেয়েই ওদের মধ্যে আছে যারা সেটাকে হাল্কা চোখে দেখতে পারে।

উঃ কি স্কাউণ্ড্রেল রমেন্দ্রটা, শৈবাল ভাবে মনে মনে, এমন মেয়ের সঙ্গেও লোকে প্রতারণা করতে পারে।

কিন্তু নার্স ডেইজীর প্রতি ডাঃ রমেন্দ্রর ঐ ধরনের প্রতারণার ব্যাপারটাই ত ঐ শ্রেণীর হীন মনোবৃত্তির একমাত্র নজীর নয়! হাসপাতালের জীবনে ছাত্র নার্স ও নার্স ডাক্তারের জীবনের মিলিত কর্মক্ষেত্রে অবাধ সুযোগের মধ্যে ওটা ত একটা অত্যন্ত পরিচিত ব্যাপার। স্বাভাবিক ঘটনা।

বয়সের ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাজ করবার দরুন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা এমন কিছু একটা বিস্ময়কর বা আশ্চর্যের কথা নয়। এবং যার ফলে হাসপাতালের ইতিহাসে ঐ ধরনের যৌন-সম্পর্ক বহু ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছে ডাক্তার ও নার্স এবং নার্স ও ছাত্রদের মধ্যে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী বলেও স্বীকৃতি দিয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অতদূর পর্যন্ত গড়ায়নি। সেই কারণেই দশজনের চোখে সিস্টার ডেইজীর প্রতি রমেন্দ্রর তথাকথিত ব্যবহারটা কতখানি নিন্দনীয় সেটা হয়ত বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু তবু কেন যেন শৈবাল রমেন্দ্রকে কিছুতেই মনে মনে ক্ষমা করতে পারে না।

তার মনে হয় ঐ মুহূর্তে, ডেইজীর জীবনটাকে ঐভাবে ব্যর্থ করে দেবার রমেন্দ্রর কোন অধিকারই ছিল না।

অবশ্যি রমেন্দ্র কথাটা স্বীকার করে না।

ডেইজীর কথাটা শৈবাল যে রমেন্দ্রর কাছে বিলাতে একদিন তোলেনি তা নয়। চেয়ারিংক্রশ টিউব স্টেশনে একদিন টিউবের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ডেইজীর কথাটা তুলতেই রমেন্দ্র বলেছিল, হ্যাঁ, তাকে একদিন আমার ভাল লাগতো অস্বীকার করি না শৈবাল, এবং কোন কোন মুহূর্তে যে মনে হয়নি তাকে জীবন-সঙ্গিনী করতে পারি চিরদিনের মতো তাও নয়। কিন্তু সেই নেশাটা যদি কেটে গিয়ে থাকেই তার জন্য নিজেকে পাষণ্ড বা অপরাধী ভাববো এমন দুর্বলতাও আমার নেই।

তাই যদি বলো তো বলবো তার সঙ্গে ওভাবে স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে

নেমে আসাটাই যেমন তোমার উচিত হয়নি রমেন্দ্র, তেমনি সে কথাটা তাকে বুঝতে দেওয়াও তোমার কর্তব্য ছিল। তুমি তার সঙ্গে প্রতারণাই করোনি, তার প্রেমকেও অপমান করেছো।

থাক্, থামো। সামান্য একটা হাসপাতালের নার্স—। আর এ ধরনের ব্যাপারে ওরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ। রমেন্দ্র গেছে যোগেন্দ্র আসবে। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবো—

আর বেশি বলতে দেয়নি শৈবাল সেদিন রমেন্দ্রকে। থামিয়ে দিয়েছিল। কি জানি কেন অসহ্য ঘৃণায় তার সর্বদেহ ও মন রমেন্দ্রর প্রতি এমন বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে সেখান থেকে তখন সে যেন কোনমতে পালিয়ে এসে বেঁচেছিল।

হঠাৎ আবার শৈবালের সিস্টার ডেইজীর কথায় সম্বিৎ যেন ফিরে আসে।

আমি রমেন্দ্রর বুড়ো বাপের সঙ্গে সেদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম ডক্টর ঘোষ!

তাই নাকি?

হ্যাঁ, ভদ্রলোক অত্যন্ত যেন মুষড়ে পড়েছেন। ওদের মা তো নেই। দুই ভাই। রমেন্দ্রই ছোট।

জানি।

বিয়ে করেছে করেছে, তাই বলে দেশে ফিরে আসবে না কেন সে বল ত। দেশে কি চাকরি নেই। পরীক্ষায় পাস করেছে, যথেষ্ট হসপিটাল ট্রেনিংও হয়েছে, এবারে দেশে ফিরে এলেই ত হয়! তোমার কি মনে হলো বল ত, সত্যিই সে আর এদেশে ফিরবে না নাকি?

ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিয়ে তাকায় ডেইজী কথাটা শেষ করে শৈবালের মুখের দিকে।

কি করে বলবো বল!

না, বলছিলাম তুমি তো তার বন্ধু—

না সিস্টার ডেইজী। তার মনের কথা তার মনই জানে। আর সে কথা জানবারও আমার কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু মনে কিছু করো না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ধর সে যদি ফিরে আসেই তাতে তোমার কি লাভ!

প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত মৃদু একটা হাসির বঙ্কিম রেখা সিস্টারের ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে ওঠে। বলে, লাভ?

হ্যাঁ।

সে সুখে থাক এটাই আমি চাই, তা সে যেখানেই থাক। কিন্তু তাই বলে তার অমন স্নেহময় বাপকে এ বয়সে কেন সে দুঃখ দেবে ?

বাপের কথা ত বলিনি তার আমি, বলছিলাম তোমারই কথা।

আমার কথা !

হুঁ।

আমি ত এ সপ্তাহের শেষেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

চলে যাচ্ছো, কোথায় ?

আপততঃ হায়দ্রাবাদে।

হায়দ্রাবাদ ! হঠাৎ ?

ইণ্ডিয়ান মিলিটারী নার্সিং কোরে যে আমি চাকরী নিয়েছি !

তুমি তাহলে এখানকার চাকরি ছেড়ে দিলে ?

হ্যাঁ। কলকাতায় আর নয়—কিন্তু আর তোমাকে বিরক্ত করবো না ডাঃ ঘোষ। এবার আমি উঠবো। কেবল যাবার আগে ছোট্ট একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে।

অনুরোধ !

হ্যাঁ। আট-দশখানা চিঠি লিখেও তার আমি জবাব পাই নি, জানি আমার চিঠির জবাব আর সে দেবে না !

ডেইজী—

হ্যাঁ, আমাকে ত তার আর আজ মনে নেই। একটা ক্রিশ্চান পাহাড়ী মেয়ে—যাক সে কথা, রমেন্দ্রর খুব ইচ্ছা ছিল আর বিলাত যাবার আগে সর্বদাই আমাকে বলতো, ফেলোসিপ নিয়ে এদেশে ফিরে এসে সে তার নিজস্ব একটা নার্সিংহোম খুলবে। অথচ একটা ফুল্‌লি ইকুইপড্‌ নার্সিংহোম খুলতে যে টাকার প্রয়োজন সে ত তার বা আমার হাতে ছিল না !

শৈবাল অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ডেইজীর মুখের দিকে। শুনতে থাকে তার কথা।

কিন্তু হঠাৎ মাস দুই আগে আমার এক কাকার মৃত্যুতে হাজার পনের টাকা আমি পেয়ে গিয়েছি।

কি বলছো ডেইজী—

হ্যাঁ, সেই টাকাটা আমি তোমার কাছে যাবার আগে রেখে দিয়ে যেতে চাই। তাকে যদি তুমি ফিরে এলে—

পারবো না ডেইজী। আমাকে ক্ষমা করো। যাকে খুশি তুমি এ ভার

তোমায় দিয়ে যাও কিন্তু আমি পারবো না। দুঃখিত—

পারবে না!

না।—

বেশ। তাহলে আর কি হবে। আচ্ছা আমি তাহলে এবারে উঠি। গুড্ নাইট। ধীরে ধীরে সোফার ওপর থেকে উঠে সিস্টার ডেইজী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শৈবাল নিঃশব্দে যেমন সোফার ওপরে বসেছিল তেমনিই বসে রইলো।

॥ ৮ ॥

যাহোক শৈবালকে কলকাতায় ফিরে এসে খুব বেশী দিন বেকার বসে থাকতে হলো না। ধনী ব্যারিস্টার পিতার সরকারী মহলে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; কারণ তিনি যে শুধু আইনজীবী ছিলেন তাই নয়, বিধান সভার সভ্যও ছিলেন। অথচ ঐ সময় বড় হাসপাতালে চেস্ট ডিপার্টমেণ্টে এমন কোন পদই ছিল না, যেখানে ব্যারিস্টার ঘোষের পুত্রকে নিয়ে গিয়ে বসানো যেতে পারে। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম যখন, তখন পোস্ট তৈরি হতেও বেশী দিন লাগলো না। চেস্ট ডিপার্টমেণ্টেরই প্যাথলজির জন্য নতুন একটি পোস্ট তৈরি করে সেখানে শৈবালকে নিযুক্ত করা হলো।

সেদিন কলেজের এক ফাংশনে সমীর চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা। সমীর ওরই মাস দুই আগে ডবল এম. আর. সি. পি. ও টি. ডি ডি. হয়ে ফিরেছে, কিন্তু ধাক্কা দেবার কেউ পশ্চাতে না থাকায়, কোনমতে একটি চেম্বার করে প্রাইভেট্ প্র্যাক্‌টিস শুরু করেছে।

সমীর বিলাত থেকে ফিরে যখন কর্তৃপক্ষ ও ডিপার্টমেণ্টের কর্তার সঙ্গে দেখা করেছিল, তিনি দাঁতে সিগ্রেটটা চেপে বললেন, আপাততঃ ত কিছু খালি নেই! হলে চেষ্টা করবো।

সমীর মৃদু হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে বের হয়ে এসেছিল।

কেমন চলছে সমীর? শৈবাল জিজ্ঞাসা করে।

এই চলছে একরকম!

কোন হাসপাতালে অ্যাটাচড্ হতে পারলে না?

না ভাই! সে সুযোগ আমাদের কোথায়?

সে-রাত্রে ফাংশনের থেকে বাড়ি ফিরতেই শৈবালের পিতা মিঃ ঘোষ বললেন,

সঞ্জীব আজ এসেছিল শৈবাল।

সঞ্জীব! কে বাবা?

তুমি দেখেছো তাকে, আমার ক্লাস-মেট্! সেই যে সেণ্ট্রালে ছিল, মাসখানেক হলো পেনসন নিয়ে তার লেক টেরেসের বাসায় এসে উঠেছে।

রায় বাহাদুর সঞ্জীব বোস সেণ্ট্রালে বড় চাকরী করতেন। একটি মাত্র কন্যা রীটা। স্ত্রীর অনেকদিন পূর্বেই মৃত্যু হয়েছে। দু-একবার সঞ্জীব বোস সম্পর্কে ও তাঁর কন্যা সম্পর্কে শৈবাল তার ব্যারিস্টার পিতার মুখে শুনেছিল। রীটার বয়স চব্বিশ হবে। কনভেণ্ট থেকে জুনিয়ার ও সিনিয়ার কেমব্রিজ পাস করে দিল্লী ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পাস করেছে।

অনেকদিন আগে শৈবাল যেবারে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, রীটা তার বাবার সঙ্গে দিন দশেকের ছুটিতে কলকাতায় একবার এসেছিল। রীটার বয়স তখন মাত্র বছর পনের হবে। মনে আছে, দীর্ঘাঙ্গী পাঞ্জাবী মেয়েদের মত। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। সিংগিল করা চুল, সর্বদেহে অ্যানামেলিং। ফিরিঙ্গী মেয়েদের মত মুখে সর্বদা ইংরাজী বুলি—চাপা নাকিস্বরে আধো আধো উচ্চারণ। অঙ্গেও ফিরিঙ্গী ও এদেশীয় বেশভূষার একটা জগা-খিচুড়ী। কেমন যেন বিশ্রী লেগেছিল শৈবালের রীটাকে। সে সময় তারা শৈবালদেরই বাড়িতে এসে উঠেছিল। তারপর অবিশ্যি বোস সাহেব কলকাতায় জমি কিনে বাড়ি করেছেন। সে বাড়ি এতদিন ভাড়া খাটছিল। পেনসন নিয়ে এসে ভাড়াটে তুলে দিয়ে নিজেই বসবাস করছেন।

বাবার কথায় শৈবালের সেই রীটাকে মনে পড়ে গেল। ফিরিঙ্গীর হাস্যকর অনুকরণ!

কিন্তু শৈবাল জানত না যে তার বাবার বন্ধু বোস সাহেবের প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্যে অন্য একটি গূঢ় অভিসন্ধি ছিল।

রাত্রে ডাইনিং টেবিলে বসে অনুচ্চারিত তখনকার আসল প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলেন ঘোষ সাহেব। বললেন, তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে শৈবাল।

বলুন? কাট্‌লেটের একটা পিস্ কাঁটার সাহায্যে মুখে তুলতে তুলতে পুত্র পিতার মুখের দিকে তাকাল।

আমার ইচ্ছা তুমি এবারে বিয়ে করো।

বিয়ে?

হ্যাঁ। আর পাত্রীও আমি ঠিক করে রেখেছি। সঞ্জীবের মেয়ে রীটা।

রীটা!

হ্যাঁ, এবারে সে এম এ. পাস করেছে ইংরাজী সাহিত্যে। মেয়েটি বেশ।

কিন্তু বাবা।

অফ কোর্স দেয়ার ইজ নো নিড্ টু হ্যারি, মাই বয়! আলাপ পরিচয় করো। তারপর—, বলতে বলতে টেবিলের ওপরে রক্ষিত ন্যাপকিনটা তুলে নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন ঘোষ সাহেব।

বিবাহ!

শর্বরীর সঙ্গে অকস্মাৎ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ কথাটা একবারও ভাবেনি শৈবাল। বলতে গেলে মনেই পড়েনি কখনো। অথচ পিতার একমাত্র পুত্র সে যখন, তখন এ প্রশ্নটার জন্য ত তার প্রস্তুত থাকাই উচিত ছিল। এ প্রশ্ন যে একদিন উঠবে এ ত জানা কথাই।

ঘোষ সাহেব আবার বললেন, কাল রবিবার আছে। সঞ্জীব আর তার মেয়েকে আমি এখানে রাত্রে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছি। তোমার কোন এনগেজমেণ্ট নেই ত?

সত্যিই শৈবালের কোন এনগেজমেণ্ট ছিল না, তবু সে মিথ্যা করেই বললো, কিন্তু আগে থেকে যে আমার এনগেজমেণ্ট করা আছে বাবা কাল রাত্রে।

ক্যানসেল্ করা যায় না?

না। সম্ভব নয়।

তাই ত। তুমি থাকবে না!

তাতে কি! আপনি ত রইলেন।

রীটা আসছে কাল—ভাবছি তার কথাই। বাড়িতে ত এমন কেউ নেই যে তার সঙ্গে কথা বলে। আমার সঙ্গে কথা বলে কি আর সে আনন্দ পাবে? চেষ্টা করে একটা ব্যবস্থা করতে পারো না শৈবাল?

দেখবো। শৈবাল উঠে পড়ল।

নিজের ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল শৈবাল।

বহুদিন পরে আজ আবার আলমারি থেকে শর্বরীর পোস্টকার্ড সাইজ ফটোটা বের করে চোখের সামনে তুলে ধরল শৈবাল। যেবারে তারা ফাইন্যাল এম বি. পাস করে, সেইবার দুজনে দুটো ফটো তোলায়। শৈবালেরটা নেয় শর্বরী, আর শর্বরীরটা শৈবাল।

ফটোর পিছনে শর্বরীর নিজের হাতে লেখা : শৈবালকে আমার। তোমার শর্বরী!

কোথায় শর্বরী! কোথায়?

সে কি আজও বেঁচে আছে! আর—আর তাদেরই সন্তান! প্রায় ছয় বছর বয়স হতে চললো তার। ছেলে না মেয়ে। কেমন দেখতে হয়েছে সে। শর্বরীর মত কি না তারই মত?

ধীরে ধীরে আবার শৈবাল আলমারিটার কাছে এগিয়ে গেল। চাবি দিয়ে আলমারির দ্বিতীয় ড্রয়ারটি টেনে খুলল।

কত রকমের খেলনায় ভর্তি ড্রয়ারটা! কিছু এখানে থাকতেই মধ্যে মধ্যে কিনে এনে ড্রয়ারে রেখেছিল, তারপর বিলেত থেকে এবারে ফিরবার সময় সেলফ্রিজের টয় ডিপার্টমেণ্ট থেকেও অনেক কিছু নিয়ে এসেছে কিনে। শুধু কি তাই? আর একটা ড্রয়ারে ছোট ছোট সব জামা—স্যুট্ ইত্যাদি।

নিজেই জানে না শৈবাল এ তার কি অদ্ভুত খেয়াল। কেন যে সে এসব কেনে তা সে-ই জানে। অচেতন মনের নিভৃতে যে শিশুটি ক্রমে ভ্রূণ থেকে একটু একটু করে দিনের পর দিন তার কল্পনায় বেড়ে উঠেছে, তাকে ঘিরেই শৈবালের ঐ বিচিত্র স্বপ্নবিলাস।

খেলনা ও জামাকাপড়গুলোর গায়ে নিঃশব্দে হাত বুলাতে থাকে শৈবাল আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তার খোকন! খোকনমণি! কিংবা তার খুকু—খুকুমণি! এ সব—সব তার। সে একদিন আসবে, এই ঘরে সে খেলবে!

কিন্তু কোথায় সে! কোথায় যে শর্বরী তাকে নিয়ে লুকোলো কে জানে! আজও শর্বরীর রাগ পড়লো না! অভিমান তার গেল না।

রাত বাড়তে থাকে।

আলমারির ড্রয়ার চাবি দিয়ে বন্ধ করে একসময় শৈবাল শেল্‌ফের উপর থেকে বেহালাটা পেড়ে ঘরের আলো নিবিয়ে চেয়ারের উপরে এসে বসলো, অন্ধকার টেবিলের ওপরে রক্ষিত শর্বরীর ফটোটার মুখোমুখি।

তারের গায়ে ছড় টানলো।

বেহালার সুরে সুরে মূর্ত হয়ে ওঠে একটার পর একটা যত ঘুমপাড়ানী লালিবাই সংগীত।

ঘুমাও, খোকনমণি! সোনা আমার ঘুমাও! আকাশের চাঁদ টিপ দিয়ে যাও আমার খোকনের ঘুমন্ত কপালে! ঘুমাও! ঘুমাও!

শর্বরীর বুকের কাছে শুয়ে গৌতম বলে, তারপর কি হলো জান মা-মণি !

আকাশের চাঁদের বুকে একদিন রাত্রে নেমে এলো সেই চরকা-কাটা বুড়ী। চুপি চুপি রাজার ছেলের মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। রাজার ছেলে তখন ঘুমিয়ে—জানতে পারল না।

ছেলে বলছে আজ মাকে গল্প।

শর্বরী শুধায়, তারপর কি হলো ?

তারপর সেই বুড়ী রাজার ছেলেকে নিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে গেল।

পালিয়ে গেল !

হ্যাঁ।

তারপর তার মা কি করলো ?

কত কাঁদলো !

বুড়ীটা ত ভারি দুষ্টু !

বোং তুমি জান না, মা-মণি। তারপর কি হলো শোন ! টুক্ করে একটা শব্দ হতেই মা চেয়ে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে সেই ছেলে।

ওমা ! সত্যি নাকি !

হাঁ। রাজকুমার ! তখন সে বললে, এই যে মা আমি ! আমি ত যাই নি কোথাও ! দুষ্টুমি করে তোমাকে ত স্বপ্ন দেখাচ্ছিলাম !

ও ! তাই বল, স্বপ্ন !

হ্যাঁ—স্বপ্নই ত !

আজকাল মাঝে মাঝে শর্বরীকেও ছেলের গল্প শুনতে হয়। গৌতম আজ বলছিল তার মাকে। জান্‌কী এসে ঘরে ঢুকল।

মাঈজী !

কি রে জান্‌কী !

হাসপাতালের দাই এসেছে।

শর্বরী উঠে গেল বাইরে। দাই বললে, নতুন একটা কেস এসেছে, ডাঃ আনন্দ ডাকছেন এখুনি।

তাড়াতাড়ি ধড়াচুড়া পরে শর্বরী বের হয়ে গেল।

ডাঃ আনন্দ ও. টি.-তেই ছিল। শবরীর পায়ের সাড়া পেয়ে বললে, এসেছো, রেডি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি শর্বরী ! প্রাইমি। মনে হচ্ছে সিজিরিয়ান

করতে হবে।

অ্যানাস্থেটিস্ট ততক্ষণে রোগীকে আণ্ডার করছে। শর্বরী চটপট অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

কিন্তু রোগিণীকে পরীক্ষা করতে গিয়ে শর্বরী বললে, আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে আনন্দ।

সিঙ্কে আনন্দ হাত ধুচ্ছিল। ফিরে তাকিয়ে শুধাল, কি?

দি বেবী ইজ অলরেডী ডেড্! বাচ্চা মারা গেছে।

তবে?

ক্রেনিওটমির ব্যবস্থা করো।

সত্যি তাই করতে হলো। পেটের বাচ্চা আগেই মারা গিয়েছিল।

॥ ৯ ॥

দিন তিনেক পরে আবার হঠাৎ ডাঃ ঘোষালের কাছ থেকে শর্বরীর ডাক এলো, সেদিন তখন সে নার্সিংহোমে কাজে ব্যস্ত। এবারে আর লোক মারফত ডাক নয়, একেবারে লিখিত স্লিপে!

ছোট্ট একখানা স্লিপ।

ডক্টর শর্বরী রয়, উড ইউ প্লিজ সি মি য়্যাট ইয়োর আরলিয়েস্ট কনভিনিয়েন্স?—ঘোষাল।

যত শীঘ্র সম্ভব সুযোগমত দেখা করবার জন্য অনুরোধ।

ডাঃ আনন্দ ও শর্বরী দুজনে অফিসঘরে বসে সাধারণ কৃশ ও অপুষ্ট বাচ্চাদের জন্য কি ধরনের একটা ডায়েট চার্ট করা যেতে পারে, তাই নিয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিল।

এদেশের বেশীর ভাগ শিশুই কৃশ ও রুগ্ন জন্মায়। পরিপুষ্ট শিশু বড় একটা দেখাই যায় না।

আনন্দকে তাই শর্বরী বলছিল, এই যেসব কৃশ অপরিপুষ্ট শিশু জন্মায় এর জন্য কিন্তু বেশীর ভাগ দায়ী আমাদের দেশের মায়েদের স্বাস্থ্য—গর্ভাবস্থায় নিজেদের আত্মসচেতনতার অভাব, তাদের প্রতি সংসারের অন্য দশজনের অবহেলা, দৃষ্টির অভাব। গর্ভাবস্থায় জননীর যে পুষ্টিকর খাদ্য, নিয়মিত বিশ্রাম, ব্যায়াম ও পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন সেগুলোর অভাব। তাই দেশে স্বাস্থ্যপুষ্ট হেলদি শিশু পেতে গেলে, সর্বাগ্রে আমাদের সেইদিকেই নজর দিতে হবে। কৃশ ও

অপুষ্ট বাচ্চাদের একটা ডায়েট চার্টের কথা ভাববার আগে আমাদের ভাবতে হবে সেই কথাটাই। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা সন্তান ধারণ, সন্তানের জন্ম দেওয়া ও পরে সন্তান পালন—সমস্ত ব্যাপারগুলোই এমন অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে করে যে, তারা ভুলে যায় কত বড একটা নিষ্ঠা ও কত বড় একটা দায়িত্ববোধ তার মধ্যে আছে।

কিন্তু আমার মনে হয় শর্বরী সব দোষটাই এদেশের মায়েদের ঘাড়ে চাপানো উচিত হবে না, আনন্দ বলে।

তা ত নিশ্চয়ই, সন্তানের দায়িত্ব ত কেবল একমাত্র মায়েদেরই নয়, তাদের বাপেদেরও আছে। এবং মা-বাপের মধ্যে সেই সচেতনতা আনতে হলে দুটো প্রবন্ধ লিখে বা প্ল্যাটফরম্ লেকচার দিলেই হবে না। তার জন্য আমাদের দেশের রাষ্ট্রকে আত্মসচেতন হতে হবে অন্যান্য স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রের মত। আমার প্রফেসর ডাঃ চৌধুরী তাই আমাকে প্রায়ই বলতেন যে এই ধরনের কতকগুলো ক্লিনিক্স্ করে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে তবে যদি ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়।

শর্বরী ও আনন্দের মধ্যে যখন ঐ ধরনের সব আলোচনা চলছে, ডাঃ ঘোষালের ল্যাবরেটরীর পিছনের দিকের বাগানে তখন তীর ধনুক নিয়ে খেলতে খেলতে গৌতমের একটা নিক্ষিপ্ত তীর সোজা একেবারে ল্যাবরেটরির খোলা জানালাপথে উধাও হলো।

কয়েকটা মুহূর্ত গৌতম কি যেন ভাবল। তারপরে বাড়ির যে পশ্চাতের দ্বারপথটি বাগানে যাতায়াতের জন্য ছিল, সেই দ্বারপথ দিয়ে চুপি চুপি গৌতম বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

রাধু তখন কাজে ব্যস্ত রান্নাঘরে। গৌতমের প্রবেশ সে আদৌ টের পেল না। গৌতম সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ল্যাবরেটরিতে খোলা দরজাপথে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

ডাঃ ঘোষাল ও নির্মল দুজনেই যে যার কাজে ব্যস্ত; গৌতমের প্রবেশ তাঁরা দুজনের একজনও টের পেলেন না ঘরের মধ্যে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে গৌতম থমকে দাঁড়াল।

চারিদিকে সব বিচিত্র যন্ত্রপাতি, কাঁচের শিশিবোতল—তাতে সব রং-বেরঙের পদার্থ। বিস্মিত গৌতম এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগলো।

হঠাৎ একটা কিচিরমিচির শব্দে গৌতমের নজর পড়লো সাদা ইঁদুর ও

খরগোসের খাঁচাগুলোর দিকে।

এবারে পায়ে পায়ে সেইদিকেই এগিয়ে গেল গৌতম।

সেই সাদা ইঁদুরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখছে গৌতম, এমন সময় ডাঃ ঘোষালের সেদিকে নজর পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন।

তারপরই রুক্ষ বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, য়্যাঁ! এ কে! হু—আরে, হু ইজ ভ্যাট্ বয়।

ডাঃ ঘোষালের রুক্ষ কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে নির্মলও ফিরে তাকিয়ে গৌতমকে দেখতে পায়।

ডাঃ ঘোষাল এগিয়ে আসেন, এই! কে। কে তুই!

আমি গৌতম! নির্ভীক উত্তর দেয় গৌতম।

গৌতম! হু আর ইউ? নির্মল, হু ইজ হি!

খোকা! নির্মল ডাকে।

আমি গৌতম!

বের করে দাও! বের করে দাও নির্মল ওটাকে! সর্বনাশ। সর্বনাশ করে ফেলবে সব! কিন্তু এলো কোথা থেকে এ জঞ্জাল!

কাদের বাড়ির ছেলে তুমি গৌতম? এখানে কি করে এলে? নির্মল শুধায়।

ডাঃ শর্বরী রায়ের ছেলে আমি!

শর্বরী রায়ের ছেলে ত একেবারে আমার মাথা কিনে নিয়েছে! বের করে দাও, বের করে দাও নির্মল! যত সব জঞ্জাল!

নির্মল তাড়াতাড়ি গৌতমকে সঙ্গে নিয়ে ল্যাবরেটরি থেকে বের হয়ে গেল।

এরই মিনিট দশেক বাদ এলো শর্বরী।

আমাকে ডেকেছিলেন?

কে! ও তুমি—, ফিরে তাকালেন ডাঃ ঘোষাল। দেখো নির্মল মাসখানেকের ছুটিতে তার দেশে যাচ্ছে। এই একটা মাস তুমি যদি—

কিন্তু একা আনন্দ নার্সিংহোম কি—

চুলোয় যাক্। গোল্লায় যাক্ নার্সিংহোম। হঠাৎ যেন খিঁচিয়ে ওঠেন ডাঃ ঘোষাল, কতকগুলো পয়সাওয়ালা লোকের দুদিনের অসুবিধা ত। হ্যাং দেম্! লেট্ দেম্ সাফার! ও নার্সিংহোম আমি তুলে দেবো! কি হবে ঐ নার্সিং-হোমে, যেখানে সত্যকার নীড্ যারা তারা সুবিধে পায় না? তার চাইতে একটা চ্যারিটেবল হাসপাতাল করবো। দুইজন লোকেরও যদি দৈনিক চিকিৎসা সেখানে বিনে পয়সায় হয় ত—সে হবে অনেক ভাল।

আমি না হয় সমস্ত দুপুরটা এখানে কাজ করবো। সকালে আর সন্ধ্যায় নার্সিংহোমে যাবো। শর্বরী বলে।

পারবে ?

কেন পারবো না!

তাহলে তাই করো।

এবং সেই ব্যবস্থাই হলো।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে গৌতম তার মায়ের কাছে তার ঐদিনের অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করে, জান মা-মণি! ঐ যে বাগান—তারপর সেই সাদা বাড়িটা, সেখানে থাকে সেই ঝাঁকড়া-চুলো দৈত্যটা!

সে কি রে!

হ্যাঁ মা! তুমি ত জান না! একদিন এসো আমার সঙ্গে, চুপি চুপি তোমাকে দেখাবো। ইয়া বড় বড় গোল গোল তার চোখ। নিশ্চয়ই দৈত্যটা রাজকন্যাকে বন্দী করে রেখেছে। ঠিক দেখো আমি তীর-ধনুক দিয়ে একদিন ঐ দৈত্যটাকে বধ করে রাজকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে আসবো।

শর্বরী বুঝতে পারে না কিছুই ছেলের কথা। ভাবে বুঝি গল্পই। সস্নেহে হাসে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে।

ছেলে আবার শুধায়, আচ্ছা মা-মণি, যদি তীর-ধনুকে দৈত্যটা না মরে! যদি তার প্রাণ অন্য কোথাও লুকানো থাকে!

সে কি রে ?

হ্যাঁ, সেই যে দৈত্যের মত যদি প্রাণটা তার একটা টিয়া পাখি বা একটা কালো ভ্রমরের মধ্যে থাকে যে ভ্রমরটা আছে একটা সোনার কৌটার মধ্যে লুকানো!

তাহলেই ত মুশকিল! খুঁজে বের করতে হবে তাকে! শর্বরী বলে ছেলেকে।

খুঁজে আমি ঠিক বের করবোই!

এবং শিশুমনের বিচিত্র কল্পনায় তার পরের দিনও আবার গৌতম ডাঃ ঘোষালের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে তাকে যেন টেনে নিয়ে যায়!

সেদিন নির্মল ল্যাবরেটরিতে ছিল না, একাকী ডাঃ ঘোষাল একটা টেস্ট টিউবে কি একটা সল্যুশন নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে যেন কি পরীক্ষা

করছিলেন।

পা টিপে টিপে গৌতম এসে ঘরে ঢুকল।

কোথায় আছে দৈত্যটার প্রাণ। কোথায় সেই রূপার খাঁচায় টিয়া পাখি বা কোথায় সেই সোনার কৌটায় লুকানো প্রাণ-ভ্রমর। এদিক-ওদিক সতৃষ্ণ নয়নে তাকায় গৌতম।

হঠাৎ নজরে পড়ে খাঁচার মধ্যে সাদা ইঁদুরগুলো কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ তুলে ছুটাছুটি করছে। সেই দিকেই এগিয়ে যায় এবারে গৌতম। একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে, ঐ ইঁদুরগুলোর মধ্যেই দৈত্যের প্রাণটা নেই ত লুকানো! ঠিক। বোধ হয় ত তাই। কিন্তু অনেকগুলো ইঁদুর যে খাঁচায়! ওর কোন্‌টার মধ্যে আছে লুকোনো দৈত্যটার প্রাণ!

সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে গৌতম খাঁচার ইঁদুরগুলোর দিকে।

সহসা এমন, সময় টেস্ট টিউবটা হাতে ঘুরে দাঁড়াতেই ডাঃ ঘোষালের নজর পড়ল গৌতমের দিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, এই—এই ছেলেটা!

গলা শুনেই ঘুরে দাঁড়াল গৌতম। বললে, ছেলেটা কি, আমার নাম ত গৌতম!

বেরো। বেরো এখন থেকে—, বলতে বলতে এসে একটা ধাক্কা দিতেই ঘুরে পড়ে গেল গৌতম মেঝেতে।

আচমকা শৈবালের হাত থেকে কাঁচের পুতুলটা ফসকে মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল।

ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল শৈবাল। এবং সেই খোলা দরজাপথে কখন একসময় রীটা যে নিঃশব্দে এসে ঘরে প্রবেশ করে আলমারির সামনে পিছন ফিরে শৈবালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডেকেছে, মিঃ ঘোষ। এবং সেই আচমকা ডাকে হাত থেকে পুতুলটা ফসকে মেঝেতে পড়ে গিয়েছে। পুতুলগুলো নাড়াচাড়া করে দেখছিল শৈবাল।

তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে মেঝে থেকে ভাঙা পুতুলটা তুলে আলমারির মধ্যে লুকিয়ে ফেলে, আলমারির দরজাটা বন্ধ করে কুঞ্চিত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল শৈবাল।

খোলা দরজার উপরে দাঁড়িয়ে রীটা।

সাধারণ বাঙালী মেয়েদের চাইতে অনেক লম্বা। মাথার চুল সিংগিল করা,

গালে চোখে মুখে ঠোঁটে পাউডার, রুজ, লিপস্টিক্ ও সুরমার কষ্টাঙ্কিত প্রসাধন প্রলেপ। কুৎসিত অ্যানামেলিংয়ের চিহ্ন।

বুকখোলা বগল পর্যন্ত কাটা পাত্‌লা ইটালিয়ান সিল্কের কালো রংয়ের ব্লাউজ। পরিধানে সাদা রেশম শাড়ি। পায়ে ফ্ল্যাট্‌হীল চপ্পল। হাতে ভেলভেটের বটুয়াটা দোদুল্যমান।

আপনি ত কিছুতেই গেলেন না, তাই নিজেই এলাম। আই হোপ ইউ কুড্ রেকগনাইজ মী! চিনতে পারছেন আমাকে আশা করি।

পারছি বইকি—আসুন।

ঠোঁট দুটিকে সামান্য একটু বেঁকিয়ে ভ্রূযুগল একটু তুলে বললে রীটা, বলুন ত আমি কে?

মিস্ রীটা!

ও। ডিয়ার! ডিয়ার—হাউ লাভলী, দেন ইউ রিয়ালী কুড্ রেকগনাইজ মী! সত্যি সত্যি তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমি ত ভেবেছিলাম বুঝি একগাদা কথা খরচ করতে হবে জাস্ট্ ফর অ্যান্ ইনট্রোডাকশান।

কিন্তু বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন!

ওই 'আপনি'টা কিন্তু আদপেই পছন্দ হচ্ছে না। 'তুমি' বললে আমি এতটুকুও দুঃখিত হবো না, ররং খুশিই হবো।

আপত্তি না থাকে ত তাই বল না, আর আমাকেও বলতে অনুমতি দাও।

বেশ ত।

একটা সোফার উপরে বসে সমস্ত দেহটাকে একটু বেশী রকম শিথিল ও এলিয়ে দিতে দিতে রীটা বলে, ছাটস্ নাইস! ওই আপনি আজ্ঞেটা যেন বড় সেকেলে। ইংরেজীতে কিন্তু এসব হাঙ্গামাই একেবারে নেই! এক 'You' দিয়েই সব চালানো যায়।

সেটা ওদের ভাষার দৈন্যই বলবো রীটা!

সে কি বলছো শৈবাল! ইংরাজী ভাষার দৈন্য! হাউ রিচ্ ল্যান্‌গুয়েজ! সারা পৃথিবীতে অমন ভাষা দ্বিতীয়টি আছে নাকি! যেমনি সহজ তেমনি বোধগম্য।

বাংলা ভাষার চর্চা করলে বুঝতে মণি-মুক্তার মতই ঝলমলে সে ভাষা! সঙ্গীতের মত মিষ্টি। শব্দ-ঝঙ্কারে অতুলনীয়।

তুমি দেখছি অত্যন্ত গোঁড়া দেশপ্রেমিক একজন।

নিজের মাতৃভাষাকে ভালবাসাটা যদি গোঁড়ামি হয়ও তবু সেটা নিশ্চয়ই নিন্দনীয় নয়, কি বল?

সেই যে সেদিন অতর্কিতে অনাহূতা এসে রীটা শৈবালের ঘরে হানা দিল, তারপর থেকে শৈবালদের গৃহে ত বটেই, তার চেম্বারে পর্যন্ত তার আসা-যাওয়া চলতে লাগল ঘন ঘন।

সময় নেই অসময় নেই যেন একঝলক ঝড়ো হাওয়ার মতই রীটা শৈবালের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং সম্ভবতঃ শৈবালের দিক থেকে যতই শৈথিল্য ও নিস্পৃহতা প্রকাশ পায়, ততই যেন রীটার তার প্রতি আকর্ষণটা বাড়তে থাকে। হাতের মুঠোর মধ্যে যাকে ধরেও ধরা যায় না—ধরা দেয় না, মানুষ তার প্রতিই আকৃষ্ট হয় বেশী! তাছাড়া আরো একটা কারণ ছিল। রীটা তার যৌবন ও গ্লামার দিয়ে চিরদিন তার আশপাশের পুরুষদের মুগ্ধ ও আকর্ষিত করেই এসেছে। মধুলোভীর মত তারই চারপাশে গুনগুনিয়ে ফিরছে সকলে, আজ যখন সেই রীটা সম্পূর্ণ বিপরীত দেখে শৈবালের মধ্যে—শৈবালকে জয়ের নেশাটা যেন তার বেড়েই যায় ক্রমে।

কি এক অদ্ভুত আকর্ষণে সে কেবলই শৈবালের কাছে ছুটে ছুটে আসে। এবং সর্বদা রীটা সহ শৈবালকে দেখে আবার বন্ধুমহলেও শুরু হয় চাপা আলোচনা।

পরিচিত জনদের মধ্যে খুব কম জনই জানত শৈবাল ও শর্বরীর ঘনিষ্ঠতার কথা। কারণ তাদের সে ঘনিষ্ঠতার মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস ও কাকলী ছিল না যেটা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত। তারা যে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে এটা বড একটা কেউ কোনদিন জানতেই পারেনি। নিঃশব্দ ফল্গুর মত তাদের প্রেম ছিল তাদের দুজনার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে প্রবহমাণ।

তাই আজ শৈবালের সঙ্গে রীটার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখে সকলে বলাবলি করতে লাগল, এতদিনে শৈবাল বোধ হয় ধরা পড়লো।

কিন্তু শৈবালের মনের মধ্যে যে অনুক্ষণ কি হচ্ছিল তার সংবাদ কেউ জানত না। যার উপস্থিতিটুকু পর্যন্ত সহ্য যায় না, সে যদি কেবলই কাছে এসে জড়িয়ে ধরতে চায়—কেবলই পাশে পাশে ঘুরঘুর করে, বিড়ম্বনাটা যে তখন কোথায় গিয়ে পৌছায় যে ভুক্তভোগী একমাত্র সে-ই বোঝে।

তবু মুখে বা ব্যবহারে রূঢ় হতে পারে না শৈবাল। এবং সব চাইতে তার দুঃখ হয় যে ঐ সত্যটুকু কারো চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে কেবল বাইরের লোকচক্ষুর সামনে যা ঘটে সেইটুকুই।

এমনি করে যখন দিন চলেছে এমন সময় একদিন মাঠে খেলা দেখতে গিয়ে হঠাৎ টুটুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শৈবালের।

বছর পনের বয়স এখন টুটুর। বেশ বড়সড় হয়েছে।

টুটুকে সে চিনতে পারেনি কিন্তু টুটু তাকে ঠিকই চিনেছিল। সে-ই প্রথমে কথা বললে, শৈবালদা না!

কে? ফিরে তাকাল শৈবাল।

আমাকে চিনতে পারছেন না শৈবালদা! আমি মনোজিৎ, টুটু—

টুটু! সর্বনাশ! তুমি যে একেবারে জেণ্টেলম্যান হয়ে গিয়েছো হে! তারপর খবর কি? তোমার বাবা কেমন আছেন?

বাবা ত বছর দুই হলো মারা গেছেন।

চমকে উঠলো শৈবাল। পঙ্গু শেখরনাথ নেই—মারা গেছেন!

তুমি কোন্ ক্লাসে পড়ছো?

কৃষ্ণনগর কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।

কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ো!

হ্যাঁ, ছোড়দি সেখানকার স্কুলেই ত চাকরি নিয়ে গিয়েছে!

আলো কৃষ্ণনগরে এখন চাকরী করে?

হ্যাঁ।

একটা কথা বার বার শৈবালের ওষ্ঠপ্রান্তে এসেও যেন ফিরে যায়। শর্বরীর সংবাদটা মনের হাজার তাগিদেও যেন জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারে না। একটা সঙ্কোচ একটা লজ্জা যেন কেবলই পিছন দিকে তাকে টানতে থাকে। কিন্তু কথাটা আর শৈবালকে উত্থাপন করতে হলো না, টুটু নিজে থেকেই বললে।

দিদি কোথায় জানেন শৈবালদা!

স্খলিত কণ্ঠে শৈবাল বলে, দিদি! মানে—

হ্যাঁ, আমার দিদি! সেই যে চলে গেল আর সে ফিরে এলো না। বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন দিদির নাম পর্যন্ত শুনলে জ্বলে উঠতেন। আর ছোড়দি ত দিদিকে কোনদিন দেখতে পারে না। আমি এতদিন ছোট ছিলাম, কিছু বলতে পারিনি। এবারে তার আমি খোঁজ করবো। খুঁজে তাকে আমি বের করবোই। গ্রীষ্মের ছুটিতে সেই জন্যই আমি কলকাতায় এসেছি।

খোঁজ কিছু পেলে না, না?

না। দিদির এক বন্ধু মীনাক্ষীদি'কে আপনি চেনেন কিনা জানি না—

চিনি। কিন্তু সেও ত কিছু জানে না।

মীনাক্ষীদি তাহলে আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন।

সেকি!

হ্যাঁ। বাড়ি থেকে চলে এসে দিদি তারই ওখানে উঠেছিল। সাত-আট দিন ছিল সেখানে। তারপর নাকি কোথায় চাকরি নিয়ে চলে যায়।

তা জানি, তারপর যে সে কোথায় গিয়েছে তা ত সে জানে না?

কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি জানেন, বলবেন না।

না, না—তা কি কখনো হয়। যাক্, কোথায় তুমি উঠেছো টুটু?

আমার এক বন্ধুর বাড়িতে চেতলায়।

॥ ১০ ॥

টুটুকে শৈবাল সঙ্গে করে তার গাড়িতে তুলে সোজা একেবারে তাদের বাড়ি গেল। ছাড়ল না তাকে।

অনেক কথাই হলো দুজনার মধ্যে।

শর্বরী গৃহ ছেড়ে চলে আসবার পর কি ভয়াবহ দারিদ্র্যের সঙ্গে তাদের দিনের পর দিন যুদ্ধ করতে হয়েছে! কি নিদারুণ অর্থকষ্ট! পঙ্গু শেখরনাথ শেষের যে কটা বছর জীবিত ছিলেন কি বিশ্রী রকম খিটখিটে হয়েছিলেন। দিবারাত্র কিভাবে তাকে ও আলোকে গালাগালি দিতেন। সব শুনতে শুনতে শৈবাল যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

একটা কথা তার কেন যেন ঐ সময় মনে হয়, এসব কিছুর জন্য প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে সে-ই দায়ী। তারই কারণে ত শর্বরীকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। এদের দুঃখের কারণ কতকটা সে নিজেও সেই দিক থেকে বৈকি।

আরো একটা কথা মনে হয় যেন নতুন করে, সে-রাত্রে অকস্মাৎ শর্বরী তার উপর রাগ ও অভিমান করে চলে যাবার সাত সাতটা দিন সে যখন মীনাক্ষীর বাড়িতেই ছিল, সে সময়টা শৈবাল হাসপাতালেই শর্বরীর অনুসন্ধান করেছে অথচ একবারও তার মনে হয়নি মীনাক্ষীর কথা। ঐ সাত দিনের মধ্যে একবারও যদি সেখানে যেত তবে হয়ত এমনি করে শর্বরীকে সে নিরুদ্দিষ্টা হতে দিত না। যেমন করেই হোক তাকে আবার সে ফিরিয়ে আনতই।

কিন্তু পরে যখন মীনাক্ষীর বাড়িতে সে গিয়েছিল, তখন মীনাক্ষী শর্বরী যে কোথায় কিছুই বলতে পারলে না। কালই আবার একবার সে মীনাক্ষীর ওখানে যাবে। অনেকদিন মীনুদির ওখানে সে যায় না। কে জানে এতদিনে যদি কোন খবর তার পেয়ে থাকে।

কিন্তু কাল পর্যন্ত শৈবাল অপেক্ষা করতে পারল না। টুটু বিদায় নেবার পরই সেও গাড়ি নিয়ে বের হলো মীনাক্ষীর বাসার উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ দিন মীনাক্ষীর

সংবাদ না রাখায় শৈবাল জানত না যে, সেবারে বছরখানেক ভাল থাকবার পর আবার কাজে যোগদান করে বছর দুই অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনিয়মে আবার সে শয্যাশায়িনী হয়েছে। এবং এবারে একটা নয়, দুটো ফুসফুসই হয়েছে আক্রান্ত।

সাড়া পেয়ে এসে সরলাই দরজা খুলে দিল।

রাত তখন প্রায় নটা।

তোমার মা আছেন সরলা?

মা ত একেবারে বিছানায় শোয়া।

আবার বুঝি—

হ্যাঁ। অত বড় রোগ থেকে উঠে অত খাটা-খাটনি করলে আবার পড়বে না! তাই পড়েছে। দেখুনগে উপরে।

জেগে আছেন?

হ্যাঁ। এই ত খাইয়ে এলাম।

শৈবাল সোজা উপরে উঠে এলো। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেও দোতলার বারান্দায় পা দিয়েই বুঝতে পেরেছিল শৈবাল এখানেও দারিদ্র্য দাঁত বসিয়েছে। এবং মীনাক্ষীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে সেটা আরো স্পষ্ট করেই সে বুঝতে পারলে।

সামান্য আয় মীনাক্ষীর; এ রাজরোগের সঙ্গে প্রথমবারটায় সে কোনমতে বুঝতে পারলেও এবারের আক্রমণে আর সে বেশী দিন সংগ্রাম চালাতে পারেনি।

গত সাত মাসের মধ্যে এবারেই তাকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে।

দুর্দান্ত টি. বি. রোগ, দেহকে যেমন করে শোষণ তেমনি আজকের দিনে নানা অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হলেও ও রোগের অর্থশোষণটা এত প্রচণ্ড যে, সাধারণের পক্ষে—সাধারণ আয়ে এর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটা সহজ নয়।

ঘরের চারিদিকেই দৈন্য বসিয়েছে তার নিষ্করুণ দাঁতের কামড়।

সাধারণ একটা শয্যায় মীনাক্ষী শুয়ে ছিল। দরজার বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে শুধাল, কে?

আমি—শৈবাল!

এসো—এসো শৈবাল!

ঘরে প্রবেশ করে রোগক্লিষ্ট ফ্যাকাসে মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা

মুহূর্ত শৈবালের মুখ দিয়ে যেন কোন কথাই সরে না।

এসো শৈবাল, বোস।

কিন্তু একি তোমার চেহারা হয়েছে মীনুদি!

শর্বরীর পরিচয়ে বরাবর তার দেখাদেখি শৈবালও তাকে মীনুদি বলেই সম্বোধন করত।

এতদিনে বোধ হয় যাবার সময় হলো শৈবাল। যাক, খবরের কাগজে ত দেখেছি বিলাত থেকে অনেকদিন ফিরেছো। এতদিনে বুঝি তোমার মনে পড়লো আমাকে।

শৈবাল সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বলে, চিকিৎসা করাচ্ছো ত? কে করছে চিকিৎসা?

পাড়ার একজন ছোকরা ডাক্তারই চিকিৎসা করছে।

ছোকরা ডাক্তার! কোন চেস্ট্ স্পেশালিস্ট্‌কে দেখাও নি?

বাবাঃ! তোমাদের সব চেস্ট্ স্পেশালিস্টদের যা ফিসের বহর! ষোল, বত্রিশ, চৌষট্টি—অত পাবো কোথায় তাই বলো?

তাই বলে এভাবে মৃত্যুকে ডেকে আনবে! আজকাল আর এ রোগে কেউ মরে নাকি!

মরে ভাই মরে। চিরদিন সৌভাগ্যের মধ্যে কেটে যাচ্ছে তোমাদের, তোমরা কোথা থেকে জানবে দোতলার বাসিন্দারা যখন চাঁদের আলোয় সেতার বাজায়, নিচের তলায় তখন একটু হাওয়ার জন্য হাঁপাতে থাকে সেখানকার বাসিন্দারা। শুধু ষোল, বত্রিশ, চৌষট্টির চৌকাঠই ত নয়, তারপরেও যে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, PASয়ের মরণ কামড় আছে। কোন্ দিক্ আমরা সামলাই বল ত। তুমি হয়ত এখুনি বলবে হাসপাতালের কথা, কিন্তু সেখানকার কিউ ঠেলে যদি বা কোনমতে ভিতরে উঁকি দিতে পারি, একটা এক্স-রে বিনিপয়সার প্লেটের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ততদিনে সারা বুকটাই ঝাঁজরা হয়ে যাবে। কিন্তু থাক ওসব কথা। কতদিন পরে এলে, বোস—গল্প করা যাক।

কিন্তু আমি বিলাত থেকে ফিরে এসেছি এ খবরটা যখন পেয়েছো তখন এও নিশ্চয়ই পেয়েছিলে ঐ ব্যাধিরই শিক্ষা আমি নিয়ে এসেছি। আমাকে একটা সংবাদ পাঠালেও ত পারতে।

পারতাম যে নয় ভাই, তা নয়। কিন্তু বিরক্ত তোমায় করিনি এই ভেবেই যে তুমি ব্যস্ত মানুষ। তাছাড়া এখানে এলে ত তুমি ফিস্ পেতে না।

মীনুদি!

রাগ করছো কেন শৈবাল। কথাটা সত্য বলেই রূঢ় মনে হচ্ছে। ডাক্তারকে ডেকে এনে তার যোগ্য ফিস্ না দিতে পারার মধ্যে যতখানি লজ্জা আছে, তেমনি বন্ধুত্বের অজুহাতে না দেবার সুযোগ নেবার মধ্যেও আছে ঠিক ততখানি নীচতা।

হাসপাতালে যাবে মীনুদি!

যেতে পারলে ত বেঁচে যাই ভাই, কিন্তু প্রবেশের পাসপোর্ট পাবো কোথায়?

সে ব্যবস্থা আমিই করবো।

এবং সে রাত্রে শৈবাল যে কথা জিজ্ঞাসার জন্য এসেছিল সে কথা আর তার জিজ্ঞাসা করা হলো না। বাড়িতে ফিরে এলো।

পরের দিন হাসপাতালে গিয়ে প্রথমেই শৈবাল ডাঃ অধিকারীর সঙ্গে দেখা করল।

ডাঃ অধিকারী দুই ওষ্ঠের মধ্যে একটা জ্বলন্ত সিগ্রেট চেপে ধরে ধূমপান করতে করতে বললেন, ইটস্ ডিফিকাল্ট! দেখি কতদূর কি করা যায়।

শৈবাল নিচে নেমে এসে আউটডোরে তার বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সেই শীর্ণ ফ্যাকাসে ক্ষয়রোগাক্রান্ত নরনারীর দল। তার মধ্যে বেশীর ভাগই যুবক-যুবতী। ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দেশের অসংখ্য প্রাণ! তিলে তিলে নিঃশেষে রোগে অনাহারে দারিদ্র্যে ও চিকিৎসার অভাবে।

জুনিয়ার হাউস ফিজিসিয়ান মলয় দত্ত সামনে এসে দাঁড়াল।

কি খবর মলয়!

একজন ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কি নাম?

বিকাশ সেন নাম বললেন, প্রেসিডেন্সীতে নাকি আপনাদের সঙ্গে পড়তেন।

বিকাশ সেন!

এক বিকাশ সেন ত ছিল, ডিস্ট্রিক্ট স্কলারসিপ নিয়ে এসে তাদের কলেজে ভর্তি হয়েছিল বর্ধমানের এক গণ্ডগ্রাম থেকে। চমৎকার রিসাইটেশন, থিয়েটার করতে পারতো।

শৈবাল বললে, যাও পাঠিয়ে দাও।

শৈবাল তার স্ক্রিন্ দিয়ে ঘেরা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসল।

শৈবালের অনুমান মিথ্যা নয়। সেই বিকাশ সেনই! কিন্তু প্রথমটায়

তাকে দেখে শৈবাল চিনতে পারেনি। গায়ের রং তার বরাবর কালো থাকলেও সে সময় চোখে মুখে চেহারায় একটা অদ্ভুত দীপ্তি ছিল বিকাশের, কিন্তু এ যে তার প্রেত বলে মনে হচ্ছে।

কালো রংয়ের উপরে যেন আর এক পোঁচ কালি পড়েছে। মুখটা ভেঙে শুকিয়ে গিয়েছে। গালের দুপাশের হনু দুটো বিশ্রীভাবে ঠেলে উঠেছে। মাথার চুল প্রায় দুয়ের তিন অংশ পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। কেবল সমস্ত কিছুর ভিতরে যেন জেগে আছে বুদ্ধিদীপ্তিতে ঝকঝকে চোখের তারা দুটো, বাকী চেহারাটা জীর্ণ ফোঁপরা—ক্লিষ্ট অবসন্ন।

বেশভূষার মধ্যেও একটা দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

অথচ তার চাইতে ত বেশী বয়স নয় বিকাশের।

কয়েক বৎসর আগেকার শ্যামল দীপ্ত সে তরুণ কোথায়!

কলেজে ভর্তি হবার পর ইণ্টার কলেজ রিসাইটেশন কমপিটিশনে ওর আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়েই শৈবাল যেচে ওর সঙ্গে আলাপ করেছিল। বাংলা আবৃত্তিতে ও প্রথম হয়েছিল।

আজও মনে আছে শৈবালের:

কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি 'পরে—

আশ্চর্য! সেই বিকাশ সেন! আই. এস. সি. পাস করবার পর শৈবাল ডাক্তারী পড়তে চলে আসে। তারপর এক-আধবার বৎসরখানেক দেখা হয়েছে। আই. এস. সি-তে প্রথম বিভাগে পাস করেছিল ও, কিন্তু বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিস্টে ওর নাম আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শৈবাল ওর নামটা খুঁজে পায়নি তার কারণ ছিল, যদিও সে সেটা জানত না। কারণ স্কলারশিপ না পাওয়ায় বিকাশ বি. এ. পরীক্ষা আর দিতে পারেনি।

শৈবাল! আমাকে চিনতে পারছো?

না বললেই ভাল হতো, কিন্তু এ কি তোমার চেহারা হয়েছে হে!

হবে না? বুকের মধ্যে যে তাঁরা বাসা বেঁধেছেন! কিন্তু অমিয় বিশ্বাস করতে চায় না সে কথা। বলে পার্শ্বেই দণ্ডায়মান বাইশ তেইশ বৎসরের সুশ্রী তরুণীটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল বিকাশ।

বিকাশের স্ত্রী অমিয়া সত্যাই সুন্দরী এবং অতি সাধারণ একখানা শাড়ি ও ছিটের একটা ব্লাউজ গায়ে, হাতে মাত্র একগাছি সোনার রুলি ও শাঁখাতেই যেন

তাকে দেখাচ্ছিল অপূর্ব। অল্প ঘোমটা তোলা। ছোট কপালে গোলাকার সিন্দুর টিপটি যেন স্বামী-সোহাগের প্রতীক।

সে যে একজনের সহধর্মিণী তা যেন ওই কপালের গোলাকার সিন্দুর টিপ ও সিঁথির সিন্দুর রেখাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রভাত-সূর্যের মত।

উনি বলছিলেন আপনি নাকি ওঁকে চিনতেই পারবেন না। কিছুতেই আসতে চাইছিলেন না, জোর করে আমি আপনাকে দিয়ে একবার পরীক্ষা করাবার জন্য এখানে নিয়ে এলাম। অমিয়া বললে।

না চিনতে পারাটাই ত স্বাভাবিক। একদা কোন্ অতীতে পথ চলতে হঠাৎ পথের বাঁকে কার সঙ্গে কার দেখা হয়েছিল। পাশাপাশি চলতে চলতে দু-চারটে কথা হয়েছিল তা কারো মনে থাকে, না কেউ মনে রাখে? তাই ত তুমি যে আমাকে চিনতে পারলে, এখনো এটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। বিকাশ বলল।

ডোণ্ট্ টক্ ননসেন্স! চিনতে পারবো না কেন বল ত!

সত্যি ভাই, তোমার বিলাত হতে প্রত্যাগমনের পর সংবাদপত্রে তোমার ছবি ও সংবাদ পড়তে পড়তে অমিয়াকে যখন বললাম, কলেজ লাইফে তুমি আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলে, সেইদিন থেকেই ও কেবল আমাকে তাগাদা দিয়ে আসছে—চল একবার তাঁকে দেখিয়ে আসবে, কিন্তু ভয়ে আসতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত পড়াশুনা হলো না। বাবার এক বন্ধুর সুপারিশে এক মার্চেণ্ট অফিসে কোনমতে একটা ১৩০৲ টাকার চাকরি জুটিয়ে নিয়ে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত। পরাজিতের দল আমরা—তোমরা আমাদের চিনতে পারবে ভাবি কেমন করে বল! জয়ীর রথচক্র যে চলে পরাজিতেরে পশ্চাতে ফেলে পথের ধুলায়!

যাক্! কি হয়েছে এখন বল ত।

কি যে হয়নি সেটাই বল। ক্ষিধে নেই, সন্ধ্যার দিকে শীত-শীত করে একটু জ্বর আসে, শেষরাত্রের দিকে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। পাড়ার ডাক্তার চিকিৎসা করছেন। বললেন, শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব, তাই ক্যালসিয়াম ইনজেকশন নিচ্ছি।

আপনি একবার ওকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন, অমিয়া অনুরোধ জানাল। উনি কেবলই বলেন টি. বি. কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।

স্ক্রীনের আড়ালে নিয়ে গিয়ে বিকাশকে শৈবাল বলে, জামাগুলো সব খুলে ফেল বিকাশ।

খুব মনোযোগ সহকারে নানাভাবে পরীক্ষা করলো শৈবাল। এবং বুঝতে তার বাকী রইলো না বিকাশের অনুমান মিথ্যা নয়। টি. বি-ই তার বাম ফুসফুসে বাসা বেঁধেছে বেশ ছড়িয়েই। কিন্তু মুখে সে একটি কথাও বললে না।

কি দেখলে? কিছু পেলে? টি. বি-ই ত! বিকাশ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

শৈবালের দু চোখের দৃষ্টিতে তখনও জ্বলজ্বল করে জ্বলছে অমিয়ার কপালে এয়োতির চিহ্ন, সিন্দুর টিপটি—ভোরের আকাশে অরুণোদয়ের মতই। সে বললে, কে বলেছে তোমাকে ওসব কথা। কিছু না, ভাল হয়ে যাবে। চল বাইরে চল।

উৎকণ্ঠিতা অমিয়া প্রশ্ন করে, কি দেখলেন শৈবালবাবু?

কিছু ভয়ের নেই। সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ভাল হয়ে যাবে।

টি. বি. নয়ত?

না না—টি. বি. হতে যাবে কেন?

দেখলে! বলেছিলাম না তোমাকে? হলো ত? এখন বিশ্বাস হলো ত?

রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে'র সব ব্যবস্থা হাসপাতালেই করে দিয়ে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা লিখে দিল শৈবাল।

এই যা যা লিখছি এইভাবে চলবেন। আবার শনিবার আসবেন। ওর মনে যখন সন্দেহ জেগেছে, একটা এক্স-রে তুলে ওর সন্দেহটা মিটিয়ে দেওয়াই ভাল, কি বলেন!

বেশ ত। শনিবার আসবো।

॥ ১১ ॥

কিন্তু শনিবার নয়, সে দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যায় চেম্বারের কাজ সেরে শৈবাল উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় সুইং-ডোরে ওপাশে একটা ক্ষীণ পদশব্দ পাওয়া গেল।

দেখা গেল স্যাণ্ডেল পরিহিত দুখানি পা ও পদপ্রান্তে শাড়ির ঘেরটি।

কে?

ভিতরে আসতে পারি কি শৈবালবাবু! সংকুচিত নারীকণ্ঠে প্রশ্ন এলো।

আসুন!

ভিতরে প্রবেশ করল বিকাশের স্ত্রী অমিয়া।

একি বৌদি! কি খবর—বসুন। বসুন! বিকাশ কেমন আছে?

রক্ত! ক্ষীণ কণ্ঠে শব্দটি উচ্চারণ করল অমিয়া কেবল। চোখ দুটি তার ছলছল করে এলো।

রক্ত!

হ্যাঁ! ওর গলা দিয়ে আজ বিকেলের দিকে কাশতে কাশতে একঝলক রক্ত পড়েছে। বলতে বলতে কান্নায় শেষের দিকে অমিয়ার গলাটা যেন বুঁজে এলো।

বহু কণ্ঠে বহুবার ঠিক এমনি ভাবেই শোনা সংবাদটা এমন কিছু শৈবালের কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। তবু কয়েকটা মুহূর্ত প্রত্যুত্তরে কোন কথাই বলতে পারল না শৈবাল, কেবল অমিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আজ অমিয়ার কপালের ওপরে দুই বঙ্কিম ভ্রূর মধ্যস্থানে গোলাকার সিন্দূর টিপটি যেন প্রথম অরুণোদয়ের মতই জ্বলজ্বল করছে সেদিনকার মতই।

অথচ ও জানেও না যে ঐ রক্ত সিন্দূরের টিপটি মুছবার সময় হয়ে এসেছে।

ব্যস্ত হবেন না আপনি, বসুন বৌদি। সব ব্যবস্থাই আমি করছি।

তবে সত্যিই ওর টি. বি।

কি জানি কেন, আজ আর ঐ মুহূর্তে ওই চরম প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে মিথ্যা স্তোকটা কিছুতেই মুখে উচ্চারণ করতে পারল না শৈবাল। একটু ইতস্ততঃ করে বলে, হ্যাঁ, মানে টি. বি-ই, তবে আপনি অত ভাবছেনই বা কেন! সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো। রোগকে ক্ষয় করবার ঔষধ ত আজ আমরা পেয়েছি।

শৈবালের মুখ থেকে চরম কথাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এতদিনকার সদা ভয়ে আশঙ্কায় লালিত অমিয়ার শেষ প্রত্যাশাটুকু যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, কিছুক্ষণ মনে হলো যেন অমিয়ার পায়ের তলাকার মাটি একেবারে ফাঁকা। শূন্যের মধ্যে যেন সে ঝুলছে। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন নিমেষে শেষ মীমাংসায় সে পৌঁছে গেছে। আর কোন ভয় নেই। নিভৃত নিশীথ রাত্রে, নিষ্পলক নিদ্রাহীন চোখে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বেহুলার মত শব-সাধনার তার শেষ হলো। ভয়ে ভয়ে সেই চরম আদেশটি শোনবার জন্য সমস্ত অনুভূতিকে জাগ্রত করে আর তাকে প্রতীক্ষার বেদনা বহন করতে হবে না। চরম প্রত্যাদেশের জন্য আর পলে পলে তাকে শর্বরীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাতে হবে না।

বৌদি!

নিঃশব্দে শৈবালের ডাকে মুখ তুলে তাকাল অমিয়া।

চলুন বৌদি! উঠুন!

প্রাণহীন পুত্তলীর মত উঠে দাঁড়াল অমিয়া। শৈবালের সঙ্গে সঙ্গে অমিয়া তার অপেক্ষমান গাড়িতে এসে উঠে বসল। পথে গাড়ি ঘুরিয়ে শৈবাল মার্কেট থেকে এক ঝুড়ি ফল, একটা ঔষধের দোকানে নেমে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ঔষধ কিনে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললে, বাড়ি কোথায় বৌদি ?

গুলু ওস্তাগর লেনে ৪।১।এ। মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল অমিয়া।

গুলু ওস্তাগর লেনের মধ্যে একটা সংকীর্ণ অন্ধকার বাই-লেনের শেষ প্রান্তে একতলা একটা বাড়ির তিনখানা ঘর নিয়ে ওদের বাসা।

কড়া নাড়তেই একজন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুলে বললেন, বৌমা এলে ?

পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল অমিয়া অসুস্থ স্বামীর কাছে। অমিয়ার পিছু পিছু শৈবাল এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

মাঝারি গোছের আলো-বাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে নীচু একখানি ঘর। তারই মধ্যে একটা তক্তাপোশের উপর মলিন শয্যায় শুয়ে ছিল বিকাশ চোখ বুঁজে। ঘরের একধারে একটি লণ্ঠন জ্বলছে।

ওদের পদশব্দে চোখ খুলে তাকাল বিকাশ। মৃদু কণ্ঠে ডাকল, অমিয়া !

বিকাশ ! এগিয়ে এলো শৈবাল।

কে ! শৈবাল ! তোমাকে বুঝি অমিয়া ধরে নিয়ে এলো ? দেখো ত, মিথ্যে মিথ্যে কষ্ট দিল !

শৈবাল এগিয়ে এসে শয্যায় বসলো, হাতটা দেখি।

হাতটা বাড়িয়ে দিতে দিতে স্মিত কণ্ঠে বিকাশ বললে, কি দেখবে, পাগল্! কিন্তু ফুসফুস চিরে নেমেছে যার রক্তবন্যা তাকে আর নাইবা ঠেকাবার মিথ্যে চেষ্টা করলে ভাই !

কি আবোল-তাবোল বকছো বল ত! ধম্‌কে ওঠে শৈবাল বিকাশকে।

কলেজ-লাইফে একদা কবিতা লিখতাম—মনে আছে তোমার, শৈবাল! হারিয়ে গিয়েছিল সংসারের ঘূর্ণাবর্তে সে কবিতা আমার এতদিন। হঠাৎ তাকে আবার যেন খুঁজে পাচ্ছি! চমৎকার একটা কবিতা মনে আসছে, শুনবে শৈবাল ?

প্রাণ নির্যাসের রক্তশতদল
শেষ প্রণামের মত রেখে যদি যাই,
কতটুকু ক্ষতি কার তাতে—
এই পৃথিবীতে—

আঃ থাম ত বিকাশ! আমাকে একটু পরীক্ষা করতে দাও।

থৈ পাবে না হে, থৈ পাবে না।

কথা বলতে বলতে আবার একটা কাশির বেগ এলো এবং সেই সঙ্গে আবার খানিকটা লাল তাজা রক্ত বের হয়ে এলো। স্তব্ধ বিস্ময়ে শৈবাল সেই টকটকে লাল রক্তের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রক্ত ত নয়, পাঁজরের তলা থেকে সযত্ন সঞ্চিত প্রাণবিন্দু যেন উগরে দিল বিকাশ।

বুকের ব্যাধির বিশেষজ্ঞ শৈবাল। আর রোগী ও রোগিণীদের মধ্যে রক্ত-বমনের ইতিহাস তার কাছে নতুন নয়। তবু সামনে একেবারে চোখের উপরে একজনকে রক্তবমন করতে দেখে শৈবাল যেন কেমন বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে পড়ে মুহূর্তের জন্য। মুখ দিয়ে তার একটি বাক্যও উচ্চারিত হয় না।

বাঁ হাত দিয়ে রক্তে ভিজা ওষ্ঠের প্রান্তটা মুছে নিতে নিতে স্মিত হাস্যে বিকাশ বললে, কি হে বিলাত ফেরত ডাক্তার, পারবে এ রক্তবন্যাকে রোধ করতে?

এমন সময় সহসা একটা শিশুকণ্ঠ শোনা গেল, বাবা!

চম্‌কে উঠলো সে ডাকে যেন শৈবাল! এবং সে ডাকের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশের ব্যাকুল কণ্ঠ শোনা গেল, আসিস না, আসিস না এ ঘরে খোকা। আসিস না বাবা!

বছর ছয়-সাতেকের একটি ছেলে। সেদিকে তাকিয়ে শৈবালের দৃষ্টি যেন আর ফিরতে চায় না। মোমে গড়া একটি পুতুল যেন। একটি হাফ্‌প্যান্ট ও গেঞ্জি পরিধানে। খালি পা। ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে সে। একপাশে মুহ্যমানের মত ঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে অমিয়া অনড় পাষাণ পুতুলের মত দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে বিকাশ বলে ওঠে, নিয়ে যাও! ওকে এ ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, অমিয়া! ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও!

অমিয়া এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির হাত ধরতেই সে প্রতিবাদ জানায়, না, আমি বাবার কাছে যাবো।

কিংশুক! লক্ষ্মী বাবা আমার! দেখছো না ওঁর অসুখ। চল আমরা পাশের ঘরে যাই। অমিয়া ছেলেকে অনুরোধ করে।

না। যাবো না! বাবার কাছে আমি যাবো।

আঃ অমিয়া, কি করছো তুমি, নিয়ে যাও না খোকাকে এ ঘর থেকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বিকাশ আবার বলে।

অমিয়া একপ্রকার জোর করেই এবারে যেন কিংশুককে নিয়ে মধ্যবর্তী দরজা-পথে পাশের ঘরে চলে গেল।

আমার একমাত্র ছেলে, জান শৈবাল! কিন্তু ওর জন্য আমি কি রেখে যাচ্ছি—দারিদ্র্য, নিষ্ঠুর পৃথিবী, নিরাশা, আর এই রোগের সম্ভাবনা! এমন চমৎকার উত্তরাধিকারের জন্য ও ঠিক আমারই মত কখনো হয়ত এ জীবনে জানাবে না ওর পিতাকে অভিসম্পাত। আমিও কখনও জানাইনি। আমার বাবারও এই রোগে মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু এ উত্তরাধিকারের পরিক্রমা কি বন্ধ করা যায় না?

চুপ করো বিকাশ। কেন তুমি মুষড়ে পড়ছো! আমি বলছি তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। আজকের দিনে এ রোগে মানুষ মরে না। ঔষধ খাও, বিশ্রাম নাও, আবার তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

হয়ত তোমার কথা মিথ্যা নয় শৈবাল। কিন্তু ঔষধ খাবো, বিশ্রাম নেবো, সে পুঁজি আমার কোথায়? এক মাস ত দূরের কথা, দশ দিন শয্যায় শুয়ে থাকলেও যে চলবে না আমার! কে দেখবে ওদের!

আপাততঃ ওসব ভাবনা তুমি বাদ দাও ত।

কিন্তু শৈবাল, তোমরা ত বুঝবে না, বাদ দেব বললেই ও ভাবনা আমাদের মত বিকাশদের বাদ দেওয়া চলে না। যে পরিধেয় বস্ত্রের সবটাই রিফুতে ভর্তি, সেটার বেশী টানা-হিঁচড়া সহ্য হবে কেন। যক্ষ্মার কোন অব্যর্থ ঔষধ হয়ত আবিষ্কৃত হয়েছে সত্যি। কিন্তু দারিদ্র্য রোগের ঔষধ কি আজও তোমরা আবিষ্কার করতে পেরেছ? কেমন করে তবে বিকাশদের মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখবে শৈবাল! তোমার এই বন্ধুই এ দুনিয়ার মাত্র একজন বিকাশ নয় শৈবাল, হাসপাতালের গদিতে বা চেম্বারে বা ডাক্তারখানায় বসে তোমরা রোগীর চিকিৎসা করো, তাদের ব্যবস্থাপত্র দাও, কিন্তু জেনো ভাই হাসপাতালের বা তোমাদের চেম্বারের বা তোমাদের ডাক্তারখানার ঐ প্রাচীর-ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যেই তোমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমস্ত নিদান বা বিধানই রোগ বা রোগীর শেষ কথা নয়! রোগের সন্ধান যদি পেতে চাও, রোগীদের সত্যিই যদি বিধান দিতে চাও, সত্যিই যদি চিকিৎসক হতে চাও ত খুঁজে দেখো, চোখ মেলে দেখো, সত্যিকারের কোন্ কোন্ রোগ মানুষের জীবনী-শক্তিকে দিবারাত্র শোষণ করে নিচ্ছে, ক্ষয় করে ফেলছে। তারপর বের করো তার নিদান, শুধু হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে এবং ব্যক্তিগত সামর্থ্যের মধ্যেই আটকে থাকবে না—ধনী নির্ধন নির্বিশেষে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছাবে, সহজপ্রাপ্য হবে। আড়াই টাকা

একটা ক্লোরোমাইসিটিন, একরোমাইসিন বা তদ্রূপ মূল্যের পাস (PAS) বের করে কি হবে। কোন লাভ নেই। কোন বাহাদুরি নেই।

একটানা কথাগুলো বলে যেন হাঁপাতে থাকে বিকাশ। চিরদিনের স্বপ্ন-বিলাসী বিকাশ কি আজ জীবন-যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে রোগের হাতে, সমস্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের বিরুদ্ধেই জানাচ্ছে ক্ষোভ, এবং ক্ষোভ কেবলই ঐ বিকাশেরই বুকে নয়, আজ বহু ঘরে ঘরে এই ক্ষোভের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে লক্ষ কোটি অসহায় মানুষের বুকের মধ্যে।

যাহোক আপাতত বিকাশকে একটা বোম্বাগুলেন, ভিটামিন কে ও মরফিন ইনজেকশন দিয়ে অমিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে উঠলো শৈবাল।

কিন্তু সমস্ত ফিরতি পথটাই বিকাশের কথাগুলো তার দু কানের মধ্যে যেন ঝঙ্কার তুলে ফিরতে লাগল। সত্যি এমন কি আরোগ্য-নিকেতন মানুষ কোন দিন গড়ে তুলতে পারবে না, যেখানে যাবতীয় জীবনধ্বংসী জীবাণুকে নিঃশেষে ধ্বংস করে মানুষকে সর্বপ্রকার রোগ হতে মুক্তি দেওয়া যাবে!—যে আরোগ্য-নিকেতন বা হাসপাতালে কেবল ফরমূলা অনুযায়ী বাঁধাধরা পথেই চিকিৎসকের দল ঘুরপাক খেয়ে ফিরবে না এবং যে পর্যন্ত তাদের সীমা তার বাইরে গেলেই অসহায় বেদনায় পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে আসবে না,—দুর্লঙ্ঘ্য-বিধানে তাকে সম্পূর্ণ দূর করবে এবং সত্যকারের রোগমুক্ত করে মানুষকে পূর্ণ-জীবন দেবে।

পঙ্গু বার্ধক্যজর্জরিত দেহে মৃত্যু আসুক ক্ষতি নেই, কিন্তু সে মৃত্যু কেন আসবে কোন ব্যাধির বাহন হয়ে অকস্মাৎ নোটিশ জারী করতে যৌবনোচ্ছল দেহে!

এমন কোন চিকিৎসা, বিধান বা ঔষধ মানুষ কি আবিষ্কার করতে পারবে না কোনদিন, প্রত্যেকটি ভয়াবহ জীবনধ্বংসী রোগ-বীজাণুর সহায়ক হিসাবে যা হবে যেমন অব্যর্থ, তেমনি সহজলভ্য—চিকিৎসকেরা শুধু নির্ণয় করবে সেই ব্যাধি, তারপর হবে যার প্রয়োগ। এক-আধ জন ফ্লেমিং, পাস্তুর বা মাদাম কুরীতে হবে না। অনেক পাস্তুর, অনেক ফ্লেমিং, অনেক কুরীর প্রয়োজন। চাকরি দেবার বেলায় বিজ্ঞাপনে কেবল 'রিসার্চ মাইনডেড' লোক চাই বলে লোক-দেখানো হাস্যকর বোলচাল দিলেই হবে না। গড়ে তুলতে হবে আগামী ছাত্রদের মধ্যে থেকেই রিসার্চের লিপ্সা তাদের মনে, যোগাতে হবে তাদের খোরাক, দিতে হবে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা।

কিন্তু কবে? কবে সেদিন আসবে? কবে সে ধরনের হাসপাতাল বা আরোগ্য-নিকেতন গড়ে উঠবে?

॥ দোলন চাঁপা ॥

গৌতম ধাক্কা খেয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে ল্যাবরেটরী থেকে চলে যাবার পর বিরক্ত চিত্তেই ডাঃ ঘোষাল তাঁর টেবিলের সামনে আবার ফিরে এলেন। তুলে নিলেন স্ট্যাণ্ডের ওপর থেকে টেস্ট্ টিউবটা। কিন্তু অর্ধসমাপ্ত কাজ আর তাঁর এগোয় না।

বার বার মনের সমস্ত সুসংবদ্ধ বিজ্ঞান চিন্তাকে একপাশে সরিয়ে ভেসে ওঠে চোখের সামনে একটি কচি ছেলের মুখ।

মাথা-ভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। টানা-টানা দুটি হরিণশিশুর মত কালো চোখ। টেস্ট্ টিউবটা নামিয়ে রেখে ডাঃ ঘোষাল টেবিলের সামনে টুলটা টেনে নিয়ে এসে বসলেন। টেনে নিলেন খাতা পেনসিল। কিন্তু সে মুখটা কিছুতেই মনের পাশ থেকে সরছে না!

যতবার মনকে বোঝাতে চান, বেশ করেছেন—অন্যায় কিছু করেননি, ততবারই মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ কণ্ঠ যেন বলে ওঠে, অন্যায় করেছো তুমি, অন্যায় করেছো!

এবং তার পরের দুটো দিন সমস্ত কাজের মধ্যেও তাঁর মন পড়ে রইলো সামান্য একটা শব্দের দিকে—একটি লঘু পদধ্বনি শোনবার প্রত্যাশায়। বার বার ইন্দুরের খাঁচাটার দিকে চোখের দৃষ্টি ফিরে ফিরে যেতে লাগল।

এদিকে নির্মল মাসখানেকের ছুটিতে দেশে যাওয়ায় শর্বরীই আজকাল প্রত্যহ সকাল বেলাটা নার্সিংহোমের কাজ করে, বেলা বারোটা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা-ছটা পর্যন্ত ল্যাবরেটরীতে এসে ডাঃ ঘোষালকে তাঁর গবেষণার কাজে সাহায্য করছে।

সেদিন দ্বিপ্রহর, আকাশটা একটু মেঘলা মেঘলা করেছে। ল্যাবরেটরীর এক কোণে শর্বরী কি একটা এস্টিমেশন নিয়ে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, ডাঃ ঘোষালও একটা ক্যালকুলেশন নিয়ে ডুবে আছেন—এমন সময় পা টিপে টিপে তীরধনুক হাতে আবার গৌতম এসে ঢুকল ল্যাবরেটরীর মধ্যে ভীতচকিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে।

ভীষণ রেগে গিয়েছে সে দৈত্যটার উপরে। কেন তাকে সেদিন দৈত্যটা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল! আজ দেখাবে সে মজা। সে বুঝে নিয়েছে নিশ্চয়ই ঐ খাঁচার ইন্দুরগুলোর মধ্যেই কোন একটা ইন্দুরের প্রাণেই আছে

দৈত্যটার প্রাণ লুকানো। সেটাকে সে আজ তীরধনুক দিয়ে খতম করে দেবে। নিশ্চয়ই দেবে। ঘুমন্ত জানকীকে না জানিয়ে চুপি চুপি আজ সে এসেছে দৈত্যনিধনে।

পা টিপে টিপেই গৌতম গিয়ে দাঁড়াল খাঁচাটার সামনে। তারপর তীরধনুকটা পাশে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে ইন্দুরগুলোকে দেখতে লাগল। কোন্ ইন্দুরটা আসল ইন্দুর!

এবং হঠাৎ ঐসময় গবেষণার কাজ থেকে চোখ তুলে ডাঃ ঘোষাল যে গৌতমকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন, তা সে টেরও পায়নি।

নিঃশব্দে ডাঃ ঘোষাল উপবিষ্ট গৌতমের পশ্চাতে এসে দাঁড়ান। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি গৌতমকে লক্ষ্য করেন। তারপর নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, কি দেখছো—ওগুলো সাদা ইন্দুর।

নিজের কল্পনার মধ্যে এতখানি ডুবে ছিল গৌতম যে তার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে কে কথা বলছে ঐ মুহূর্তে সে খেয়াল করেনি।

নিজের ভাবে বিভোর থেকেই সে জবাব দেয় মুখ না ফিরিয়েই, দেখছি কোন্ ইন্দুরটার মধ্যে দৈত্যের প্রাণ লুকানো আছে।

দৈত্য!

হ্যাঁ। সেদিন দৈত্যটা আমাকে এমন ধাক্কা দিয়েছে। আর ইন্দুরটাকে মারতে পারলেই সে মরে যাবে!

ইন্দুরটাকে মারতে পারলেই সে মরে যাবে?

হ্যাঁ। ঐ ইন্দুরের মধ্যেই তার প্রাণ আছে আমি জানি।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হঠাৎ ডাঃ ঘোষাল যেন সব কিছু ভুলে হো হো করে হেসে ওঠেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর সেই হাসির শব্দে চোখ ফিরিয়ে গৌতম ডাঃ ঘোষালকে দেখেই কয়েকটা মহূর্ত স্তব্ধ হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই টক্ করে উঠে পড়ে এক দৌড়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায়।

এদিকে নিস্তব্ধ ঘরে ডাঃ ঘোষালের আচমকা অমনি অস্বাভাবিক উচ্চ হাসির রোল শুনে শর্বরী তাড়াতাড়ি ঐদিকে এগিয়ে আসে, এসে দেখে ইন্দুর ও খরগোসের খাঁচাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে তখনও ডাঃ ঘোষাল হো হো করে হাসছেন আপন মনেই একা একা।

প্রথমটায় শর্বরী ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারে না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে

সে ডাঃ ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে ডাকে, ডাঃ ঘোষাল?

ঠিক! হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে! ঠিক! ঠিক বলেছে, দৈত্যই ত আমি! হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে মাথাটা দোলাতে দোলাতে ডাঃ ঘোষাল বলেন শর্বরীর দিকে না তাকিয়েই আপন মনে।

দৈত্য আপনি! কি বলছেন?

হ্যাঁ। দৈত্য নয়, আমি দৈত্যই ত! আবার বলেন ডাঃ ঘোষাল!

ডাঃ ঘোষাল!

ঐ যে ও বলে গেলো। ঠিক ঠিক বলেছে!

কিন্তু এখানে তো কাউকে দেখছি না, কে? কে বলেছে?

কেন ঐ যে ছেলেটি বলে গেল!

ছেলে?

ব্যাপারটা যেন শর্বরী মাথামুণ্ড কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। হতভম্বের মত সে ডাঃ ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বলে, ছেলে?

হ্যাঁ, ছেলে একটু আগে এ ঘরে এসেছিল যে?

কিন্তু কোথায় সে?

পালিয়েছে। বলেই যেন এতক্ষণ পরে হঠাৎ শর্বরীর মুখের দিকে তাকাতেই সহসা ডাঃ ঘোষাল বদলে যান।

কিন্তু কার—কার কথা আপনি বলছেন ডাঃ ঘোষাল?

ছেলে, তোমার ছেলের কথা বলছি।

আমার ছেলে!

হ্যাঁ, তোমার ছেলে! কিন্তু কেন তাকে ছেড়ে দাও এভাবে বলতে পারো! এ ঘরে কত সব দামী দামী জিনিসপত্র রয়েছে, ধর একটা যদি কিছু নষ্ট করে ফেলে!

আমি—আমি অত্যন্ত দুঃখিত ডাঃ ঘোষাল। তাকে সাবধান করে দেবো।

হ্যাঁ, দিও। এসব আমি আদপেই পছন্দ করি না। বলতে বলতে নিজের জায়গায় আবার ফিরে গেলেন ডাঃ ঘোষাল।

সে-রাত্রে ঘুমাবার আগে শর্বরী ছেলেকে নিষেধ করে দিল আর যেন সে কখনো ও-বাড়িতে না যায়।

কেন মা!

দৈত্য মারবে এবারে।

তার আগেই আমি দেখ না দৈত্যকে শেষ করে দেবো। আমার তূণে ব্রহ্মাস্ত্র আছে।

ওরে না! না—ওদিকে যাস্ না আর গৌতম!

দিন দুই বাদে সেদিন সকাল আটটা-নটার সময় ডাঃ ঘোষাল একাকী তাঁর বাড়ির পশ্চাতের বাগানে পায়চারি করছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন গৌতমের কণ্ঠস্বর। শুনেই চমকে তাকালেন। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখলেন, ডালিয়ার ঝাড়টার ওদিকে হাতে তীরধনুক নিয়ে গৌতম তার সামনের একটা ইউক্যালিপটাস্ গাছের চারাকে লক্ষ্য করে বলছে :

একলব্য নাম মোর। তোমারেই গুরু-
পদে বরি, ঐ মূর্তি গড়িয়াছি তব—
তোমারই চরণতলে শিক্ষা যত কিছু
মোর!…

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকেন গৌতমের কাণ্ডকারখানা ডাঃ ঘোষাল নিঃশব্দে কিছুক্ষণ আড়াল থেকে। তারপর একেবারে নিঃশব্দেই পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ান ওর পশ্চাতে। ইতিমধ্যে গৌতমের হাতের নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর বড সাধের, বড যত্নের রোপিত ইউজেনিন গোলাপের গাছে, কাল সকালে যে দেখেছিলেন প্রথম ফুলটি ফুটেছে, সেটি মাটিতে বৃন্ত ভেঙে পড়েছে।

গৌতম তখন বলছে :

হের! হের গুরুদেব,
অব্যর্থ নিশান মোর—হের
তব পদপ্রান্তে মূক সারমেয়!

ডাঃ ঘোষাল আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।

ডেকে উঠলেন, গৌতম!

কে?

বলেই ফিরে তাকিয়ে পশ্চাতে ডাক্তার ঘোষালকে দণ্ডায়মান দেখে যেন পাথরের মত জমাট বেঁধে যায় বেচারী গৌতম!

তোমার নাম গৌতম!

ততক্ষণে গৌতম ছুটে পালাবার জন্ম যেমন লাফ দিয়েছে, ঝুঁকে পড়ে ডাঃ ঘোষাল পলায়নপর গৌতমের একটা কচি হাত ধরে ফেললেন, আরে! শোন,

শোন—ভয় নেই তোমার, দৈত্য তোমাকে কিছু বলবে না। দৈত্য তোমার আজ থেকে বন্ধু!

বন্ধু শব্দটি গৌতমের অপরিচিত নয়। সে এবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। বললে, বন্ধু!

হ্যাঁ। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু। কেমন রাজী ত? আর আমাকে দেখে ছুটে পালাবে না ত?

বকবে না তুমি আমাকে কখনো!

বন্ধু কি কখনো বন্ধুকে বকে?

তাহলে আর তোমাকে মারবো না।

না। মেরো না।

ভাব হয়ে গেল দুটি অসমবয়সী পুরুষ ও শিশুর সঙ্গে।

এবং তারপর থেকে প্রত্যহই কি এক অদৃশ্য টানে ডাঃ ঘোষাল সকালেই ছুটে যেতেন বাগানে, গৌতমও এসে হাজির হতো, তারপর চলত খেলা ওদের, এক শিশু ও এক বৃদ্ধের।

গৌতমের উপরে আকর্ষণ জাগবার অন্য একটা কারণও ডাঃ ঘোষালের ছিল। ছাত্রাবস্থায় ঘোষাল কলকাতায় তাঁর এক দূর-সম্পর্কীয় বোনের বাসায় বছর দেড়েক ছিলেন। সেই সময় সেই বোনের একটি ছয়-সাত বছরের ছেলে ঘোষালের অত্যন্ত নেওটা হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে যতক্ষণ ঘোষাল থাকতেন, সেই ভাগ্নে বীরু সবদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকত। ঘোষাল যেবার ফাইন্যাল এম. বি. পাস করেন, সেবারে অকস্মাৎ ডিপথিরিয়া হয়ে বীরু মারা যায়। এবং বীরু মারা গেলেও তার স্মৃতিটা ঘোষালের মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি। তার-পর দীর্ঘদিন ধরে সঙ্গীহীন একক জীবন। কাজের মধ্যে ডুবে থাকায় ঘোষাল বেশী লোকজন বা মানুষের ভিড় একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করতেন। এবং ক্রমে নিঃসঙ্গ একক জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে উঠে-ছিলেন। সেই কারণেই কতকটা বিপ্রদাস নার্সিংহোম নিজের হাতে গড়ে তুললেও সেখানে টিকতে পারেননি। ল্যাবরেটরীর মধ্যে পালিয়ে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। কিন্তু একদা অতীতে বীরুকে ভালবাসার মধ্যে দিয়ে যে স্নেহের একটা দিক মনের মধ্যে তাঁর জেগে উঠেছিল, বীরুর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেটা চাপা পড়লেও মন থেকে একেবারে নিঃশেষে মুছে যায়নি। অবচেতন মনের স্তরে বয়ে চলেছিল নিঃশব্দ ফল্গুধারার মতই সেই ভালবাসার ও স্নেহের স্রোতটা।

গৌতম এসে সেই ফল্গুতেই আলোড়ন জাগিয়েছিল।

বুঝতে পারেননি ঘোষাল যে কেন এই দীর্ঘদীনের নিঃসঙ্গ একক জীবনের রিক্ততায় তিনি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। বুঝতে পারেননি তিনি যে কেন মানব-জীবনের সব চাইতে বড় দিকটাকেই তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। বুঝতে পারেননি তিনি যে স্নেহ-ভালবাসা সম্পর্কহীন হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না সংসারে। বুঝতে পারেননি যে, মানুষ মাত্রকেই স্নেহ দিতে হয়, স্নেহ পেতে হয়; ভালবাসতে হয়, ভালবাসা পেতে হয়। আহার-নিদ্রার মতই ও দুটোও মানুষের জৈবিক প্রয়োজন। স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু—এদের ভিতর দিয়েই আছে মানব-জীবনের সেই পরম স্বাদ। কিন্তু ডাঃ ঘোষালের জীবনে ঐ তিনটির কোনটিই ছিল না। আর তারই অভাবে ক্রমে ক্রমে জীবন তাঁর হয়ে উঠেছিল রুক্ষ, কর্কশ, নিরাসক্ত।

গৌতম আনল ডাঃ ঘোষালের জীবনে সেই পরম স্বাদ আবার নতুন করে এবং যে বস্তুর স্বাদ থেকে এই দীর্ঘকাল তিনি বঞ্চিত ছিলেন, এতকাল পরে সেই বস্তুর স্বাদ পেয়ে ঘোষাল যেন হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

কালক্রমে তাঁর রুটিনবাঁধা কাজেও ভুল হয়ে যেতে লাগল। থেকে থেকে অন্যমনা হয়ে যান। কার একটি লঘু পদধ্বনি শোনবার আশায় শ্রবণেন্দ্রিয় দুটি তাঁর থেকে থেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই একটা কাজে এমন ডুবে গেলেন ডাঃ ঘোষাল যে সারাটা রাত ল্যাবরেটরীতে কাটল তাঁর, একসময় সকাল হয়ে গেল, তাও টের পেলেন না। প্রভুকে কাজে ব্যস্ত দেখে ভৃত্য রাধু তাঁকে আর ডেকে বিরক্ত করতে সাহস পায়নি, রাত্রে ল্যাবরেটরীতেই একপাশে রাত্রের খাবার রেখে গিয়েছিল এবং সকালে চা নিয়ে এসে তখনও তাঁকে কর্মব্যস্ত দেখে চায়ের কাপটা ডিস দিয়ে টেবিলের উপর একপাশে ঢাকা দিয়ে রেখে বের হয়ে গিয়েছে একসময়, ডাকতে সাহস পায়নি।

এমন সময় গৌতম নিত্যকার মত বাগানে এসে ঘোষালকে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে সোজা চলে এসেছে একেবারে ল্যাবরেটরীতে।

এসে দেখে ডাঃ ঘোষাল টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন করছেন।

ডাকল, বন্ধু!

প্রথম ডাকে সাড়া পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয়বার গৌতম ডাকল, বন্ধু !

কে ? ফিরে তাকালেন ডাঃ ঘোষাল। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি তাঁর হাস্যোদীপ্ত হয়ে উঠলো, বন্ধু ! কি খবর ?

খেলতে যাবে না ? বলেই ডাঃ ঘোষালের হাতে টেস্টটিউবে সবুজ রঙের কি একটা সল্যুশন দেখে প্রশ্ন করে, কি করছো ? হাতে তোমার ওটা কি ?

এটা ' এটা হচ্ছে একটা সল্যুশন ! বেনিডিক্ট সল্যুশন !

কি হবে ওটা দিয়ে ?

এমন সময় হঠাৎ পশ্চাৎ দিক থেকে শর্বরীর গলা শোনা গেল, গৌতম !

শর্বরীও গতকাল প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত ল্যাবরেটরীতে ছিল এবং একটা অর্ধসমাপ্ত কাজ ফেলে যাওয়ার জন্য সকালের দিকেই সোজা ল্যাবরেটরীতে চলে এসেছিল। সেখানে এসে গৌতমকে দেখে সে চমকে ওঠে।

গৌতম ! আবার তুমি এখানে এসেছো ? তোমাকে না বারণ করে দিয়েছিলাম ?

আমি তো এসেছি আমার বন্ধুর কাছে।

বন্ধু !

হঠাৎ এমন সময় ডাঃ ঘোষাল রুক্ষকণ্ঠে বলে ওঠেন, ছেলেকে আগলে রাখতে পার না কেন ? ওকে এখন বকলে কি হবে ! যাও, নিয়ে যাও ওকে !

ডাঃ ঘোষাল তাঁর টেবিলের দিকে চলে গেলেন।

হতভম্ব গৌতম ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে ডাঃ ঘোষালের দিকে।

শর্বরী গৌতমের হাত ধরে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। সেই সময় তার পাশ দিয়ে ভৃত্য রাধু ল্যাবরেটরীতে গিয়ে ঢুকল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শর্বরীর কানে এলো ডাঃ ঘোষাল রাধুকে বকছেন, বেটা সাপের পাঁচ পা দেখছো না ! এক কাপ চা-ও দিতে পারোনি এতক্ষণ !

॥ ২ ॥

পরের দিন সকালে।

ডাঃ ঘোষাল বাগানের মধ্যে এদিক-ওদিক সতৃষ্ণ নয়নে তাকাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো বাগানের একেবারে দক্ষিণ কোণে যেখানে নতুন শেড-দেওয়া ছোট বসবার কাঠের বেঞ্চটা আছে, সেখানে গালে হাত দিয়ে নিঃশব্দে

বসে আছে গৌতম একাকী।

মৃদু একটা হাসির বঙ্কিম রেখা ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর জেগে উঠলো। টিপে টিপে সন্তর্পণে অনেকটা ঘুরে একেবারে গৌতমের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দু হাত দিয়ে গৌতমের চোখ দুটো চেপে ধরলেন।

কে! চমকে ওঠে গৌতম।

সাড়া দেন না ডাঃ ঘোষাল।

ছাড। ছাড় বলছি। গৌতম বলে।

না। ছাড়বো না।

গলা শুনেই গৌতম চিনতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে, তোমার সঙ্গে ত আমার আড়ি। যাও তুমি আমার কাছ থেকে। খেলবো না ত। আর কক্ষনো তোমার সঙ্গে খেলবো না।

চোখটা ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে পাশে বসলেন ডাঃ ঘোষাল।

গৌতম সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে বসল মুখটা ঘুরিয়ে।

আমার সঙ্গে আড়ি। কেন বন্ধু?

হাঁ, আড়িই ত। কেন তুমি আমাকে কাল বকলে!

বেশ। আড়ি যখন তখন আমিই একা একা মোটরে চেপে বেড়াতে যাই!

সত্যি। কোথায় বেড়াতে যাবে? সচকিত হয়ে ওঠে গৌতম সব অভিমান ভুলে।

ভেবেছিলাম মেরিন ড্রাইভে—মালবার হিলসে যাবো, তা আমার সঙ্গে যখন তোমার আড়িই—

দেখি তোমার কড়ে আঙুলটা! গম্ভীর হয়ে গৌতম বলে।

কড়ে আঙুল। কি হবে?

দেখি না। কই তোমার কড়ে আঙুলটা দেখি।

কৌতূহলে ডাঃ ঘোষাল সত্যি সত্যিই এবারে তাঁর ডান হাতের কড়ে আঙুলটা এগিয়ে ধরেন একটু ফাঁক করে। তাঁর সেই কড়ে আঙুলের সঙ্গে নিজের হাতের ছোট কড়ে আঙুলটা পেঁচিয়ে এবারে গৌতম বলে, হলো ত।

কি হলো?

কেন, ভাব! কি বোকা তুমি, কিছু জানো না! তোমার আর আমার কড়ে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে ভাব হয়ে গেল ত!

সত্যি?

হ্যাঁ। চল এখন কোথায় যাবে বলছিলে। মেরিন ড্রাইভ, মালাবার হিল্‌স।

চল।

গ্যারাজে একটা গাড়ি ছিল। কিন্তু সেটা ব্যবহৃত হতো ন-মাসে ছ-মাসে একবার, কারণ গাড়ির মালিক ডাঃ ঘোষাল কখনো একটা বেরই হতেন না। সেই কারণেই একজন ড্রাইভার রাখা হয়েছিল প্রত্যহ গাড়িটাকে কিছুক্ষণ চালিয়ে মেসিনটাকে চালু রাখবার জন্য। ড্রাইভার মণিভদ্র প্রত্যহ সকালে বা সন্ধ্যায় একবার গাড়িটা বের করে কিছুক্ষণ চালিয়ে এনে আবার মুছে ঝক্‌ঝকে করে গ্যারাজে তুলে রাখত।

সেদিন যখন সকালে গাড়ি নিয়ে বেরুতে যাবে মণিভদ্র, সামনে এসে দাঁড়ালেন ডাঃ ঘোষাল গৌতমকে সঙ্গে নিয়ে।

একটু বিস্মিত হয়েই মণিভদ্র মালিকের মুখের দিকে তাকাল।

গাড়িতে তেল আছে?

জি হুজুর।

ক গ্যালন?

এক গ্যালন হবে। একটু বেশীও হতে পারে।

মণিভদ্রকে গাড়ি থেকে নামতে বলে ডাঃ ঘোষাল ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলেন, পাশের সীটে বসালেন গৌতমকে।

দীর্ঘ ন-মাস বাদে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল ধরলেন ডাঃ ঘোষাল।

প্রায় ঘণ্টা-দুই ধরে বোম্বাই শহরের পথে পথে গাড়ি ছুটিয়ে অবশেষে একটা বড় খেলনার দোকানে গিয়ে একগাদা খেলনা কিনে ফিরে এলেন ডাঃ ঘোষাল নিজগৃহে।

বাড়ির দরজার কাছে নামাতে যাবেন, দূর থেকে দেখতে পেলেন শর্বরী আসছে তাঁরই বাড়ির দিকে। দেখেই চট করে দরজা খুলে গৌতমকে কোন কিছু না বলেই চোরের মত কোনমতে দরজাপথে অদৃশ্য হলেন। সে সময় তাঁর মুখের দিকে কারো দৃষ্টি পড়লে মনে হতো বুঝি তাঁকে ভূতে তাড়া করেছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে একেবারে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে নিজের শয়নঘরে গিয়ে খিল তুলে দিলেন ডাঃ ঘোষাল।

শর্বরী দূর থেকে ডাঃ ঘোষালকে গাড়ি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি তাঁর বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখেছিল। কিন্তু সে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি প্রথমটায়। শুধু তাই নয়, ঘৃণাক্ষরেও সে আন্দাজ করতে পারেনি যে গাড়ির মধ্যে গৌতম থাকতে পারে।

গাড়ির শব্দে ড্রাইভার মণিভদ্র ওদিকে ছুটে এসেছিল। কিন্তু গাড়ির কাছে

পৌঁছাবার আগেই সে দেখলো। গাড়ি থেকে নেমে দ্রুতপদে চলে গেলেন বাড়ির মধ্যে তার মনিব। গৌতমও একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল! মণিভদ্র গাড়ির সামনে এসে দেখে গৌতম গাড়ি থেকে নামবার চেষ্টা করছে। আর গাড়ির পিছনের সীটে গোটাতিনেক বড় বড় কাগজে মোটা প্যাকেট। এদিকে গাড়ির কাছাকাছি আসতেই শর্বরী গৌতমকে গাড়ির মধ্যে দেখে কৌতূহলে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল।

গৌতম!

মা-মণি।

এ কি, গাড়ির মধ্যে তুমি উঠেছো কেন?

আমি উঠবো কেন! আমাকে ত বন্ধুই নিয়ে গিয়েছিল!

বন্ধু! বন্ধু কে?

কেন? তুমি জান না বুঝি, দৈত্যের সঙ্গে ত আমার আজকাল ভাব হয়ে গিয়েছে। সে ত আমার বন্ধু!

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা শর্বরীর কাছে জলের মতই পরিষ্কার হয়ে যায়। ইতিপূর্বে দু-একদিন ঐ বন্ধুর কথা গৌতম তাকে বলেছে বটে, কিন্তু শর্বরী ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু আজ দৈত্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে শুনে বুঝতে তার আর কিছু বাকী থাকে না। ডাঃ ঘোষালই তাহলে তার বন্ধু!···একটু যে সে আশ্চর্য না হয় তাও নয়। বলে, নেমে এসো গাড়ি থেকে।

মণিভদ্র গাড়ির দরজাটা খুলে দিতে গৌতম নেমে এলো।

যাও, বাড়িতে যাও!

আমার খেলনাগুলো!

তোমার খেলনা?

হ্যাঁ, আমার খেলনাগুলো,—বলে মণিভদ্রর দিকে তাকায় গৌতম, দাও। আমার খেলনাগুলো নামিয়ে দাও।

খেলনা? শর্বরী শুধায় আবার।

হ্যাঁ, ঐ ত গাড়ির মধ্যে আমার খেলনাগুলো আছে।

মণিভদ্র খেলনার প্যাকেটগুলো নামিয়ে আনে।

ঐ সময় শর্বরী যদি একবারও উপরের দিকে তাকাত ত দেখতে পেত, দোতলার শয়নঘরের জানলার কবাট দুটো ঈষৎ ফাঁক করে ডাঃ ঘোষাল জুলজুল করে ওদের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

গৌতমকে গৃহে পাঠিয়ে দিয়ে শর্বরী ডাঃ ঘোষালের বাড়িতে প্রবেশ করল। মণিভদ্র খেলনার প্যাকেটগুলো সঙ্গে নিয়ে গেল গৌতমকে পৌঁছে দিতে।

ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করে শর্বরী কিন্তু কোথাও ডাঃ ঘোষালকে দেখতে পেল না। সে তার নিজের জায়গায় গিয়ে কাজ শুরু করল। কিন্তু কাজের মধ্যেও তার মনের মধ্যে গৌতম ও ডাঃ ঘোষালের ব্যাপারটাই আনাগোনা করতে থাকে। ঘণ্টা দুই প্রায় শর্বরী ল্যাবরেটরীতে কাজ করল, কিন্তু ডাঃ ঘোষালের সঙ্গে তার দেখা হলো না। ঐ দু ঘণ্টার মধ্যে ডাঃ ঘোষাল ল্যাবরেটরীতে এলেন না মোটে।

এগারটার সময় নার্সিংহোমে একটা অপারেশন আছে, শর্বরী ল্যাবরেটরী থেকে বের হয়ে নার্সিংহোমের দিকে চলল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার মুখে ডাঃ ঘোষালের শয়নঘরের বন্ধ দরজাটার সামনে একবার দাঁড়াল, কি যেন ভাবল তারপর আবার নিচে নেমে গেল।

ও. টি-র সামনেই প্যাসেজে আনন্দর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শর্বরীর।

মাস ছয়েক সে এখানে চাকরি নিয়ে এসেছে, আলাপ হবার পর থেকে আনন্দকে তার খুব ভাল লেগেছে। সরল কাজ-পাগল আর ভারি আমুদে। তবে ইদানীং কিছুদিন থেকেই শর্বরী লক্ষ্য করছে, আনন্দের মধ্যে যেন কেমন একটা পরিবর্তন! কেমন যেন একটা অহেতুক শঙ্কিত জড়তা! দ্বিধাগ্রস্ত ভীরু সতর্কতা!

পেসেণ্ট্ রেডি আনন্দ? শর্বরী প্রশ্ন করে।

কেসটা খুব জটিল নয়, ইরোশন সার্ভিক্স্—তার ট্রিট্‌মেণ্ট-এর সঙ্গে হবে স্টেরিলিজেশন।

রোগিণীর বয়স চল্লিশও উত্তীর্ণ হয়নি এখনো, এর মধ্যেই দশটি সন্তানের জননী হয়েছেন। প্রথমটায় স্টেরিলিজেশন করতে রোগিণী বা তাঁর স্বামী কেউই রাজী হয়নি, পরে শর্বরী অনেক করে বোঝানোয় রাজী হয়েছে।

অপারেশনের পরে শর্বরী ও আনন্দ দুজনে পাশের ঘরে এসে বসেছে। সিস্টার দুজনকে রেফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জল ও লিমন স্কোয়াশ মিশিয়ে গ্লাসে করে দিয়ে গিয়েছে।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে শর্বরী মৃদুকণ্ঠে ডাকল, আনন্দ!

আনন্দ মুখ তুলে তাকায়।

কি হয়েছে বল ত তোমার, আনন্দ!

আমার! কেন, কিছু ত হয়নি!

উহুঁ! নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ! কী হয়েছে আনন্দ?

কি আবার হবে! কিছুই হয়নি।

ঠিক ত!...

আনন্দ এবারে মাথা নিচু করে। কোন জবাব আর দেয় না।

কিন্তু শর্বরীর যে বুঝতে ভুল হয়নি সেটা সে দিনতিনেক বাদেই টের পেল সেরাত্রে নার্সিংহোম থেকে ফিরে এসে শয়নঘরে প্রবেশ করতেই।

তার টেবিলের উপরে একটা চিঠি।

ডাকে যে আসেনি চিঠিটা, খামটা হাতে নিতেই শর্বরী বুঝতে পারে। কে আবার তাকে চিঠি লিখলো? একটু আশ্চর্য হয়েই খামটা ছিঁড়ে একটা ব্লু রংয়ের লেটার পেপার টেনে বের করল শর্বরী।

ইংরেজীতে লেখা চিঠি। সম্বোধন করছে লেখক 'প্রিয় শর্বরী' বলে। কৌতূহলে চিঠিটা উল্টে নামটা পড়তেই শর্বরীর আরো বিস্ময় বাড়ে।

চিঠিটা লিখেছে তাকে আনন্দ।

প্রিয় শর্বরী,

প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি চিঠিটা তোমাকে লিখবার জন্য। ভাবছো নিশ্চয়ই চিঠিটা পেয়ে যা আমার বলবার ছিল তা সামনাসামনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে না বলে এভাবে কাগজ-কলমের আশ্রয় নিচ্ছি কেন! তার জবাবে বলবো, সাহস হলো না কথাটা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে। আর, গুছিয়ে হয়ত যা আমার বলবার বলতে পারবো না, তাই শেষ পর্যন্ত কাগজ-কলমের আশ্রয় নিলাম।

কোনরকম গোপনতার আশ্রয় নেবো না। শর্বরী, তোমাকে আমি ভালবেসেছি। কিন্তু কথাটা যেদিন সর্বপ্রথম আমি জানতে পারলাম, সেদিন চমকে উঠলেও এবং পরে নিজেকে নিবৃত্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন কৃতকার্য হতে পারলাম না, সেদিন থেকেই ভয়ে ভয়ে দিন আমার কাটছে। পাছে তুমি জেনে ফেল সে কথা। কিন্তু দেখলাম চেষ্টা করেও তোমার দুটি চোখকে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। সেও এক কথা। আর দ্বিতীয় হলো জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার যাকে নিয়ে ঘটে গেল, অন্ততঃ তার কাছে সেটা গোপন করে রাখার মধ্যে যেন আমার মনে হচ্ছে একটা নীচতা আছে; তাই সব কথা তোমাকে লিখলাম। এখন তোমার হাতেই সব তুলে দিলাম।

আনন্দ দাও নেবো ; দুঃখ যদি দাও, তাও নেবো।

তোমার স্নেহধন্য—আনন্দ।

একবার দুবার তিনবার চিঠিটা আগাগোড়া পড়ল শর্বরী। আনন্দের চোখে-মুখে ঠিক এই কথাটাই ইদানীং স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলেই সন্দেহ হয়েছিল শর্বরীর মনে।

চিঠিটা অতঃপর দিয়াশলাই জেলে পুড়িয়ে ফেলবার জন্য কাঠির আগুনের মধ্যে ধরল। চিঠিটা পুড়তে লাগল।

॥ ৩ ॥

আর আশ্চর্য!

ঠিক ঐ সময় শত শত মাইল দূরে লেক টেরেসের নিজের বাড়ির নিজ শয়নকক্ষে নিভৃতে শৈবালও দিয়াশলাইয়ের একটা প্রজ্বলিত কাঠির সামনে একখানা ডিপ্-ব্লু লেটার পেপারে লেখা চিঠি পোড়াচ্ছিল।

চিঠিটা সে ঐদিনই পেয়েছে।

এবং চিঠিটা লিখছে তাকে রীটা। এবং সে চিঠিটাও লিখেছে ইংরেজীতেই।

রীটা লিখেছিল :

শৈবাল,

বিশ্বাস করবে কিনা কথাটা আমার জানি না! সত্যিই তোমাকে আমি ভালবেসেছি। এবং ভালবেসে যে এত আনন্দ তা এই প্রথম টের পাচ্ছি। বিরক্ত হচ্ছো চিঠিটা আমার পড়তে খুব, না! যাকে ভালবাসি না সে যদি এমন করে উপযাচিকার মত সামনে এসে জানায় সেই ভালবাসারই কথা, তার চাইতে বিড়ম্বনা যে আর নেই তাও বুঝি! কিন্তু লজ্জা তোমাদের মতে, যাদের অঙ্গের ভূষণ, সেই নারীকেই যখন নির্লজ্জের মত সামনে এসে তার ভালবাসার কথা জানাতে হয় নিজে থেকে, তার চাইতে পরাজয়ও বুঝি আর তার নেই! তুমি হয়ত প্রথমেই বলবে, তোমার ব্যবহারেই ত আমার বোঝা উচিত ছিল, তবে আবার এর কি প্রয়োজন ছিল! তার উত্তরে বলবো, প্রয়োজনটা যে একান্ত আমারই, তাই তোমার মনের কথা জেনেও তোমাকে আমার কথাটা না জানিয়ে পারলাম না। একে ত ভালবাসার মত বেদনা নেই, তার উপরে যদি সেই ভালবাসাকে রিক্ত হাতে ফিরে আসতে হয়, তার চাইতে বড় মর্মান্তিক

বোধ হয় ইহজগতে আর কিছু নেই। এবং আশ্চর্য এই যে, রিক্ত হাতে আমাকে ফিরতে হবে জেনেও জানাতে বসেছি তোমাকে আমার কথা। চিরদিনই বিলাস প্রাচুর্য ও এলোমেলোভাবেই জীবন আমার কেটেছে। জীবনে আমার তোমার আগে অনেক পুরুষই এসেছে এবং চলেও গিয়েছে। এবং সর্বক্ষেত্রেই তারা আমাকে জয় করতেও চেয়েছে বলেই শুরু থেকে কেউই বোধ হয় মনে আমার রেখাপাত করতে পারেনি। পুরুষ জাতটা সম্পর্কে তাই আমার একটা বিচিত্র ধারণা হয়ে গিয়েছিল,—ওরা ত আমাদের কাছে ঘুর-ঘুর করে আসবেই, ওটাই ওদের ধর্ম। জয় করতে হয় না ওদের, আপনা থেকেই ওরা ধরা দেয় নারীর কাছে। এবং সত্যি কথা বলতে কি তোমার সম্পর্কেও সেই ধারণাই আমার ছিল। কিন্তু ধারণা আমার ভেঙে যেতে দেরি হলো না তোমার সংস্পর্শে আসবার পর। তুমিই প্রথমে আমাকে জানিয়ে দিলে, আমার এতদিনকার ধারণাটা কত বড মিথ্যে। আর সেই আঘাতেই পাষাণী অহল্যার ঘুম ভাঙল। চমকে উঠলাম প্রথমে, তারপর জিদ চাপলো মনে, কিন্তু যখন বুঝলাম আমার ক্ষমতা নেই তোমাকে জয় করবার, তখনই শুরু হলো আমার কান্না। শেষটায় কাঁদতে কাঁদতে মনে হলো, জানাই না কেন তোমাকে সব কথা! সকল কিছুর মীমাংসার ভার তোমারই হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই না কেন। তখনই পেলাম যেন কিছু সান্ত্বনা। যাক—আমার যা করবার ছিল, বলবার ছিল—করলাম বললাম, এবার তোমার যেমন অভিরুচি করো। ভালবাসা জানাই। ইতি: রীটা

সেই চিঠিটাই দিয়াশলাই জেলে পোড়াচ্ছিল শৈবাল সেরাত্রে ঐ সময়।

একটু একটু করে পুড়তে লাগল চিঠিটা। ধীরে ধীরে ছাই হয়ে গেল।

চকচকে মোজেইক-করা মেঝেতে সেই পোড়া চিঠির টুকরোগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

॥ ৪ ॥

সারাটা রাত্রি ভেবে শর্বরী ঠিক করল—চিঠিতে নয় মুখোমুখিই সব কথা স্পষ্ট করে বলবে আনন্দকে। এবং পরের দিন তাই নার্সিংহোম থেকে দ্বিপ্রহরে বাড়িতে ফেরবার পথে আনন্দকে ডেকে পাঠাল শর্বরী।

সকাল থেকেই আনন্দ যেন অন্যদিনের চাইতে একটু বেশী সংকুচিত হয়েই কতকটা শর্বরীকে এড়িয়ে এড়িয়েই যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু যেন কিছুই হয়নি এমনি একটা ভাব নিয়ে শর্বরী আনন্দর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল।

তাই ঘরে ফিরবার আগে যখন দাইকে দিয়ে শর্বরী আনন্দকে তার ঘরে ডেকে পাঠাল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আনন্দ এসে দাঁড়াল, আমাকে ডেকেছো শর্বরী!

হ্যাঁ, চলো আমার বাসায়। আজ আমার ওখানেই তুমি লাঞ্চ খাবে।

কিন্তু—

আবার কিন্তু! চলো এসো।

শর্বরীর বাসায় এসে আহারাদির পর দুজনে এসে বসবার ঘরে বসল দুটো সোফায় মুখোমুখি। আনন্দের বুকের ভিতরটা তখন কি যেন এক উত্তেজনায়, কি এক অজানা ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছে।

আনন্দ!

শর্বরীর ডাকে আনন্দ মুখ তুলে তাকাল।

তোমার চিঠি আমি পেয়েছি। কিন্তু গোড়াতেই ভাই তুমি একটু ভুল করেছ। তাই বলছি তোমাকে, হঠাৎ নয় আনন্দ, প্রথম থেকেই তোমাকে আমি আমার ভাই বলে মনে করেছি। দোষ অবিশ্যি আমারও আছে কিছুটা, কারণ প্রথমেই স্পষ্টাস্পষ্টি কথাটা তোমাকে জানিয়ে দিলে আজকের এই ভুল হতো না। তুমি আমার সব কথা জান না—

আমাকে তুমি ক্ষমা কর শর্বরী! বাধা দিয়ে আনন্দ বলে ওঠে।

না, না—শোন, আমার সব কথা তোমাকে আজ বলবো বলেই এখানে এ সময় তোমাকে ডেকে এনেছি। তারপর একটু থেমে যেন একটা টানা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে শর্বরী আবার বলে, একমাত্র ডাঃ সাহাকেই একবার ইতিপূর্বে সব কথা আমি বলেছিলাম তাঁর কাছে পিতারও অধিক স্নেহ পেয়ে, এবং ভেবেছিলাম এ কথা আর কেউই জানবে না—। কিন্তু শর্বরী আবার চুপ করলো।

আনন্দ চেয়ে থাকে নিঃশব্দে শর্বরীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। পরে তোমার চিঠি পাবার পর ভেবে দেখলাম সব কথা তোমাকে জানানো আমার দরকার, কারণ সত্যিই তোমাকে আমি ভালবাসি আনন্দ! তুমি জানো না, তোমাদের তথাকথিত পরিচিত সমাজের আমি কেউই নই। জীবনটা আমার সত্যি বিচিত্র। সর্বজনগ্রাহ্য তোমাদের লৌকিক প্রথায় বিবাহ কোনদিনই আমার হয়নি।

শর্বরী!

চমকে উঠলে তো আনন্দ! জানি চমকে উঠবে তোমরা। আমার বিবাহ হয়নি অথচ আমি মা হয়েছি, আমার ছেলে হয়েছে। তাই তো বলছিলাম তোমাদের পরিচিত সমাজের আমি কেউ নই! গৌতমের জন্ম-পরিচয়ের তোমাদের

তথাকথিত কোন সামাজিক স্বীকৃতিই নেই!

বিস্ময়ে যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে আনন্দ!

কি বলছে শর্বরী! অক্লেশে তিলমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ না করে এক নারী স্পষ্ট সতেজ কণ্ঠে জানাচ্ছে, তার গর্ভজাত সন্তানের কোন সামাজিক পিতৃপরিচয় নেই! সে ভুল শুনছে না তো!

ভাবছো নিশ্চয়ই এত বড় দুঃসাহসের কথাটা নারী হয়ে কেমন করে তোমার সামনে আমি উচ্চারণ করতে পারলাম, তাই না! কিন্তু সত্যিই জেনো, যা বলছি তার একটি বর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয়। সত্যিই তোমাদের সামাজিক বিচারে একমাত্র আমার পরিচয় ছাড়া আমার সন্তান গৌতমের অন্য কোন পরিচয়ই নেই। এর চাইতে স্পষ্ট করে আর কোন কথা তোমাকে বলতে পারবো না আনন্দ, কেবল এইটুকু জেনো, গৌতমের জন্ম-সম্ভাবনাকে তার জন্মদাতা বিনষ্ট করতে চেয়েছিল বলেই—

শর্বরী—

হ্যাঁ, মন্ত্র ও লৌকিকতাটাই যদি নর-নারীর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের একমাত্র পরিচয় বা স্বীকৃতি না হয় সমাজে তাহলে বিবাহ আমাদের হয়েছিল। কারণ আমাদের পরস্পরের আত্মদানের মধ্যে সেদিন যে মন্ত্র ছিল সে হচ্ছে প্রেমের মন্ত্র, নর-নারীর মিলনের দেবতার শ্রেষ্ঠ সত্য ও আশীর্বাদ। যাক সে কথা, যা বলছিলাম। লৌকিক মতে বিবাহের পূর্বেই গৌতম আমার গর্ভে এসেছিল এবং গৌতমের জন্মদাতা সেদিন কলঙ্কের ভয়ে অবাঞ্ছিত ভেবে তাকে বিনষ্ট করতে চেয়েছিল বলেই তাকে অস্বীকার করে সেই যে আমি চলে এসেছি আর কোন দিনই ফিরে যাইনি। তাকেও ফিরে আসবার জন্য ডাকিনি। এমন কি সে আজ জানেও না যে আমি কোথায়। কিন্তু সেটা গৌণ, তোমাকে যে জন্য আজ এখানে ডেকে এনেছি তার মুখ্য কারণটা হচ্ছে, তোমাকে কি জীবনে আমার ভাই বলে পেতে পারি না!

আনন্দ ধীরে ধীরে এবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি যাই—

কিন্তু আমার কথার তো জবাব দিলে না আনন্দ?

আনন্দ কোন কথা না বলে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

শর্বরী আবার ডাকে, আনন্দ!

আমাকে ক্ষমা করো, শর্বরী!

শুধুই ক্ষমা?

হ্যাঁ। কারণ—

বল আনন্দ !

তুমি যা বলেছো, আমার পক্ষে সেটা স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয় শর্বরী।

সম্ভব নয় !

না।

আনন্দ !

প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সবই ত সম্ভব নয় শর্বরী ! এর চেয়ে বেশী কিছু জানতে চেয়ো না শর্বরী। আমি—আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

আনন্দ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত বসে রইলো শর্বরী সোফাটার উপরে।

শৈবালকে চিঠিটা লিখবার দিন সাতেক পরে, সেদিন রবিবার, চেম্বার বন্ধ —শৈবাল তার বাড়ি থেকে বের হয়নি। নিজের শয়নঘরে একটা সোফার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে ছুটিটা উপভোগ করছিল।

ঘরের আলো না জ্বলায় ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার থমথমে হয়ে এসেছে। বাইরের দরজায় ওদিকে যেন কার লঘু পদধ্বনি শোনা গেল।

তার পরই আব্ছা ছায়ামূর্তির মত কে যেন নিঃশব্দে এসে ঘরে প্রবেশ করল।

কে !

আমি রীটা। বলতে বলতে রীটা এগিয়ে এসে সামনের সোফাটার উপরে নিঃশব্দে বসল।

শৈবাল রীটার উপস্থিতিতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করে। ভেবেছিল, চিঠির জবাব যখন সে দেয়নি, তখন হয়ত রীটা তার জবাবটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ রীটার আগমনে যে-ব্যাপারটা ভেবেছিল বুঝি চুকেবুকেই গিয়েছে, সেটারই পীড়াদায়ক পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনায় কেমন যেন নিজেকে বিব্রত বোধ করে। কিন্তু নিস্তব্ধতার মধ্যে দীর্ঘ মুহূর্তগুলি কেটে যেতে লাগল, রীটার দিক থেকে কোন সাড়াশব্দই পাওয়া যায় না। সামনের অস্পষ্ট অন্ধকারে যেন একটা অস্পষ্টতার প্রতীক হয়ে সে বসেই থাকে।

হঠাৎ তারপর রীটার মৃদু কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো শৈবাল।

শৈবাল !

শৈবাল শুধু মুখ তুলে তাকায়, কোন সাড়াই দেয় না।

ভয় নেই তোমার। তোমাকে বিরক্ত করতে আসিনি আমি। আর কেন

যে তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে, তার কৈফিয়ৎ আদায় করতেও আসিনি।

না না, রীটা, তোমাকেও আমার একটা কথা জানানো আবশ্যক—

বাধা দিল রীটা। বললে, কোন কথারই আবশ্যক নেই!

আছে, শোন! আমি—মানে তুমি জান না, আর শুধু তুমি কেন, কেউই জানে না যে কোন মেয়েরই ও প্রস্তাবে সাড়া দেবার আজ আর আমার কোন অধিকারই নেই।

অধিকার নেই! কেন?

কারণ আমি বিবাহিত।

চমকে ওঠে কথাটা শুনে রীটা! আর্ত অস্ফুট কণ্ঠে কেবল একটি মাত্র শব্দই উচ্চারিত হয়, বিবাহিত!

হ্যাঁ, বিবাহিত!

শৈবাল তুমি কি তাহলে বিলাতে ছিলে যখন কোন বিদেশিনীকে—

না।

তবে?

বিলাত যাবার অনেক আগেই আমার বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

তাহলে তোমার স্ত্রী কোথায়?

জানি না। কোথায় যে সে তা আমি জানি না।

জান না, তার মানে?

রাগ করে আমাকে কোন কিছু না জানিয়েই সে যেন কোথায় চলে গেছে।

রাগ করে সে চলে গেল!

হ্যাঁ। শুধু রাগ নয়, সেই সঙ্গে হয়ত অভিমানও ছিল কিছুটা।

আশ্চর্য! তা তুমি তার খোঁজ করলে না কেন?

করেছি। আজও করছি। কিন্তু যে নিজে থেকে ধরা দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে আছে, তাকে ধরবো কেমন করে বলো!

আমি—আমি অত্যন্ত দুঃখিত শৈবাল! ব্যাপারটা কিছুই আমি জানতাম না—

না, না—তোমার দোষ তো কিছুই নেই! বুঝতে আমি পারিনি, নইলে আমিই তোমাকে জানাতাম। বরং তুমিই আমাকে ক্ষমা করো রীটা!

না, শৈবাল! বরং আমিই তোমার কাছে শিখলাম অনেক!

বাইরে ভৃত্যের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দাদাবাবু, আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে।

বোস তুমি রীটা। আমি আসছি এখনি।

শৈবাল উঠে বারান্দায় শেষ প্রান্তে যেখানে স্ট্যাণ্ডে টেলিফোন ছিল সেখানে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল কানের কাছে,—হ্যালো!

ডাঃ ঘোষ আছেন?

ডাঃ ঘোষ স্পিকিং, বলুন!

হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করছে ডাঃ অধিকারীর হাউস ফিজিসিয়ান ডাঃ মল্লিক।

আপনার সেই পেসেণ্ট মীনাক্ষী দেবীর অবস্থা খুবই খারাপ।

কি ব্যাপার বল ত?

একঘণ্টার মধ্যে দুবার হিমপটিসিস্ হয়েছে।

এর আগে ত কখনও হিমপটিসিস্ হয়নি!

না। এই প্রথম।

আচ্ছা। আমি যাচ্ছি—শৈবাল ফোনটা নামিয়ে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো বন্ধু বিকাশের কথা। সে রাত্রের পর আজ প্রায় দশ দিন হয়ে গিয়েছে বিকাশের কোন খোঁজই আর সে নিতে পারেনি। আজ একবার হাসপাতাল থেকে ফিরবার পথে বিকাশদের ওখান থেকে ঘুরে আসতে হবে।

ভৃত্যকে ডেকে ড্রাইভারকে গাড়ি বের করবার কথা বলে শৈবাল তার শয়নকক্ষে ফিরে এসে আলো জ্বালাতেই দেখল, ঘর শূন্য। রীটা ঘরে নেই।

আশ্চর্য হলো শৈবাল, রীটা ইতিমধ্যে কখন চলে গেছে!

ভৃত্য চায়ের ট্রে হাতে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

হ্যাঁরে, এ ঘরে যে-দিদিমণি বসেছিল সে কখন চলে গেল?

তা ত জানি না দাদাবাবু!

হাসপাতালে পৌঁছে টি. বি. ওয়ার্ডে মীনাক্ষীর বেডের সামনে যখন এসে দাঁড়াল শৈবাল, মীনাক্ষীর দুটি চক্ষু তখন বোজা।

পাশেই নার্স দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে, বোধ হয় ঘুমোচ্ছেন।

কিন্তু ঘুমায়নি মীনাক্ষী, সেই মুহূর্তেই সে চোখ মেলে তাকাতেই সামনে শৈবালকে দেখতে পেল দাঁড়িয়ে আছে।

কখন এলে শৈবাল?

এই আসছি। দেখি তোমার হাতটা মীনুদি?

হাতটা শৈবালের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে মীনাক্ষী বললে, শুনেছো বোধ হয় শৈবাল, শেষ পরোয়ানা জারি হয়ে গিয়েছে।

কি যা-তা সব বলছো মীনুদি!

যা-তা বলছি!

তা নয়ত কি? রক্ত পড়লেই টি. বি. রোগী মরে না।

প্রত্যুত্তরে মীনাক্ষীর ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা কেবল জেগে ওঠে।

॥ ৫ ॥

আনন্দ হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে একটা চিঠিতে ডাঃ ঘোষালের কাছে চাকরিতে রেজিগনেশন দিয়ে বোম্বাই ছেড়ে চলে গেল।

বিপ্রদাস নার্সিংহোমের অন্য কেউ ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও শর্বরীর বুঝতে কষ্ট হলো না, কেন হঠাৎ আনন্দ চাকরিতে রেজিগনেশন দিয়ে চলে গেল। কিন্তু মুশকিলে পড়ল শর্বরী একা-একা। সে আসবার পর থেকে নার্সিং-হোমের কাজ এত বেশী বেড়ে গিয়েছে যে, সে আর আনন্দ দুজনে মিলেই অতি কষ্টে চারিদিক কোনমতে সামলাচ্ছিল। এখন আনন্দ চলে যাওয়ায় একা শর্বরী যেন নিঃশ্বাস নেবার সময় পায় না।

ডাঃ ঘোষালকে বলে অন্য একজন ডাক্তারের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে। ওদিকে নির্মলও দেশে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আরো দু-মাসের ছুটি নিয়েছে। একা শর্বরীকে দুদিক সামলাতে হচ্ছিল।

নার্সিংহোম, তারপর ডাঃ ঘোষালের নিজস্ব ল্যাবরেটরী! নার্সিংহোমের কাজে আটকে পড়ায় শর্বরীর যদি ল্যাবরেটরীতে যেতে দেরি হয় ত ডাঃ ঘোষাল অসন্তুষ্ট হন। বলেন, আমার কাজগুলোকে তুমি কাজ বলেই মনে করছো না শর্বরী।

দিবারাত্র প্রায় বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠার-উনিশ ঘণ্টাই কখনো নার্সিংহোমে কখনো ল্যাবরেটরীতে কেটে যায় শর্বরীর।

এমনি করে আরো দুটো মাস কেটে গেল।

অতিরিক্ত খাটুনিতে শর্বরী ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। তবু সে একবারও মুখ ফুটে সে-কথা বলে না।

সেদিন রাত্রে পাশাপাশি দুজনে কাজ করছে ল্যাবরেটরীতে।

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়। কিন্তু কারোই যেন খেয়াল নেই।

হঠাৎ ডাঃ ঘোষালের চাপা উল্লসিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ফিরে তাকায় শর্বরী।

পেয়েছি! পেয়েছি! শর্বরী, পেয়েছি!…ইউরেকা! ইউরেকা! শিশুর মতই যেন আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠেন ডাঃ ঘোষাল।

ছুটে আসে শর্বরী ডাক্তারের পাশে, ডাঃ ঘোষাল ?

হয়েছে। এতদিনে পেয়েছি শর্বরী! ফরমুলা আমি পেয়েছি—কিন্তু বক্তব্য ডাঃ ঘোষালের শেষ হলো না! তিনি টলে পড়ে গেলেন টেবিলের উপরে অকস্মাৎ!

ছুটে গিয়ে ধরল শর্বরী ডাঃ ঘোষালকে, ডাঃ ঘোষাল! ডাঃ ঘোষাল!

ডাঃ ঘোষাল তখন সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন, স্থির নিস্পন্দ।

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটার শর্বরী কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। তার পরই ধীরে ধীরে দু হাতে ধরে শুইয়ে দিল ডাঃ ঘোষালকে শর্বরী। এবং তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েই পাল্স্ দেখতে গিয়ে দেখলো পাল্স্ অত্যন্ত র‍্যাপিড ও ফিবল্।

ডাকাডাকি করে তখুনি ভৃত্য রাধুকে তুলল। এবং রাধুকে সংজ্ঞাহীন ডাক্তারের পাশে রেখে ছুটে গেল নার্সিংহোমে।

মাত্র দিন দুই হলো নতুন ডাক্তার মোবারক আলী এসেছেন। তাঁকে সঙ্গে করে স্টেথো, ব্লাড্‌প্রেসার দেখবার যন্ত্র ও ইনজেকশন ইত্যাদি নিয়ে তখুনি আবার ল্যাবরেটরীতে ফিরে এলো। প্রথমে ধরাধরি করে সংজ্ঞাহীন ডাক্তার ঘোষালকে তিনজনে তাঁর শয়নঘরে শয্যার উপরে এনে শোয়াল; এবং ব্লাড্-প্রেসার দেখতে গিয়ে চমকে উঠলো শর্বরী—২০০র উপরে সিস্টোলিক ও ডায়োস্টলিকও ১৫০-এর উপরে।

এ কেস অফ হাইপার-টেনশন!

ঐ ভয় করেছিল শর্বরী।

ডাক্তার ঘোষালের হাইপার-টেনশন ছিল, অতিরিক্ত পরিশ্রমে হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে।

লুপ্ত জ্ঞান আর ফিরে এলো না ডাঃ ঘোষালের।

তিন দিন অচৈতন্য থেকে চার দিনের দিন ধীরে ধীরে ডাঃ ঘোষাল যখন শেষ নিঃশ্বাস নিলেন তখন রাত দুটো।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো শর্বরী মৃতের পাশে।

মনে হলো শর্বরীর আবার যেন নতুন করে তার প্রিয়জনকে সে হারাল।

পরের দিন সৎকার করে শর্বরী যখন শ্মশান থেকে ফিরে এলো, তার আর

দাঁড়াবার শক্তি নেই। এসেই সে শয্যা নিল।

চার দিন চার রাত্রি ধরে একটানা ঘুমাল শর্বরী।

তারও দিন দুই পরে ডাঃ ঘোষালের এটর্নী মিঃ মেটা এলেন।

এবং তিনি যে সংবাদ দিলেন তা শুনে শর্বরীর যেন বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। মৃত্যুর মাত্র মাসখানেক আগে ডাঃ ঘোষাল নাকি তাঁর উইল করে গিয়েছেন।

প্রায় দুই লক্ষ টাকার তাঁর সম্পত্তি, সমস্ত তিনি দিয়ে গিয়েছেন শর্বরীর ছেলে গৌতম রায়কে উইল করে। শর্বরীর দু চোখের কোল বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে অশ্রু নেমে এলো।

বার বার করে কেবলই মনে পড়তে লাগল ডাঃ ঘোষালের মুখখানি।

বিপ্রদাস নার্সিংহোম, ডাঃ ঘোষালের নিজস্ব ল্যাবরেটরী ছাড়াও ব্যাঙ্কে মজুত টাকা হাজার পঞ্চাশের উপরে ছিল।

মিঃ মেটা বললেন, আপনার ছেলে গৌতম যতদিন না সাবালক হয় ততদিন তার গার্জেন হিসাবে আপনি যেমন ব্যবস্থা করবেন, সেইভাবেই নার্সিংহোম ও ল্যাবরেটরী চলবে ডাঃ রায়। ডাঃ ঘোষালের উইলে সেই রকম নির্দেশ আছে। আপনাকে একটা এফিডেবিট্ করতে হবে ও একটা সাকসেসন্ সার্টিফিকেট কোর্ট থেকে নিতে হবে। বলেন ত আমিই এখানে এসে কাগজপত্রে আপনার সব সই করিয়ে নিয়ে যেতে পারি। নচেৎ আমার অফিসে একদিন আসুন আপনি।

আমাকে কটা দিন একটু ভাবতে দিন মিঃ মেটা। এই মুহূর্তেই আপনাকে আমি কিছু বলতে পারছি না। বিহ্বল শর্বরী কোনমতে বলে।

বেশ ত। আজ আমি যাচ্ছি, সময়মত আপনি একদিন আমাকে টেলিফোন করবেন।

তাই হবে।

সেদিনকার মত এটর্নী মিঃ মেটা বিদায় নিলেন।

শর্বরী ডাঃ ঘোষালের কথা যতই ভাবে, ততই যেন সেই বিগত মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে যায়।

গৌতমকে ডাঃ ঘোষাল ভালবেসেছিলেন, এ তত্ত্বটি শর্বরীর কাছে অবিদিত ছিল না; কিন্তু সে ভালবাসা ও স্নেহ যে এতখানি, সেটাই বুঝতে পারেনি শর্বরী।

ডাঃ ঘোষালের আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যেন শর্বরী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ডাঃ ঘোষালের আত্মীয়রা কেমন লোক, কে আসবে —এই ভেবেই শর্বরীর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। কিন্তু উইলের কথা জানতে পেরে সে দুশ্চিন্তাটা যেন মিলিয়ে গেল।

শর্বরী আবার একটু একটু করে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। ডাঃ ঘোষালের মৃত্যুর পর থেকে আর সে ল্যাবরেটরীতে যায়নি। যদিও সে চিন্তা করছিল কেমন করে ডাঃ ঘোষালের আবিষ্কৃত ব্যাল্যান্সড্ বেবী ফুডটা বাজারে চালু করবে! এবং সেই সঙ্গে এও ভাবছিল ডাঃ ঘোষালের এত সাধের ল্যাবরেটরীটা সে একেবারে বন্ধ করে দেবে না। তার নিজের দ্বারা সম্ভব হবে না—বাইরে থেকে দু-একজন বিজ্ঞানীকে এনে ল্যাবরেটরীতে সে গবেষণার জন্য নিযুক্ত করবে।

একদিন সে টেলিফোনে মিঃ মেটার সঙ্গে ঐ সম্পর্কে কথাও বলল।

মিঃ মেটা জবাব দিলেন, যেমন আপনি বলবেন ডাঃ রায় সেই ভাবেই ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু শর্বরীর কল্পনা রূপ নিতে পারল না। ডাঃ ঘোষালের মৃত্যুর মাসখানেক বাদেই হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে ডাঃ ঘোষালের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিনয় ঘোষাল এসে হাজির হলেন তাঁর কাকার সমস্ত সম্পত্তির দাবী নিয়ে।

সুবিনয় ঘোষাল এটর্নী মিঃ মেটার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন; কিন্তু তিনি তাঁকে স্পষ্টই বললেন, ডাঃ ঘোষালের সম্পত্তির উপরে তাঁর কোন দাবী-দাওয়া নেই। কারণ তিনি উইল করে তাঁর সব কিছু ডাঃ শর্বরী রায়ের একমাত্র পুত্র, গৌতম রায়কেই দান করে গিয়েছেন।

সুবিনয় কলকাতা দেওয়ানী আদালতের ঝানু উকীল। সে বললে, উইল জাল, বিশ্বাস করে না সে। কোথাকার কে ঐ গৌতম, তাকে দিয়ে গিয়েছে তার কাকা তার সব সম্পত্তি! যত সব বাজে কথা!

মিঃ মেটা বললেন, বেশ ত, আপনি আদালতেই যান। আদালতই প্রমাণ করে দেবে কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে।

হ্যাঁ, তাই যাবো।

উকীল মানুষ সুবিনয় আটঘাট বেঁধেই কর্মক্ষেত্রে নামা স্থির করেছিল।

॥ ৬ ॥

বোম্বাইয়ে এসে যখন সুবিনয় শর্বরীর সঙ্গে দেখা করে, শর্বরী তাকে সানন্দেই আহ্বান জানিয়েছিল।

আপনি এসেছেন—ডাঃ ঘোষালের আপনার লোক, খুব ভালই হয়েছে। আপনিই সব ব্যবস্থা করুন। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল ঐ ল্যাবরেটরীটি। ওটাকে আরো বড ও ভাল করে গড়ে তুলুন।

এবং মিঃ মেটার সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ না করেই শর্বরী ডাঃ ঘোষালের বাড়িটা ছেড়ে দিল সুবিনয়কে থাকবার জন্য।

সুবিনয় গৃহপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই ডাঃ ঘোষালের যেখানে যেসব কাগজ বা চিঠিপত্র ছিল, হাতড়ে হাতড়ে দেখতে লাগল। এবং হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ একখানা চিঠি পেয়ে গেল ধানবাদের ডাক্তার সাহার লেখা তার বন্ধু কাকাকে। সেই চিঠির মধ্যেই পেল সে শর্বরীর সত্যিকারের পরিচয়। ডাঃ সাহা শর্বরীর কথাই সেই চিঠিতে বন্ধুকে লিখে ছিলেন। এবং সেই চিঠিখানা পেয়েই সুবিনয় যেন এতক্ষণে আশার আলো দেখতে পেল।

সে স্থির করলো ঐ চিঠির সাহায্যেই শর্বরীকে সে ওখান থেকে উৎখাত করবে।

জগতে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অতি বড় জঘন্য কাজ করতেও এতটুকু ইতস্তত: করে না, বা এতটুকু সংকোচ বোধ করে না, সুবিনয় ছিল সেই শ্রেণীর মানুষ।

পরের দিনই সে রাত্রে শর্বরীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করল।

শর্বরী তখন সবে মাত্র নার্সিংহোম থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে।

বাইরের ঘরে সুবিনয়কে বসে থাকতে দেখে শর্বরী বললে, সুবিনয়বাবু কতক্ষণ এসেছেন?

সুবিনয় গম্ভীর হয়ে বললে, বসুন ডাঃ রায়, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আজ আমি বড় ক্লান্ত সুবিনয়বাবু. কাল দুপুরে আসবেন দয়া করে। শর্বরী বলে।

কিন্তু কথাটা জরুরী, আজই আমাকে শেষ করতে হবে।

সুবিনয়ের গলার স্বরটা শর্বরীর কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক মনে হতেই ও একটু বিস্মিত হয়েই তাকাল সুবিনয়ের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, ডাক্তার রায়। দেখুন আমি ঘোরপ্যাঁচ ভালবাসি না, সোজা স্পষ্ট কথা

বলাই স্বভাব আমার।

সুবিনয়বাবু!

শুনুন ডাঃ রায়, আমার একটা বক্তব্য আছে।

বক্তব্য!

হ্যাঁ, আমার কাকার জীবিতকালে আপনি এখানে যেমন মাইনে নিয়ে কাজ করছিলেন, তেমনই এখানে কাজ করবেন, না এখান থেকে অন্যত্র কোন কাজের চেষ্টা করে চলে যাবেন?

স্তম্ভিত বিস্ময়ে কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে শর্বরী। একটা বাক্যও উচ্চারণ করতে পারে না।

এসব সুবিনয় কি বলছে!

সুবিনয়বাবু!

দেখুন ডাঃ রায়, আপনার সমস্ত পরিচয়ই আমি জানি।

আমার পরিচয় আপনি জানেন!

হ্যাঁ. জানি। এবং আপনার পুত্র গৌতমের যে কোন জন্ম-পরিচয় নেই—

থামুন! আপনি যান! এখুনি এখান থেকে চলে যান! যান—সহসা যেন আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে শর্বরী।

কিন্তু সুবিনয়ের উঠবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

সে বললে, চোখ রাঙিয়ে কোন লাভ হবে না শর্বরী রায়। কাকার চোখে ধুলো দিতে পেরেছেন বলে যে আমার চোখেও ধুলো দেবেন তা হবে না। সোজা কথায় যদি না যান ত সব কথা আপনার প্রকাশ করে দেবো আমি।

উঃ, লোকটা শয়তান না পিশাচ! অনায়াসেই একজন অসহায় নারীর চরিত্রের উপর কালি ছিটাতে এসেছে!

ভেবে দেখুন, সোজা কথায় সব ছেড়েছুড়ে দেবেন, না বাঁকা পথ আমি নেবো? সুবিনয় ঘোষাল আবার বলে শর্বরীকে চুপ করে থাকতে দেখে।

চিরদিনের শান্ত স্বল্পবাক শর্বরী যেন সহসা দপ্ করে জ্বলে ওঠে। আক্রোশে ঘৃণায় তার শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে। চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, যান! যান—এখান থেকে। এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যান।

যাচ্ছি। তবে কথাটা আমার ভেবে দেখবেন। তিন দিন মাত্র সময় দিয়ে গেলাম।

সুবিনয় চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শর্বরী ঘরের মধ্যে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল তার মনে নেই। জানকীর ডাকে তার খেয়াল হলো।

মাঈজী!

কে!

স্নানের জল যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল মাঈজী!

চল্। আমি আসছি।

সারাটা রাত্রি শর্বরীর চোখের পাতায় ঘুম এলো না। একটা প্রচণ্ড অগ্নি-প্রবাহ যেন তার শিরায় শিরায় অনুক্ষণ বয়ে যেতে লাগল। মানুষ কি কেবল মানুষকে আঘাতই দেবে? কোনদিনই কি তারা আঘাত ও বেদনার কুশ্রীতাকে অতিক্রম করে আনন্দের সন্ধান পাবে না! সোজা ভাবেই ত সুবিনয় বললে পারত তাকে সরে যাবার জন্য। সানন্দে সে সরে দাঁড়াত। কোন লোভই ত তার ছিল না ডাঃ ঘোষালের সম্পত্তির উপর। কিন্তু এমন নীচতার আশ্রয় কেন নিল সুবিনয়। স্বার্থের জন্য সে পশুর স্তরে কেন নিজেকে নামিয়ে আনল। এতে করে কি সে নিজেকেই নিজে অপমান করল না? আবার কখনো মনে হতে লাগল, না, সে সরে যাবে না। সুবিনয় যখন চোখ রাঙিয়ে গেল, সেও দেখবে কেমন করে সে সরাতে পারে শর্বরীকে।

কিন্তু তার পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ, তার মনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ যেন শিউরে উঠতে থাকে সে কথা ভাবতে গিয়ে। ছি ছি ছি, সুবিনয় না হয় এত নিচে নেমেছে, তাই বলে সে কেমন করে নিজেকে অত নিচে নামিয়ে আনবে!

ভ্রূক্ষেপ করে না অবিশ্যি শর্বরী নিন্দা-স্তুতিকে, কিন্তু তাই বলে কাদা ঘাঁটা-ঘাঁটি নীচতাকে সে ঘৃণা করে।

তার চাইতে প্রয়োজন নেই তার এসবে।

চলেই যাবে সে এখান থেকে।

কিন্তু কোথায়?

তার যে কাজ চাই! কাজ ছাড়া ত সে বাঁচতে পারবে না। কিন্তু সুবিনয়ের দাবী স্বীকার করে নেবার পর এখানে থাকার মধ্যে যে গ্লানি, তাও ত তার সহ্য হবে না। স্বীকারই যদি করে নিতে হয় সুবিনয়ের দাবী, এখান থেকে তাহলে তাকে চলে যেতে হবে এও স্বতঃসিদ্ধ। এবং যে মুহূর্তে সে মনঃস্থির করল যে সে এখান থেকে চলেই যাবে, সেই মুহূর্তেই মনের সমস্ত গ্লানি যেন নিঃশেষে মুছে গেল।

ধীরে ধীরে শর্বরী খোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। দূর দিগন্তে অত্যাসন্ন প্রত্যুষের প্রত্যাশা।

অন্ধকার একটু একটু করে আবছা ধূসর হয়ে আসছে। সমুদ্রবায়ু সারা নিশি জাগরণ-ক্লান্ত চোখেমুখে এসে যেন একটা ঠাণ্ডা ঝাপ্‌টা দিয়ে যায়।

এখানকার বাস তার উঠলো ঠিকই, কিন্তু এবারে আবার কোন্ নতুন বন্দরে! কবে পৌছাবে শর্বরী তার জীবনের শেষ বন্দরে?

শেষ বারের মত নোঙর ফেলবে সে!

হঠাৎ কেন না জানি ঐ মুহূর্তে অতীতের একখানি মুখ স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে। কিন্তু না। কে সে! প্রয়োজন নেই আর তার শৈবালকে।

আরো দুটো দিন ভাবলো শর্বরী। তারপর সে স্থির করলো আপাততঃ সে বিলাত যাবে। হাতে যা তার এক বৎসর চার মাসে জমেছে, তাতে করে বছর দু-তিন সে অনায়াসেই বিলাতে গিয়ে কাটিয়ে আসতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার ও গৌতমের পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করে দিল সেইদিনই। এবং পাসপোর্ট অফিস থেকে ফিরবার পথে মিঃ মেটার অফিসে সে গেল।

মিঃ মেটা অফিসেই ছিলেন।

আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম মিঃ মেটা।

বলুন।

ডাঃ ঘোষালের সম্পত্তির সমস্ত দাবী-দাওয়া আমি ছেড়ে দিতে চাই।

সে কি ডাঃ রায়! এ আপনি কি বলছেন?

হ্যাঁ, তাই। সুবিনয়বাবুই সব নিন। তাছাড়া সত্যি বলতে গেলে ত প্রাপ্য সব কিছুই তাঁরই। কে গৌতম! গৌতম কেন পাবে!

বিস্মিত মিঃ মেটা তাকিয়ে থাকেন শর্বরীর মুখের দিকে। এও সম্ভব! এত বড় সম্পত্তি হাতে পেয়েও কেউ ছেড়ে দেয়! তারপরই তাঁর মনে হয় সুবিনয় হয়ত গিয়ে শর্বরীকে কিছু বলেছে। তাই তিনি বলেন, বুঝতে পেরেছি ডাঃ রায়। সুবিনয় ঘোষাল বোধ হয় আপনাকে ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকুন। সাধ্য নেই তাঁর তিনি কিছু করতে পারেন।

মৃদু হেসে শর্বরী বলে, না, ঠিক সেজন্য নয় মিঃ মেটা। তাছাড়া কারো ভয়ে পালাবার মত দুর্বলতাও আমার নেই। আমি নিজে থেকেই চলে যাচ্ছি।

কিন্তু কেনই বা যাবেন?

যাচ্ছি এটাই শুধু জানুন, কেন যাচ্ছি নাই বা জানলেন। আপনি সম্পত্তি ট্রান্স্‌ফারের সব ব্যবস্থা করে দিন।

কিন্তু ডাঃ রায়, কিছু করবার ত আপনার ক্ষমতা নেই। সম্পত্তি আপনার

ছেলে গৌতমের। সে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত আপনি তার অছি মাত্র। তার বেশী কিছুই নন।

আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি মিঃ মেটা, গৌতম বড় হয়েও কোন দিন এ সম্পত্তির দাবী করতে আসবে না।

সেটা অনেক পরের কথা। বড় হয়ে আপনার ছেলে গৌতম কি হবে না হবে সে আপনি বলতে পারেন না।

কিন্তু—

না, আপনার সম্পত্তি ট্রান্স্‌ফার করবার, জানবেন, কোন আইনগত অধিকারই নেই, মৃত ডাঃ ঘোষালের উইল অনুযায়ী।

নেই!

না।

তবে আর কি হবে! কিন্তু আমরা চলে যাচ্ছি—শীঘ্রই।

কোথায় যাচ্ছেন?

পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করে এলাম এইমাত্র, বিলাত যাবো।

কিন্তু আবার বলবো ডাঃ রায়, মিথ্যে মিথ্যে আপনি চলে যাচ্ছেন।

শর্বরী আর কোন জবাব দেয় না। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেয়।

কথাটা রাষ্ট্র হতে দেরি হলো না।

সকলেই জানলো শর্বরী শীঘ্রই বিলাতযাত্রা করছে। সুবিনয় ঘোষালও কথাটা শুনলো। মনে মনে সে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল।

ডাঃ আলীর সামান্য কদিনের পরিচয়েই শর্বরীকে ভাল লেগেছিল। তিনি কথাটা শুনে বললেন একদিন, এসব কি শুনছি ডাঃ রায়?

কি ডাঃ আলী?

আপনি নাকি শীঘ্রই ইউরোপ যাচ্ছেন?

ঠিকই শুনেছেন ডাঃ আলী।

আমাকে এনে আপনি এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন?

তাতে কি হয়েছে। চিরদিন ত কেউ এক জায়গাতেই থাকে না। আপনি রইলেন, সব দেখাশুনা আপনি করবেন। তাছাড়া মিঃ মেটা রইলেন—যখন যা প্রয়োজন হয় তাঁকে বলবেন।

আপনি চলে গেলে এ নার্সিংহোম আমি চালাতেই পারবো না।

মিঃ মেটা আরো একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করবেন বলেছেন।

হাসপাতাল থেকে ফিরবার পথে শৈবাল গুলু ওস্তাগর লেনে গিয়ে হাজির হলো বিকাশের বাসায়। বড রাস্তায় গাড়ি রেখে গলির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো বিকাশের বাসার সামনে।

দরজা বন্ধ ছিল।

কিছুক্ষণ ধরে কড়া নাড়বার পর পাশের বাড়ি থেকে প্রশ্ন এলো, কে? কাকে চান?

এ বাড়িতে বিকাশবাবু—

তারা নেই।

নেই!

না।

তাঁরা কোথায় গিয়েছেন বলতে পারেন?

না।

ভদ্রলোক অতঃপর জানালা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। শৈবাল বাধা দিয়ে বলে, অ মশাই! শুনুন না—বলতে পারেন বিকাশবাবুর অসুখ ছিল, তিনি—

পরশু শেষ রাত্রের দিকে মারা গেছেন।

মারা গেছেন।

হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে জানালার কপাট দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

বিকাশ। বিকাশ তাহলে মারা গেল! বিকাশ নেই! অমিয়ার কপালে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলের ভোরের অরুণোদয়ের মত সেই রক্ত-সিন্দূরের টিপটি নিষ্ঠুর বিধাতা তাহলে সত্যি সত্যিই মুছে দিয়েছেন। সিঁথির সেই এয়োতির চিহ্নটুকু অমিয়ার মুছে গেছে চিরতরে!

কি ভাবে যে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে শৈবাল গলিপথটুকু আবার অতিক্রম করে বড় রাস্তায় এসে পড়লো, নিজেই জানে না। রাত বেশী নয়, মাত্র সাড়ে আটটা। শব্দ-মুখরিত শহর। অবিরাম জনস্রোত চলেছে। চলেছে নানা ধরনের যানবাহন। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সী, রিক্শা, প্রাইভেট কার—বিচিত্র একটা শব্দগুঞ্জন গুনগুনিয়ে চলেছে। অন্ধকার গলির মধ্যে স্যাঁতসেঁতে একতলা বাড়িতে একটা আলোবাতাসহীন ঘরে নিদারুণ যক্ষ্মার হাতে নিঃশব্দে একজন প্রাণ দিয়ে গেল। কতটুকু ক্ষতি হলো এই জগতের তাতে?

অগণিত জনসমুদ্রের লক্ষ কোটি জীবন-বুদ্বুদের একটি বুদ্বুদ মিলিয়ে গেল

নিঃশব্দে। জাগলো না কোন আলোড়ন, উঠলো না কোন প্রতিবাদ। লক্ষ কোটি প্রদীপের একটি শিখা নিবে গেল, তাতেই বা কার কি এসে গেল?

প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কত জানা-অজানা রোগের হাতে মানুষ নিজেকে সঁপে দিচ্ছে, এর মধ্যে নতুনত্ব কিই-বা আছে। প্রতিদিন নতুন নতুন সব ঔষধ আবিষ্কৃত হচ্ছে: আবিষ্কৃত যখন হচ্ছে তখন পাবলিসিটির অন্ত নেই, অমুক রোগের অব্যর্থ ঔষধ এতদিনে আবিষ্কৃত হলো, কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যাচ্ছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা।

বৈজ্ঞানিকের দিবারাত্রির পরিশ্রম মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞেরা বলছেন চেষ্টা করা গেল—হলো না তা কি হবে। আর যেখানে সম্ভব হচ্ছে পোস্টমর্টেম করে দেখবার চেষ্টা হচ্ছে দেহের কোন্ অংশে কোন্ যন্ত্রে ধরেছিল ভাঙন—কিন্তু তাতে অমিয়াদের কতটুকু লাভ। যে সিঁথির সিন্দুর তাদের মুছে গেল সে সিঁথি ত সাদাই রয়ে গেল।

এই যে রোগের সঙ্গে বিজ্ঞানের যুদ্ধ, এর শেষ অধ্যায়ে কি কোন দিনই পৌছানো যাবে না। যেখানে যত বড় দুর্ধর্ষ, যত বড় সাংঘাতিক রোগ-বীজাণুই হোক না কেন, মানুষের উদ্ভাবিত ঔষধের বা অস্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করবে কবে?

কোথায় সেদিন, কতদূরে, যেদিন মৃত্যুকে মানুষ শুধু মেনে নেবে স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই! রোগের বেশে আকস্মিক মৃত্যুকে স্বীকৃতি দেবে না! হবে না কি এমন কোন হাসপাতাল বা আরোগ্য-নিকেতন, যেখানে যে-কোন রোগাক্রান্ত হয়েই মানুষ প্রবেশ করুক না কেন, সত্যিকারের রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন পেয়ে আবার বাইরে বের হয়ে আসবে তারা একদিন নতুন আশ্বাসে, নতুন প্রতিশ্রুতিতে মাথা উঁচু করে।

গাড়িটা চালাতে চালাতে কখন যে একসময় শৈবাল পরিচিত বিরাট গেটটার মধ্যে দিয়ে হাসপাতালের মধ্যে এসে ঢুকেছে, বুঝতেও পারেনি। কি এক অদৃশ্য টানেই যে হাসপাতালটা তাকে টানে, ও যেন বুঝতেই পারে না।

হঠাৎ ও চমকে উঠলো কার যেন বুকভাঙা কান্নার শব্দে।

ইমারজেন্সী ওয়ার্ডের সামনে করিডোরটার নিচে কে এক নারী চাপাকান্না কাঁদছে: কেমন করে আমি একা একা ফিরে যাবো রে! ওরে আমি অনেক আশা করে যে খোকনকে আমার হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম!

আবার মৃত্যু! মৃত্যু আবার তার ধারালো নখরে ছিনিয়ে নিয়েছে কোন্ এক অভাগিনী জননীর বুকজোড়া নিধি! হাসপাতালের এ ত নিত্যনৈমিত্তিক

ঘটনা। জন্ম ও মৃত্যুর আনাগোনা। তবু হঠাৎ ঐ রকম কাউকে কাঁদতে শুনলে বুকের ভিতরটা ধ্বক্‌ করে ওঠে কেন!

গাড়ি থেকে নামল শৈবাল।

শুধু হাসপাতালই বা কেন, জগৎ জুড়েই ত চলেছে ঐ নিত্য জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মানুষের এই পৃথিবীতে আসা আর যাওয়া। শুধু ক্ষণিকের বিস্মৃতি। আশা-নিরাশা ব্যথা-বেদনা আর দেওয়া-নেওয়ার ছেলেখেলা। জগৎজোড়া খেলাঘরে পুতুলনাচের প্রহসন রোগ বা দুর্ঘটনা তো একটা নিমিত্ত মাত্র।

করিডোরের টিমটিমে আলোয় শৈবাল দেখলে মাটিতে বসে আলুথালু বেশে এক নারী কাঁদছে, আর তাকে ঘিরে তিন-চারজন নারী ও পুরুষ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। টিমটিমে আলো আর সঞ্চরণশীল ছায়ার আনাগোনা।

রাত্রির হাসপাতালটার একটা কেমন আত্মসমাহিত ধ্যানমগ্নতা। অদ্ভুত শান্ত একটা ঘুম-ঘুম ভাব নিঃশব্দ চলাফেরার একটা সতর্কতা।

ইমারজেন্সীর সরু মৃদু আলোকিত প্যাসেজটা দিয়ে এগিয়ে চলল শৈবাল।

ডানদিকে ইমারজেন্সী রুমে রাত-ডিউটির একজন ছাত্র বোধ হয় কোন একজন রোগীর আত্মীয়ের সঙ্গে বচসা করছে।

সামান্য একটু কেটে গেছে, তার জন্য এডমিশনের কোন দরকার হবে না। ফাস্ট্‌ এইড্‌ দিয়ে দেওয়া হয়েছে নিয়ে যান। কাল সকালে সার্জিক্যাল আউটডোরে একবার এসে দেখিয়ে যাবেন। ইমারজেন্সী ডিউটি ডাক্তার বলছে।

করিডোরে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াবার শব্দ পাওয়া গেল।

ফিরে তাকাল শৈবাল।

আবার বোধ হয় কোন রোগী এলো।

কুলীরা স্ট্রেচারে করে ধরাধরি করে নিয়ে এলো বছর চব্বিশ-পঁচিশের একটি তরুণীকে। সঙ্গে তার যে যুবকটি ছিল তাকে দেখে চমকে উঠলো শৈবাল।

যুবকটি তার চেনা, তারই এক ডাক্তার-বন্ধু।

ভূপতি। কি ব্যাপার? প্রশ্ন করে শৈবালই।

কে। শৈবাল! এই দেখো ভাই, শীলা সর্বনাশ করে বসেছে। আফিম খেয়েছে।

সে কি!

হ্যাঁ।

শীলার জ্ঞানহীন দেহটা কুলীরা স্ট্রেচারে করে এনে ইমারজেন্সী রুমের একটা

একজামিনেশন টেবিলের উপর শোয়াল।

অন ডিউটি ডাঃ মণি কর্মকার এগিয়ে এলো। কর্মকার নতুন পাস করে ডাক্তার হয়েছে।

কি—কী হয়েছে? ডাঃ কর্মকার ভূপতিকে প্রশ্ন করে।

ওপিয়াম পয়েজনিং!

ওপিয়াম পয়েজনিং। বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপরে শায়িতা শীলার মুদ্রিত চক্ষুর পাতাটা টেনে টর্চের আলো ফেলে চোখের পিউপিলটা একবার দেখে পাল্‌স্‌টা পরীক্ষা করে সম্মুখে দণ্ডায়মান নার্সকে লক্ষ্য করে বলে, নার্স, স্টমাক্ পাম্প রেডি করুন।

নার্স সব রেডি করতে চলে গেল।

আপনি কে হন ওঁর?

দাদা। আমার ছোট বোন।

চলুন, নাম ঠিকানা দেবেন, চলুন!

নাম ঠিকানা পরে নিও কর্মকার। আগে পেসেণ্ট্‌কে দেখো—শৈবাল বলে।

কে! ও, ডক্টর ঘোষ আপনি!

হ্যাঁ, ভূপতি আমার বন্ধু—ও নিজেও একজন ডাক্তার, এই কলেজেরই এক্স্ স্টুডেণ্ট্।

ডাঃ কর্মকার ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

শৈবাল ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো একটা নোংরা টেবিল ক্লথ বিছানো যে টেবিলটার উপর এইমাত্র কুলীরা শীলাকে এনে শুইয়েছে তার সামনে।

তাকাল শায়িত মুদ্রিতচক্ষু প্রায়মৃত শীলার দিকে।

ইমারজেন্সীর সিলিং থেকে ঝুলন্ত বৈদ্যুতিক আলোর রশ্মিটা শীলার মুখের উপর এসে পড়েছে।

অনেকদিন পরে শীলাকে আবার দেখলো শৈবাল।

আরো রোগা হয়ে গিয়েছে, মুখটা ভেঙে গিয়েছে।

রুক্ষ এলো খোলা চুল।

শীলা—শীলা আফিং খেয়েছে, কেন!

চমৎকার রবীন্দ্র-সংগীত গাইতো শীলা।

হঠাৎ পাশের দিকে তাকাতেই নজর পড়লো দণ্ডায়মান ভূপতির মুখের দিকে।

ডাঃ কর্মকার স্টমাক্ পাম্প নিয়ে এগিয়ে এলেন। নার্সও তাঁকে অ্যাসিস্ট্ করবার জন্য পাশে এসে দাঁড়ালো।

নিঃশব্দে ভূপতির একটা হাত ধরে শৈবাল বাইরের আবছা আলো-আঁধারি করিডোরের নিচে এল।

কি ব্যাপার?

জানি না ভাই। ওর বিয়ের জন্য চেষ্টা করছিলাম অনেকদিন থেকেই। ও অবিশ্যি বরাবরই বলে এসেছে—ও বিয়ে করবে না। আমরা তত কান দিইনি সে কথায়। তারপর দিন পনের হলো একটি ভদ্রলোক ওকে দেখে পছন্দ করায় আমরা ঠিক করি সেখানেই ওর বিয়ে দেবো—

তারপর?

ওকে মা-ই সেকথা জানায়। মাকে নাকি বলেছিল সে বিয়ে করবে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটায় কোন গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজনই আমরা কেউ মনে করিনি। তাই আমরা বিবাহের দিন স্থির পর্যন্ত করে ফেলি। আগামী পরশু সেই নির্দিষ্ট বিয়ের তারিখ।

আগামী পরশু!

হ্যাঁ, কাল গায়েহলুদ হবার কথা। কেনা-কাটা সব হয়ে গিয়েছে, সমস্ত আয়োজন বলতে গেলে সম্পূর্ণ, এমন সময় আজ সন্ধ্যারাত্রের দিকে এই বিভ্রাট! কিন্তু কেন যে ও এমন করলো, কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই; ওর মত শান্ত ধীর মেয়ে—

শৈবাল বলে, চলো ভিতরে যাওয়া যাক।

ভূপতিকে নিয়ে দুজনে আবার ঘরের মধ্যে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

শৈবালই ডাঃ কর্মকারকে প্রশ্ন করে, কেমন বুঝছো কর্মকার?

নট্ এট্ অল হোপফুল স্যার! পেসেন্ট্ ক্রমেই সিঙ্ক্ করছে! কর্মকার জবাব দেয়।

শৈবাল তাকালো আর একবার। তাকালো শীলার মুখের দিকে।

ঈষৎ নীলাভ শুষ্ক মুখখানা, মুদ্রিত চক্ষু।

নিঃশব্দে শৈবাল শীলার একখানা হাত তুলে ধরতেই যেন শিরশির করে ওঠে তার আঙুলের ডগা। বরফের মত ঠাণ্ডা, নিস্তেজ। নাড়ীর গতি অত্যন্ত ক্ষীণ। প্রায় বোঝাই যায় না।

ধীরে ধীরে আবার নাড়ীটা পরীক্ষা করে শীলার ঠাণ্ডা হাতটা নামিয়ে রাখলো

শৈবাল নিঃশব্দে টেবিলের একপাশে। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে না বললেও চলে। শীলার জীবন-প্রদীপ যে প্রায় নিভে আসছে বুঝতে কষ্ট হয় না শৈবালের।

কিন্তু কেন? কেন শীলার জীবন-প্রদীপ এমনি করে স্বেচ্ছায় নিজের হাতে সে নিভিয়ে দিয়ে গেল?

কোন ব্যথা, কোন না-পাওয়ার অতৃপ্তি কি তাকে মৃত্যুর মাঝে এমনি করে ঠেলে দিল? কিন্তু কিসের ব্যথা, কিসের অতৃপ্তি! কেন শীলা এমনি করে আত্মহত্যা করলো!

অনেক দিন আগে, শীলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সেই গানটা যেন শৈবালের মনে পড়ে।

কি যেন গানটা: ওরে ভীরু প্রেম, জয় করে কেন ভয় তবু তোর যায় না!

চমৎকার গাইতো শীলা।

গলাটা সত্যিই শীলার ভারি মিষ্টি ছিল।

সেই শীলা নিশ্চিত মৃত্যুপথে! আত্মহত্যা করলে!

নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ইমারজেন্সী রুম থেকে বের হয়ে এলো শৈবাল।

শীলার শেষ যাত্রার মর্মান্তিক দৃশ্যটা যেন সত্যিই আর ও সহ্য করতে পারছিল না: সেই নীলাভ মুখ, মুদ্রিত চক্ষু, বিপর্যস্ত কেশভার, শিথিল দেহবল্লরী! উঃ এ কি করুণ ভয়াবহ মৃত্যু!

মৃত্যুর কাছে কি অসহায় করুণ স্বেচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণ!

আবার ইমারজেন্সীর সামনে একটা অ্যামবুলেন্স এসে দাঁড়ালো।

চওড়া সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে শৈবাল মেডিকেল ব্লকের মধ্যে এসে পা দিল। টিমটিমে প্যাসেজের আলোটা সিঁড়ির মাথায় এসে পড়েছে। একটু এগিয়ে গেলেই দু দিক দিয়ে চওড়া কাঠের সিঁড়িগুলো দুপাশে দোতলায় উঠে গিয়েছে।

অলস শিথিল পদবিক্ষেপে শৈবাল উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে।

শীলা আত্মহত্যা করলো, কিন্তু কেন? সে কি তবে কাউকে ভালবাসতো! কাকে! কাকে ভালবাসতো শীলা?

হঠাৎ মনের স্মৃতির পাতাগুলো যেন এলোমেলো বাতাসে এদিক-ওদিক উড়ে বেড়াচ্ছে।

কথায় কথায় একদিন শীলা তাকে বলেছিল, আচ্ছা শৈবালদা, অসম্ভবকে কখনো আপনি স্বপ্ন দেখেছেন!

স্বপ্ন তো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অসম্ভব ও মিথ্যা কল্পনাকে নিয়েই শীলা!

তাই নাকি ? তবে মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন বলুন তো ?

স্বপ্নের উপরে কারো ইচ্ছা খাটে না বলেই বোধ হয়।

তাই হবে।

শীলার আত্মহত্যার কথা ভাবতে ভাবতে সহসা আর একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে যায় শৈবালের।

এই হাসপাতালেরই একটি মেয়ে।

কৃষ্ণা।

সবে শৈবাল তখন মেডিকেল কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে।

কৃষ্ণা চৌধুরী তখন হাসপাতালে স্টাফ নার্স মেডিকেলে। রোগা পাতলা চেহারা, কালো রঙ, কিন্তু সেই কালোর মধ্যে ছিল অদ্ভুত একটা শ্যামলিমা। আর কৃষ্ণার চোখ মুখ কপাল চিবুক প্রভৃতির গঠনের যেন তুলনা ছিল না। অপূর্ব শ্রী ও সৌন্দর্যের যেন একটা মনোহারিণী সমন্বয়। এবং সেকেণ্ড ইয়ার থেকে সিক্সথ্ ইয়ার পর্যন্ত যত স্টুডেন্ট্, যত তরুণ পাস করা নতুন ও পুরাতন হাউস স্টাফের দল, সকলের মধ্যে খুব কম ব্যতিক্রমই ছিল যে কৃষ্ণার প্রতি অন্ততঃ একবারও আকৃষ্ট হয়নি, তা সে প্রকাশ্যেই হোক বা মনের নিভৃত গহনেই হোক।

আর সকলের কল্পনা ও প্রকাশ্য প্রেমের মধ্যমণি ছিল কৃষ্ণা চৌধুরী!

স্টুডেন্ট ও হাউস-স্টাফরা ত বটেই, সর্ববয়েসী ভিজিটিংরা পর্যন্ত কখনো কোন কারণেই স্টাফ নার্স কৃষ্ণার সঙ্গে হেসে ছাড়া কথা বলেননি।

অথচ বিচিত্র এই যে, দিবারাত্র জলের মধ্যে থেকেও হংসীর গায়ে যেমন জল লাগে না, তেমনি কৃষ্ণার কারো প্রতি কখনো দুর্বলতা জেগেছে এমনটি শোনা যায়নি। যদিও এই ব্যাপার নিয়ে হাসপাতালের সর্বত্র জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। অবশেষে সেই কৃষ্ণা-প্রেম-রহস্য এক করুণ মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়ে গেল সবার সমক্ষে। দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলো। আশ্চর্য, সেই কৃষ্ণাই ভালবাসার লজ্জাকে ঢাকতে গিয়েই নাকি প্রাণ দিয়েছে এবং জানা গেল সেটা তার আত্মহত্যার পর।

বিচিত্র নারীমন।

কে জানতো কৃষ্ণার অবচেতন বা নির্জ্ঞান মনের মধ্যে ছিল বিচিত্র এক পুরুষসঙ্গ-লিপ্সা, যার ফলে সাধারণ পুরুষের প্রতি আকৃষ্টা না হয়ে তার মন ছুটেছিল এমন একটি পুরুষের দিকে—অন্ধ বিচিত্র এক দুরন্ত আবেগে যে পুরুষকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে স্বীকৃতি দিতে সে যেমন পারেনি, তেমনি তার প্রতি

আকর্ষণটাও কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি।

রূপচাঁদ নামে একটা সুইপার ছিল হাসপাতালে।

লোকটার যেমন ভয়াবহ কুৎসিত চেহারা, তেমনি দানবের মত আকৃতি। বিরাট লম্বা-চওড়া, কালো কুচকুচে গায়ের রং। সমস্ত মুখে বসন্তের ক্ষতচিহ্ন। একটা চোখ কানা। হাত পা বুক পিঠে রোমের অত্যধিক প্রাচুর্য। উপরের পাটি দাঁতের যেমন তার এলোমেলো গঠন, তেমনি দিবারাত্র পানের রসে ও বিড়ি খাওয়ায় মেছেতার ছোপে নোংরা। একটা নীল রঙের ময়লা হাফপ্যান্ট্ পরে ও গেঞ্জি গায়ে সর্বদা থাকত লোকটা। যেমন আকৃতি তেমনি অসুরের মত দেহে শক্তিও ছিল লোকটার। লোকটা যে কেবল কুৎসিতই ছিল তা নয়, বদরাগী ও কলহপ্রিয় ছিল। কিন্তু ওয়ার্ড-বয় বা সুইপার দারোয়ানেরা কেউই লোকটার সঙ্গে লাগতে সাহস পেত না। যমের মত লোকটাকে সকলে ভয় করত।

দিনের বেলা বড একটা ডিউটি দিত না রূপচাঁদ ইচ্ছা করেই। রাত্রের ডিউটিই সে নিত এবং তাতে করে সকলেরই সুবিধা হতো তার সহকর্মীদের। রূপচাঁদ রাত্রের ডিউটিতে থাকায় অবিশ্যি আরো একটা সুবিধাও ছিল, চার-পাঁচ-জনের কাজ সে অনায়াসে একাই করতে পারত। সারাটা দিন ভরপেট খেয়ে দীর্ঘ একটানা একটা নিদ্রা দিয়ে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ রূপচাঁদ ঘুম ভেঙে উঠে বসত। তারপর একটা পুরো দেশী পাঁট গলায় ঢেলে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে হাসপাতালে গিয়ে হাজির হতো। রাতজাগা প্রেতের ছায়ার মত আবছা আলো-আঁধারের মধ্যে সারাটা রাত বিরাট হাসপাতালটার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রূপচাঁদ যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতো। এবং যেখানকার যে কাজ যেই বলুক না কেন করে দিত সানন্দে।

হাসপাতালের মেইন বিল্ডিং, বিরাট পাঁচতলা সাদা বাড়িটায় লিফ্‌টের ঘরের পাশেই একটা সরু প্যাসেজের মত ছিল। তারই একপাশে একচিলতে একটা ঘর। সেই ঘরটা দিনের বেলা লিফট্‌ম্যানেরা ব্যবহার করলেও রাত্রে খালিই পড়ে থাকত সাধারণতঃ। সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ঘরের এক কোণে খাটিয়াটার তলায় একটা ভাঙা কাঠের বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখা দেশী পাঁটের বোতলটা বের করে মধ্যে মধ্যে এক-আধ ঢোক গলায় ঢেলে নিত রূপচাঁদ তার রাত্রের হাসপাতাল টহলের ফাঁকে ফাঁকে।

রাত্রের দিকে হাসপাতাল যেন ঘুমে নেতিয়ে পড়ে। শুধু প্যাসেজে, ওয়ার্ডে, সিঁড়িতে অল্পশক্তির বিদ্যুৎবাতিগুলো ক্লান্ত চোখে যেন মিটিমিটি তাকায়।

লম্বা হলঘরের মত ওয়ার্ডগুলোতে এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পাশাপাশি

বেড়ে বেড়ে রোগীরা ঘুমায়।

রাতজাগা ডিউটি নার্স ও সিস্টারদের লঘুপদবিক্ষেপ মধ্যে মধ্যে কেবল শোনা যায়, বাতাসে ভাসে একটা হাসপাতালের নানাবিধ মিশ্র কটু গন্ধ—লাইজোল, স্পিরিট, আয়োডিন, ইথার ও ডেটলের।

হয়ত বা কখনো শোনা যায় কোন রোগীর অস্পষ্ট একটা কাতরোক্তি। হঠাৎ হয়ত অস্পষ্ট কানে ভেসে আসে কোন অ্যাম্বুলেন্স থামার বা ছেড়ে যাওয়ার শব্দ।

একটা পাষাণভার স্তব্ধতার সমুদ্রে খণ্ড খণ্ড শব্দ-বুদ্বুদ!…

সেই সময়ই এক রাত্রে!

একতলার সেই লিফ্‌ট্‌ঘরের সামনে প্যাসেজের পাশের সেই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে একটি চাপা মিনতি-করুণ নারী-কণ্ঠস্বর শুনে একজন রাত্রের অন-ডিউটি হাউস ফিজিসিয়ান ডাঃ সেনরায় ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো।

রূপচাঁদ! লক্ষ্মীটি শোন। নারীকণ্ঠের সকরুণ মিনতি।

নেহি, তুম্ ভাগো হিয়াসে!…আক্রোশ ভরা কর্কশ পুরুষকণ্ঠ।

এই নে লক্ষ্মী! দশটা টাকা রাখ্। আবার নারীকণ্ঠের কাকুতি।

কেয়া রূপেয়া! যাও, নেহি মাংগতা। কাহে তুম হামারা পিছ পড়া বোলত।

রূপচাঁদ!

ছেড়ে দে! ছেড়ে দে মুঝে!

রূপচাঁদ!

ফির্!…ঠাস্ করে একটা চড়ের শব্দ শোনা গেল: যা ভাগ্। ভাগ—

পরক্ষণেই একটা ভারি বস্তু পতনের শব্দ। তারপরই হাউস ফিজিসিয়ান ডাঃ সেনরায় দেখল প্যাসেজের উপর কে যেন এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এবং প্যাসেজের সেই ক্ষীণ আলোতে ডাঃ সেনরায়ের চিনতে কষ্ট হয় না সে আর কেউ নয়, স্টাফ নার্স কৃষ্ণা!

পূর্বেই গলার স্বর শুনে যদিও ডাঃ সেনরায় চিনতে পেরেছিল, তখন চাক্ষুষ দেখে একেবারে নিঃসন্দেহ হলো। তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে যায়।

দু হাতের উপরে ভর দিয়ে কৃষ্ণা তখন বসবার চেষ্টা করছে।

সিস্টার!

চমকে মুখ তুলে তাকায় কৃষ্ণা। এবং পরক্ষণেই সামনে দণ্ডায়মান তার বহু মুগ্ধ স্তাবকের মধ্যে একজনকে দেখে যেন মুহূর্তে সমস্ত মুখখানা তার ছাইয়ের মতই ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময় ঘর থেকে বের হয়ে এলো সুইপার

রূপচাঁদ। এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণার সমস্ত মুখের ভাব যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে উঠে রূপচাঁদকে লক্ষ্য করে বললে, That scoundrel ! ও—ও আমাকে অপমান করেছে ডাঃ সেনরায়। মেট্রনকে দিয়ে ওকে আমি চাবুকপেটা করাবো।

কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণা চাপা আক্রোশভরা কণ্ঠে কথাগুলো বললে, সে কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করল না, নিঃশব্দে প্যাসেজটা অতিক্রম করে ওদিকে চলে গেল। আর যাকে সম্বোধন করে কৃষ্ণা কথাগুলো বললে, সে পাথরের মত নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো।

আপনাকে আমি সাক্ষী মানবো ডাঃ সেনরায় ! বলতে বলতে কান্নায় কৃষ্ণার গলার স্বর বুজে এলো।

ডাঃ সেনরায় আর সেখানে দাঁড়ালো না। যে কাজে যাচ্ছিল সেই কাজেই যাবার জন্য পা বাড়ালো।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে নার্সেস কোয়ার্টারে দোতলার বাথরুমের মধ্যে স্টাফ নার্স কৃষ্ণার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলো। পরিধানে মাত্র সেমিজটা, শাড়িটা গলায় বেঁধে ঝুলছে কৃষ্ণা! বিদ্যুৎচমকের মতই কৃষ্ণার আত্মহত্যার সংবাদটা সমস্ত হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়ল।

কৃষ্ণা চৌধুরী সুইসাইড করেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা পরে অবিশ্যি ডাঃ সেনরায়ের মুখেই সকলে শুনেছিল।

কিন্তু তারপর থেকেই সুইপার রূপচাঁদের চলনে বলনে ব্যবহারে যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিল।

অন্যান্য সুইপাররাই নাকি কানাঘুষা করতো পরস্পরের মধ্যে, অমন দুর্জয় সাহসী, বেপরোয়া রূপচাঁদ যেন হঠাৎ কেমন ভীত সশংকিত হয়ে পড়েছে। আর মদ্যপানের মাত্রাটা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে তার। আগে আগে সন্ধ্যার দিক থেকে সারাটা রাত মদ্যপান করতো সে, এখন নাকি দিনের বেলাও খালি মদই খাচ্ছে। অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।

মাসখানেকের মধ্যেই দেখা গেল রূপচাঁদের দানব সদৃশ দেহটা যেন অনেকটা কৃশ ও রুগ্ন হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে আরো একটা জনশ্রুতি হাসপাতালের রাত্রের কর্মী নার্স ও হাউস স্টাফ্‌দের মধ্যে গুনগুন করে ফিরতে লাগলো। একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি নাকি গভীর রাত্রে হাসপাতালের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়।

শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা একটা ছায়া নারীমূর্তি।

তারপর আরো এক মাস কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন সকাল বেলা বিরাট মেডিক্যাল ওয়ার্ডের চারতলা সাদা বিলডিংটার নিকট বাঁধানো শানের উপর রূপচাঁদের রক্তাক্ত চূর্ণবিচূর্ণ তালগোল পাকানো দেহটা পড়ে থাকতে দেখা গেল!

আশেপাশেও রক্ত জমে আছে।

ব্যাপারটা যেমনি বিস্ময়কর তেমান আকস্মিক। চারতলা মেডিকেল ওয়ার্ডের ছাতে কেউ কখনো বড় একটা উঠতো না। তা ছাড়া ঐ বিলডিংটার কোন জায়গা থেকেই নিচে লাফিয়ে পড়বার সুবিধা ছিল না, কারণ সর্বত্র বারান্দায় সরু তারের জাল দিয়া ঘেরা।

আর রূপচাঁদের মৃতদেহের অবস্থা দেখে মনে হয় সে চারতলার ছাত থেকেই নিশ্চয়ই পড়েছে। কিন্তু চারতলার ছাতে কি করতে সে গিয়েছিল!

ব্যাপারটা আত্মহত্যা কিনা তাই বা কে জানে!

কিন্তু আত্মহত্যাই যদি হয় তো বলতে হবে বিচিত্র রহস্যজনক আত্মহত্যা, আর একটা কথা, ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে আর কখনো রাত্রে হাসপাতালের কোথায়ও সেই ছায়া নারীমূর্তিও দেখা যায়নি।

ঘুরতে ঘুরতে শৈবাল মেডিকেল 'বি' ব্লকে এসে হাজির হলো। পর পর কেবিনগুলো। এক আধটা কেবিন ছাড়া বেশীর ভাগ কেবিনের পর্দার আড়াল থেকেই ভিতরের আলোর আভাস আসছে। পাঁচ নম্বর কেবিনটা একেবারে বারান্দার শেষপ্রান্তে। তার পরেই ডাইনে বেঁকে নেমে গিয়েছে তিনতলা থেকে দোতলায় নামবার সিঁড়িটা।

পাঁচ নম্বর কেবিনটার সামনে আসতেই অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে গেল। এবং সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল হঠাৎ আবার শর্বরীর কথা।

ক্ষণেকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল শৈবাল।

ওরা তখন সিক্সথ্ ইয়ারে পড়ে।

শর্বরীর ডিউটিতে মেডিকেল ওয়ার্ডের কতকগুলো বেডের সঙ্গে ঐ পাঁচ নম্বর কেবিনটিও ছিল। বিপত্নীক রিটায়ার্ড একজন বড় অফিসার, ডায়েবেটিস ও এনলার্জ প্রসটেটের ট্রিট্মেণ্ট করতে ভর্তি হয়েছিল এসে হাসপাতালে।

ভদ্রলোকের একটা অভ্যাস ছিল রাত্রে বা দিনে নার্স কখনো তাঁর কেবিনে এলেই বলতেন, সিস্টার, একটা কথা শুনবেন?

প্রথমটায় ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে হয়ত কেউ কেউ এগিয়ে গিয়েছে, বলুন!'

বসুন না একটু গল্প করি। আপনাকে আমার বড্ড ভাল লাগছে।

কেউ হয়ত 'কাজ আছে, বসবার সময় নেই' বলে চলে গিয়েছে। এক-আধজন যদি কখনো হয়ত বসেছে, তখন বৃদ্ধ তার হাতটি খপ্ করে ধরে বলেছে, কি নরম আপনার হাতখানি! আপনার নামটি কি?

ব্যাপারটা তখন তার আর বুঝতে বাকী থাকেনি। ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে চলে গেছে সে। এবং চার-পাঁচদিনের মধ্যেই সমস্ত সিস্টার মহলে ব্যাপারটা জানাজানি হতে আর বাকী থাকেনি।

কেউ আর সেই পাঁচ নম্বর কেবিনের দিকে যেতে চায় না একা একা।

শেষ পর্যন্ত একদিন শর্বরী যখন দ্বিপ্রহরে একাকিনী একদিন চার্টে কি একটা ঔষধের কথা লিখতে গিয়েছে—ভদ্রলোক তারই হাতটা চেপে ধরলেন।

শর্বরী আগে ব্যাপারটা জানত না। তাই বুঝতে না পেরে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কি?

তোমাকে একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবে না ত?

কি?

তোমাকে আমার বড় ভাল লাগে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। তোমার হাতটা কি নরম!

এবারে শর্বরী হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, ভদ্র ব্যবহার না করেন ত হাসপাতাল থেকে আপনাকে চলে যেতে হবে।

শর্বরী একেবারে সোজা প্রোফেসার ব্যানার্জীকে রিপোর্ট করল।

প্রোফেসার ব্যানার্জী তাঁর সিনিয়ার হাউস ফিজিসিয়ানকে ডেকে পাঁচ নম্বর কেবিনের রোগীকে ডিসচার্জ করে দেবার জন্য বললেন।

ঠিক ঐ সময় শৈবাল সেখানে গিয়ে হাজির।

প্রোফেসার ব্যানার্জী আদেশ দিয়ে চলে যাবার পর তাঁর সিনিয়ার ডাঃ চ্যাটার্জী হাসতে হাসতে বললেন, Case of E. P. অর্থাৎ Enlarged Prostate! Always behave like that!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়লো শৈবালের কতদিন সে ঐ ব্যাপার নিয়ে শর্বরীকে ক্ষেপিয়েছে!

একবার লীলার খবরটা নেওয়া উচিত।

শৈবাল ইমারজেন্সীর দিকে চলল।

ডাঃ কর্মকার তখন মৃত্যুর সঙ্গে সমানে সংগ্রাম চালিয়ে পরাস্ত হয়েছেন। একপাশে দাঁড়িয়ে ভূপতি।

ভূপতি শৈবালের পদশব্দ পেয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

শৈবাল নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

শীলার বিষ-জর্জর প্রাণহীন দেহটা টেবিলের উপরে পড়ে রয়েছে।

বার বার শীলার মুখটাই মনে পড়ছে শৈবালের এবং তাঃ মৃত নীলাভ মুখখান নয়, পরিচিত জীবন্ত সেই মুখখানি।

চমৎকার রবীন্দ্র-সংগীত গাইত শীলা—'ওরে ভীরু প্রেম, জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না।'

॥ রাত্রি শেষে ॥

ধীরে ধীরে চোখের উপর থেকে গেটওয়ে অফ্ ইণ্ডিয়া যেন মিলিয়ে গেল শর্বরীর।

ভাসমান চলন্ত জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল শর্বরী।

গৌতম সমস্ত ডেকময় উল্লাসে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। ভারি ফূর্তি হয়েছে তার। এবং ওদিকে শর্বরীর কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাবার পর সুবিনয় যখন পরম নিশ্চিন্তে ডাঃ ঘোষালের শয়নঘরে একটা সোফার উপরে গা ঢেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছে, তখন বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেল।

কে ?

ঘরে এসে প্রবেশ করলেন সালিসিটার মিঃ মেটা।

একি ! মিঃ মেটা !

হ্যাঁ, আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম মিঃ ঘোষাল। আজই এ বাড়ি ছেড়ে আপনাকে চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে, তার মানে !

খুব সহজ। এখানে আপনার থাকবার কোন অধিকার নেই। ডাঃ রায় ভদ্রতা করে আপনাকে এখানে স্থান দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমি আপনাকে থাকতে দেবো না। আপনাকে বের করে দিয়ে উঠবো। বাড়িতে তালা লাগিয়ে তবে আমি যাবো।

সুবিনয় দেখলো এ বড় কঠিন ঠাঁই।

কই দেরি করছেন কেন ? উঠুন !

সুবিনয়কে উঠতেই হলো।

দীর্ঘ তিনটি বৎসর কালের বুকে তারপর মিলিয়ে গিয়েছে। ঐ তিন বৎসরে শর্বরী এম. আর. সি. ও. জি. হয়েছে, কিন্তু তার দেহে দেখা দিয়েছে এক ভয়াবহ রোগ। তার চোয়ালের পাশে প্যারটিড গ্ল্যাণ্ডের ম্যালিগনেণ্ট টিউমার। রোগের সূত্রপাত হয়েছিল অবিশ্যি গত আট-নয় মাস থেকেই, কিন্তু প্রথমটায় সে তত নজর দেয়নি। এবং ধরা পড়বার পর রেডিয়াম ও আইসোটোপ চিকিৎসা কিছুদিন করেও যখন বিশেষ কোন সুফলের সম্ভাবনা দেখা গেল না, শর্বরী মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলো দেশে ফিরে আসবার জন্য।

মৃত্যু যখন পায়ে পায়ে অবধারিত এগিয়ে আসছেই তখন আর এই বিদেশ-বিভুঁয়ে কেন? শেষ নিঃশ্বাস নিতে যদি হয় তো সেই দেশের মাটিতে শুয়েই নেবে সে।

প্যাসেজের জন্য উঠে পড়ে লাগল শর্বরী। এবং মাসখানেকের মধ্যেই একটা পোলিশ জাহাজে সে প্যাসেজ পেয়ে গেল।

এদিকে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে শর্বরীর এম্‌. আর. সি. ও. জি.-র পাসের খবর থেকেই শৈবাল বহুকাল পরে শর্বরীর সন্ধান পেয়েই লণ্ডনে অবস্থিত তার এক বন্ধুকে শর্বরী সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে তাকে জানাতে লিখল অবিলম্বে কেবল্‌ করে।

শৈবালের সেই ডাঃ বন্ধুটি—অমিতাভ রায়, পড়তে গিয়ে বিলাতেই থেকে গিয়েছিল এবং সেখানেই এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করে প্র্যাক্‌টিস করছিল।

কেবল্‌ নয়, মাস দেড়েক বাদে অমিতাভর চিঠি পেল শৈবাল।

শৈবাল,

তোমার চিঠি পেয়েছিলাম যথাসময়েই, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি নিজেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাওয়ায় চিঠির জবাব দিতে আমার দেরি হয়ে গেল বলে আমি দুঃখিত।

অনেক খুঁজেপেতে তোমার ডাঃ শর্বরী রায়ের অনুসন্ধান গোলডার্স গ্রীনে পাই। এবং আমি যেদিন তাঁর সন্ধান পেয়ে দেখা করতে গেলাম, যে বাড়িতে তিনি পেয়িং গেস্ট হিসাবে ছিলেন, সেখানকার ল্যাণ্ড-লেডির মুখে শুনলাম, তার আগের দিনই মাত্র ডাঃ রায় তাঁর ছেলেকে নিয়ে নাকি পোলিশ জাহাজ M. S. Batoryতে ইণ্ডিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছেন।

অধিক আর কি লিখবো?

তোমাদের সকলের খবর কি? তোমার প্র্যাকটিস কেমন চলছে? মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা করে দেশে ফিরে যাই, কিন্তু দেশের সংবাদ, বিশেষ করে ওখানে নবীন ডাক্তারদের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনে সাহস পাই না। এদেশে তবু খেয়ে পরে বেঁচে আছি, ওখানে গিয়ে ত সেই উপোসীদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে চেম্বারে বা ডিসপেনসারীতে কড়িকাঠ গণনা করতে হবে।

আমাদের নন্দী সাহেবের একটা চিঠি পেলাম, সে আবার ফিরে আসবার মতলব করেছে। এ. আর. সি. পি. টি. ডি. ডি. হয়েও সে নাকি কোন সুবিধেই করতে পারছে না। আমাদের দেশে সব চাইতে দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়

বোধ হয় ডাক্তারদেরই আজকাল। মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে সংবাদ দিলে খুশি হবো।

ভালবাসা নিও।

—তোমাদের অমিতাভ

চিঠিটা যেন হাওয়ায় উড়ে এসে একঝলক খুশি দিয়েছে শৈবালকে।

এতদিন! এতদিন পরে সে শর্বরীর সংবাদ পেল। এ শুধু শর্বরীর সংবাদই নয়, সেই সঙ্গে জানতে পারল যে তার একটি ছেলেই হয়েছে।

ছেলে! তার সন্তান! কত বিনিদ্র রজনীর কল্পনা তার: কত ভীরু মনের স্বপ্ন! তার ছেলে! তার ছেলে! কার মত হয়েছে দেখতে সে! এতদিনে তার নয় বৎসরের বেশী বয়স হলো। কি নাম রেখেছে শর্বরী তার?

যে নামই রেখে থাকুক শর্বরী তার, শৈবাল তাকে খোকন বলেই ডাকবে।

চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে কি জানি কেন দিনগুলো যেন আর কাটতে চায় না শৈবালের। কি দীর্ঘ, কি মন্থর প্রলম্বিত মনে হয় তার দিন ও রাত্রির মুহূর্তগুলো। বার বার সে কলকাতার অফিসে ও বম্বের অফিসে ফোন করে, জাহাজ কতদূর এলো।

শেষ পর্যন্ত জানা গেল আগামী শনিবার জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌছচ্ছে।

আর মাত্র চারদিন। তর সইছিল না যেন আর শৈবালের। প্লেনে চেপে দুই দিন আগেই শৈবাল বোম্বাই গিয়ে পৌছাল।

জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়লো। তারও ঘণ্টাদেড়েক বাদে যাত্রীদের শুরু হলো নামা।

কাস্টমস্-এর রেলিং-ঘেরা সীমানার এদিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে শৈবাল।

একে একে যাত্রীরা নেমে আসে।

পারবে ত, পারবে ত শৈবাল শর্বরীকে চিনতে। একটা দুটো দিন মাস বা বৎসর ত নয়, দীর্ঘ নয় বৎসর পরে সে দেখবে শর্বরীকে।

কত বদল হয়েছে হয়ত তার চেহারার! চিনতে যদি না পারে সে শর্বরীকে! পারবে, নিশ্চয়ই পারবে সে চিনতে শর্বরীকে। মনের পাষাণে যে সে মুখখানি খোদাই হয়ে আছে! ভুলতে কি সে পারে? তার মুখের প্রতিটি রেখার সঙ্গে সে যে পরিচিত।

নাই বা দেখলো সে তাকে নয় বৎসর। এক যুগ পরে বা যুগ যুগ পরে দেখলেও সে তার শর্বরীকে ঠিক চিনে নিতে পারবে। সহস্র জনের মধ্যেও তাকে সে ঠিক চিনে নিতে পারবে। সে যে তার! একান্ত তারই!

বিরহী যক্ষের মত এতকাল যে শুধু তারই পদধ্বনিটি শুনবার জন্য কান পেতে রয়েছে। কল্পনার মেঘে মেঘে তাদের বিরহের মাঝে মিলনের সেতুর উপর দিয়ে ত তাদের মন দেওয়া-নেওয়া একটি মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয়নি।

তবে কেন পারবে না সে তার শর্বরীকে আজ চিনে নিতে!

একজনের পর একজন যাত্রী এগিয়ে আসছে, কাস্টমস্-এর অফিসাররা তাঁদের অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ছাড়পত্র যাদের মিলছে তারা একের পর এক কাস্টমস্-এর আবেষ্টনীর বাইরে চলে আসছে।

কিন্তু কোথায় শর্বরী!

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে শৈবালের দৃষ্টি যেন চমকে উঠলো। ঐ—ঐ নিশ্চয়ই শর্বরী। তার পাশে ঐ বালকটি! নিশ্চয়ই ওই তার ছেলে!

একটা সাদা জর্জেটের শাড়ি পরিধানে। হাতে মাত্র একগাছি করে সোনার চুড়ি।...শৈবালের চিনতে ভুল হয়নি। ঠিকই সে চিনতে পেরেছে শর্বরীকে।

কাস্টমস্ চেকিং-এর পর শর্বরী গৌতমের হাত ধরে বাইরে এসে বোধ হয় ট্যাক্সির জন্য এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, শৈবাল নিঃশব্দে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

ট্যাক্সিওয়ালা এগিয়ে এলো, ট্যাক্সি?

শর্বরী। একেবারে পাশে এসে ডাকল শৈবাল।

কে? চমকে ফিরে তাকাল শর্বরী।

একজোড়া ব্যাকুল সতৃষ্ণ নয়ন চেয়ে আছে নির্নিমেষে শর্বরীর মুখের দিকে। ডাক শুনে প্রথম দর্শনে চমকে উঠলেও পরক্ষণেই শৈবালকে চিনতে শর্বরীর দেরি হলো না। বুকের ভিতরটা যেন ধ্বক্ করে উঠলো। কয়েকটা দিশেহারা নির্বাক মুহূর্ত।

শৈবাল! শৈবাল!

এ সময় এখানে?

শর্বরী। আমাকে কি তুমি চিনতে পারছো না? আমি—আমি শৈবাল! তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি!

তথাপি শর্বরী নিস্তব্ধ। পাষাণী অহল্যার মত যেন স্থির-নিষ্কম্প।

শর্বরী! সত্যিই কি তুমি আমাকে চিনতে পারছো না?

শর্বরী শৈবালের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। কেবল ট্যাক্সিওয়ালার দিকে

ফিরে তাকে বললে, সামান উঠাও।

ট্যাক্সিচালক কুলীর সাহায্যে ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র ওঠাতে শুরু করে

বোবা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে শৈবাল শর্বরীর দিকে, মাত্র এক হাত ব্যবধান :

মালপত্র সব ট্যাক্সিতে ওঠানো হলে গৌতমের হাত ধরে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে বসে শর্বরী। একটি কথাও বলে না শৈবালের সঙ্গে। শৈবাল যে পাথরের মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো সেদিকে একটিবার ফিরে তাকালও না শর্বরী।

ট্যাক্সির মধ্যে ব্যাক সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিল শর্বরী।

পুত্রের প্রশ্নে সহসা চমকে ওঠে।

হঠাৎ গৌতম প্রশ্ন করে কুতূহলে তার মাকে, ঐ ভদ্রলোকটি তোমার সঙ্গে কথা বললেন কিন্তু তুমি কথা বললে না কেন মা?

শর্বরী ছেলের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ড্রাইভারকে বললে গাড়ি ছেড়ে দিতে।

ট্যাক্সিটা স্টার্ট দেবার আগে শৈবালের শুধু কানে এলো ড্রাইভারকে শর্বরী বললে, বিপ্রদাস নার্সিংহোম। দাদার।

ট্যাক্সিটা ছুটে চোখের সামনে বের হয়ে গেল।

বাতাসে খালি একঝলক পেট্রোল ও মবিলের গন্ধ।

বৈকালের দিকে গৌতম কোয়ার্টারের সামনে একটা এয়ারগান হাতে নার্সিং হোমের ছাতের আলিসার উপরে বসা একটা পাখিকে টিপ করছে একমনে, এমন সময় কে যেন তাকে ডাকল।

খোকা! শোন—

কে! ফিরে তাকিয়ে গৌতম দেখল, সাহেবী পোশাক পরিহিত সকাল বেলার জাহাজঘাটে দেখা সেই ভদ্রলোক তার অল্প দূরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন। বিরক্ত কণ্ঠে গৌতম বললে, দিলেন ত আমার এইমটা নষ্ট করে।

পাখিটা কি উড়ে গেল?

উড়ে যাবে না! একটু শব্দ পেলেই রবীন্‌রা উড়ে যায়। বলে গৌতম এগিয়ে যায়।

ভদ্রলোক আবার ডাকেন, খোকা শোন!

কেন 'খোকা খোকা' বলে ডাকছেন আমাকে!

তবে কি বলে ডাকবো?

কেন আমার নাম জানেন না!

না ত! কি নাম তোমার?

গৌতম রায়।

ওঃ। তা তোমার মা কোথায় গৌতম!

মা ভিতরে আছেন, যান।

গতকাল থেকে জাহাজেই যন্ত্রণাটা আবার বেড়েছে। প্যারোটিড টিউমার তার ম্যালিগনেন্‌সির শেষ কামড় বসিয়েছে। ধীরে ধীরে চাপ পড়ছে আশেপাশের রক্তনালীগুলো ও নার্ভের উপরে। ফেসিয়াল নার্ভের উপরেও তার আধিপত্য বিস্তার করছে। বুঝতে পারছে সে একটু একটু করে ডানদিকের মুখে প্যারালিসিসের চিহ্নগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে!

ক্লান্ত শর্বরী সোফার উপর গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শৈবালের কথাই ভাবছিল।

শৈবাল! শৈবাল বম্বেতে!

তার সন্ধান কি করে পেল? একেবারে জাহাজ-ঘাটে গিয়ে হাজির হয়েছিল!

মৃদু একটা পদশব্দ শুনে চোখ মেলে তাকাতেই শর্বরী সোজা হয়ে উঠে বসল, কে?

সামনেই দাঁড়িয়ে শৈবাল।

আবার আমি ফিরে এলাম শর্বরী!

কিন্তু কেন এলে!

কেন যে এলাম তোমাকে তা কেমন করে বুঝিয়ে বলব জানি না। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, নয় বৎসর আগে কথা কাটাকাটি হওয়ায় সেই যে তুমি আমার চেম্বার থেকে চলে এলে, তারপর থেকেই কত জায়গায় যে তোমার অনুসন্ধান করেছি—

কিছুই তো প্রয়োজন ছিল না তার।

হ্যাঁ, তোমার কাছে তার কোন প্রয়োজন যে ছিল না সে ত বুঝতেই পারছি, কিন্তু যাক সে কথা আজ, অন্যায় যদি কিছু করেই থাকি, এই নয় বৎসরেও কি তার প্রায়শ্চিত্ত হয়নি শর্বরী!

কিসের অন্যায় আর কিসেরই বা প্রায়শ্চিত্ত!

তাহলে সেদিনকার মত আজ আবার এই নয় বৎসর পরেও তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যানই করবে? ক্ষমা কি তুমি আমাকে আর কোন দিনই করতে পারবে না?

দেখো শৈবাল। যে ভাঙনকে আজ নয় বছর ধরে তুমি আর আমি টেনে বেড়িয়েছি, যতই চেষ্টা করি না কেন, তাকে আর জোড়া লাগাতে পারব না। তুমিও না, আমিও না। মিথ্যেই তুমি কষ্ট করে এতদূর এসেছো। বলে শর্বরী অন্যদিকে মুখ ফিরাল।

শৈবাল এরপর আর কোন সাড়া দিল না। তারপরই অখণ্ড স্তব্ধতা থমথম করতে থাকে সন্ধ্যার ক্রমঘনায়মান অন্ধকার সেই ঘরে।

আরো বোধ হয় মিনিট পনের কুড়ি পরে জানকী ঘরে এসে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিতেই শর্বরী চমকে উঠলো।

দেখলো শৈবাল ঘরে নেই। ইতিমধ্যে কখন যে শৈবাল চলে গিয়েছে তা সে টেরও পায়নি।

গৌতম কোথায় রে জানকী? ক্লান্তকণ্ঠে শর্বরী শুধায়।

এই ত এসে পড়তে বসল। ডেকে দেবো তাকে মাঈজী?

না থাক।

শৈবাল চলে গেল।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে করতে কেবলই মনে হতে লাগলো শর্বরীর, সে শৈবালকে তাড়িয়ে দিল।

শেষ পর্যন্ত শর্বরীকে ক্যানসার হাসপাতালেই সীট্ নিতে হলো।

বিশেষজ্ঞরা চিকিৎসা শুরু করলেন বটে, তবে কোন যে আর আশা নেই জীবনের, ডাক্তার শর্বরীর নিজেরও তা বুঝতে বাকী থাকে না। এবং মৃত্যু যত পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে, আজ বহুকাল পরে ততই তার মনে হয় কেবল বার বার শৈবালেরই কথা।

সেদিন। সেদিন সে শৈবালকে যে রূঢ় ভাষায় ফিরিয়ে দিয়েছে, আজ মৃত্যুশয্যায় সেই বেদনাটাই যেন তার বুকের মধ্যে অশ্রু ঝরায় সর্বক্ষণ।

আজ কেবলই মনে হয়, অন্ততঃ গৌতমকে শৈবালের হাতে না তুলে দিয়ে যেতে পারলে সে গৌতমের প্রতি অবিচারই করবে। তার মৃত্যুর পর অসহায় গৌতম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! কে তাকে আগলে রাখবে তার বিপদে-আপদে?

তাছাড়া পিতৃপরিচয় হতে গৌতমকে চিরদিনের মত বঞ্চিত করে রেখে যাবার কোন অধিকারই তার ত নেই!

অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত শর্বরী শৈবালকে একটা চিঠি দিল।

শৈবাল,

আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই তুমি আশ্চর্য হচ্ছো. সেদিন ফিরিয়ে দেবার পর কেন আজ আবার তোমাকে চিঠি দিচ্ছি। চিঠি দিচ্ছি এ পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নেবার আগে, তোমার প্রতি, তোমার ছেলে গৌতমের প্রতি আমার শেষ কর্তব্যটুকু পালন করে যাবো বলে।

তমি বোধ হয় জান না, প্যারোটিডের কারসিনোমায় আজ আমি ক্যানসার হাসপাতালে শেষ দিনটির প্রতীক্ষায় আছি।

তুমি ইচ্ছা করলে তোমার ছেলেকে এসে নিয়ে যেতে পারো। কেননা জীবিত থাকতে থাকতে যদি তাকে তোমার হাতে আমি তুলে দিয়ে না যাই ত, কোনদিনই সে তোমাকে স্বীকার করবে না। এ জীবনে আর তোমাদের পরস্পরের পরিচয়ের স্বীকৃতি মিলবে না।

তুমি যদি আসো ত আর বিলম্ব করো না।

—শর্বরী

চিঠিটা পেয়ে শৈবাল আর একটা দিনও দেরি করলো না। পরের দিনের প্লেনেই সে বোম্বাইয়ে চলে এলো।

বিকালের দিকে ক্যান্সার হাসপাতালের কেবিনে আবার দীর্ঘ এক মাস পরে দুজনের দেখা হলো।

শর্বরী চোখ বুজে শয্যায় পড়ে।

শৈবাল ডাকল, শর্বরী।

শৈবাল। এসেছো।

কিন্তু না। এ কখনোই হতে পারে না। আমি তোমাকে মরতে দেবো না। নয় বছর পরে এমনি করে মুহূর্তের জন্য ধরা দিয়েই আবার পালিয়ে যাবে —হতে দেবো না। আমি তা হতে দেবো না।

বোসো শৈবাল।

কিন্তু তুমি এ কি করলে শর্বরী। এ কি করলে! এমনি করে চিরজীবনের মত অপরাধী করে তুমি আমাকে রেখে যাবে!

না শৈবাল। অপরাধী কেন তোমাকে আমি করব? এই হয়তো তোমার আমার ভাগ্যের লেখা ছিল। নইলে এমনিই বা কেন হবে! কেন এমনি করে আমরা আমাদের পেয়েও পাবো না পরস্পর পরস্পরকে!

তোমাকে আমি এখানে আর রাখবো না। কালই তোমাকে আর গৌতমকে

কলকাতায় নিয়ে যাবো।

আবার কলকাতায় কেন? মিথ্যে আর টানাটানিতে কি হবে?

কলকাতায় নিয়ে গিয়ে যেমন করে হোক তোমাকে আমি সারিয়ে তুলবোই।

তুমি কি ভুলে যাচ্ছো শৈবাল। রোগ আমার কারসিনোমা—ক্যান্সার। আর এই অ্যাড্‌ভান্সড্‌ স্টেজে—আজও ত তোমাদের এমন কোন হাসপাতাল তৈরী হয়নি বা এমন কোন চিকিৎসা সৃষ্টি হয়নি যেখানে বা যার সাহায্যে এ রোগের অবার্থ পরিণতিকে তুমি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। তবে কেন শুধু শুধু—

জানকীর সঙ্গে এমন সময় গৌতম এসে কেবিনে ঢুকল, মা-মণি। মা-মণি। এই দেখো মা-মণি তোমার জন্য কত বড় গোলাপ এনেছি।

ছেলের হাত থেকে ফলগুলো নিতে নিতে শর্বরী বলে, বাঃ, চমৎকার ফুল ত।

কিন্তু করে তুমি বাসায় ফিরে যাবে মা-মণি। আমি একা একা আর থাকতে পারি না।

আর একা তোমাকে থাকতে হবে না গৌতম। তোমার মা-মণিকে এবারে আমরা নিয়ে যাবো। শৈবাল জবাব দিল।

আপনি। ফিরে তাকাল গৌতম শৈবালের মুখের দিকে।

মনে নেই। আমাকে তুমি একদিন তোমাদের বাড়িতে দেখেছিলে। খোকা বলে তোমায় ডেকেছিলাম বলে আমার উপরে রাগ করেছিলে?

হ্যাঁ। মনে পড়েছে। ইনি কে মা-মণি!

কী জবাব দেবে আজ শর্বরী তার ছেলের প্রশ্নের? কি বলবে?

শৈবাল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলে, চল আমরা একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসি।

যাবো মা-মণি।

যাও

শর্বরী বা ডাক্তারদের কোন নিষেধই শৈবাল শুনলো না।

শর্বরী আর গোতমকে নিয়ে সে পরের দিনের প্লেনেই ফিরে এলো কলকাতায়।

শৈবাল শর্বরীকে একেবারে তার গৃহে নিয়েই গিয়ে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু শর্বরী কিছুতেই সম্মত হলো না। অগত্যা তাদের হাসপাতালেই স্পেশাল একট

কেবিনে নিয়ে গিয়ে তুলল শর্বরীকে।

ডাঃ দত্ত, ডাঃ মুখার্জী বড় বড় সব শল্য বিশারদদের ডেকে নিয়ে এলো শৈবাল। থেরাপিউটিস্ট বিশেষজ্ঞ ডাঃ রায়ও এলেন। কিন্তু কেউই কোনো আশা দিতে পারল না।

শৈবালের বাবা ব্যারিস্টার ঘোষ তখন একটা কেসে দিন দশেকের জন্য পাটনা গিয়েছেন। বাড়ি খালি-- শৈবাল জান্‌কী ও গৌতমকে তাদের বাড়িতে নিয়েই গিয়ে তুলল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় শৈবালের সঙ্গে গৌতম আসে তার মাকে দেখতে---ঘণ্টা তিন-চার থাকে।

তিন-চারদিনের মধ্যেই শর্বরীর অবস্থা এত দ্রুত খারাপ হয়ে এলো যে, সকলেই বুঝতে পারছিল শর্বরীর জীবনের শেষ মুহূর্ত যে কোন সময় আসতে পারে

সেদিন দ্বিপ্রহর থেকেই শর্বরীর অবস্থা খুব খারাপ চলছে।

শৈবাল কেবিনেই আছে শর্বরীর পাশে বসে।

একসময় চোখ মেলে শর্বরী ডাকল, শৈবাল।

বল?

গৌতমকে ত তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো না।

ব্যস্ত হয়ো না তুমি। সে হবে।

হবে নয়। তাকে এখুনি আনাও। আর দেরি করো না।

শৈবাল তার ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিল গৌতমকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে।

শৈবাল। এসো —আমার আরো কাছে এসে বোসো।

শৈবাল আরো কাছে এসে বসল।

দেখো গৌতমকে তুমি ডাক্তারী পড়িও। সে যেন ডাক্তার হয়। যে চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হলো না, সেই চিকিৎসার আবিষ্কারের পথ সে যেন খুঁজে পায়।

তুমি নিশ্চিন্ত থাকো শর্বরী। গৌতমকে আমি তোমার প্রেরণা দিয়েই মানুষ করে তুলবো।

হ্যাঁ, তাই তুলো। রোগের এই জ্বালা থেকে যেন মানুষ নিষ্কৃতি পায়। চিকিৎসকের জীবন যে একটা ব্যবসা নয়, এটুকু যেন সে জানতে পারে। অর্থের মোহে সে যেন শতকরা নব্বই জন ডাক্তারের মত ডাক্তারী পড়তে না যায়। আজও যে সব জীবাণু মানুষের শরীরে রোগ ছড়িয়ে তাদের অকালে মৃত্যুমুখে

টেনে নিয়ে যাচ্ছে—তাদের যেন সে ধ্বংস করবার পথ খুঁজে পায়। এই রোগ ও রোগের দুঃস্বপ্নকে মুছে ফেলে যেন সে মঙ্গলের, শান্তির, সুন্দর স্বাস্থ্যের সন্ধান দিতে পারে মানুষকে। তাকে বোলো যেখানেই থাকি না কেন তার দিকেই আমি তাকিয়ে আছি।...

গৌতম এসে কেবিনে ঢুকল, মা-মণি।

গৌতম!

একপ্রকার ছুটে এসেই গৌতম মার একখানা হাত জড়িয়ে ধরল, মা-মণি! কেমন আছো মা-মণি।

ভাল, তারপর একটু থেমে সস্নেহে ডাকে, গৌতম।

কেন মা-মণি?

তুমি যখন ছোট্ট ছিলে তখন তুমি কি বলতে মনে আছে?

এই বয়সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি হয়েছে গৌতমের। মায়ের ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে একটু যেন লজ্জার হাসি হাসে গৌতম।

এবারে শর্বরী শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলে, ও ছোটবেলায় কি বলত জান?

কী? শৈবাল একবার লজ্জা-বিস্মিত গৌতমের মুখের দিকে তাকিয়ে শর্বরীর মুখের দিকে তাকায়।

ও বলত, ও যখন 'মা' হয়ে যাবে আমি তখন 'গৌতম' হয়ে যাবো, তাই না গৌতম! গৌতম আমার বড় ভাল ছেলে। না গৌতম?

গৌতম মায়ের বুকে মুখ লুকায়।

সস্নেহে শর্বরী ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে, হ্যাঁরে গৌতম, আমি চলে গেলে তুই ওর কাছে থাকতে পারবি ত?

কেন। কেন মা-মণি? তুমি চলে যাবে কেন? তোমাকে আমি যেতে দিলে ত!

এসো, আমার কাছে এসো গৌতম! শোন, কানে কানে একটা কথা বলি।

কী মা-মণি!

ছেলের কানে কানে কি একটা কথা বলতেই গৌতম চমকে প্রশ্ন করে, সত্যি! সত্যি মা-মণি!

হ্যাঁ। ওকেই জিজ্ঞাসা কর না!

সত্যি! সত্যি তুমি আমার বাবা! গৌতম এবারে শৈবালকেই প্রশ্নট করে চকিতে শৈবালের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ বাবা, আমিই তোমার বাবা! বলতে বলতে তৃষিত আকাঙ্ক্ষায় শৈবাল নিজ আত্মজকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

সর্বাঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল শৈবালের। চোখের কোল দুটো তার ঝাপসা হয়ে আসে।

হঠাৎ হাতের উপরে একটা চাপ অনুভব করে শৈবাল ফিরে তাকিয়ে দেখে শর্বরী তার হাত দিয়ে তার হাতটা চেপে ধরেছে।

শৈবাল এক হাতে পুত্রকে বুকের মধ্যে ধরে অন্য হাতটি দিয়ে শর্বরীর একখানি হাত মুঠো করে ধরে।

শৈবাল! ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকে শর্বরী।

শর্বরী।

শৈবাল গৌতমকে গৃহে পাঠিয়ে দিয়ে আবার কেবিনে ফিরে এসে দেখে শর্বরী চোখ বুজে আছে। ধীরে ধীরে শৈবাল এসে কেবিনের খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়াল।

এখান থেকে হাসপাতালের গেটটা স্পষ্ট দেখা যায়। গেটটা তেমনিই খোলা আছে। মানুষ আসছে যাচ্ছে। যাচ্ছে আসছে।

এই হাসপাতালের মেডিকেল ওয়ার্ডেই যখন দুজনের একত্রে ডিউটি পড়ে প্রথম ঘনিষ্ঠতা হয় ওদের। সে আজ কটা বছর আগেকারই বা কথা!

পরস্পর ওরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল। তার পর একদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আবার ফিরে এলো শর্বরী এই হাসপাতালেই।

কত শৈবাল, কত শর্বরীর ইতিহাসই না এর ধূলিকণায়-কণায় ছড়ানো আছে। কত পদচিহ্ন, কত আসা-যাওয়া।

কত জন্ম, কত মৃত্যুর কাহিনী এর প্রস্তরে প্রস্তরে, প্রতি ইষ্টকে ইষ্টকে স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছে বছরের পর বছর ধরে! কত রোগমুক্তি, কত ব্যর্থতা! কত আশা, কত নিরাশা, কত হাসি, কত কান্না।

সব! সব কিছুর ভিতর হতেই মানুষ হয়ত একদিন আবিষ্কার করবে সর্বরোগমুক্তির নিদান! সকল রোগযন্ত্রণা লাঘবের কোন অত্যাশ্চর্য মহা ঔষধ! সমুদ্রমন্থনশেষে সেই জীবনজয়ী অমৃত!

যা আজকের পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন, পা-স, এ সি টি এইচ, কর্টিসন আইসোটোপ-এর চাইতেও বিস্ময়কর—অব্যর্থ, অমোঘ—নিশ্চিত।

সোদনকার সেই ঔষধ চিকিৎসকদের হাতের ছুরি, ফরসেপ্স, সিরিঞ্জ বা কো॰ অজ্ঞাত আলো বা তেজরশ্মি যা হয়ত বিধাতার অমোঘ বিধানের মতই রোগ-জর্জরিত সুনিশ্চিত মৃত্যুপথ-যাত্রীকে দেবে পরম আশ্বাস! পরম শান্তি! পরম মুক্তির আনন্দ!

সেদিন এমন হাসপাতাল বা আরোগ্য-নিকেতন গড়ে উঠবে, যেখানে এলে কোন শৈবালকেই তাদের শর্বরীকে আজকের মত অসহায় বেদনায় হারাতে হবে না!

যে হাসপাতালের দরজা অমনি করে শুধু খোলাই থাকবে না—দ্বারপথে প্রবেশ করে মৃত্যু-বৈতরণী পার হয়ে পৌঁছাবে নতুন করে আবার কোন আশার জীবনতীর্থে। যেখানে থাকবে না কোন অসামঞ্জস্য, রেষারেষি, দলাদলি—একই কর্ম-প্রেরণায় পাশাপাশি হাজার হাজার চিকিৎসক বিধাতার মত কল্যাণ হস্তে করবে শুধু রোগীর চিকিৎসা। কোথায়? কত দূরে সে আরোগ্য নিকেতন—সে হাসপাতাল?

রাত আরো বাড়তে থাকে। নিস্তব্ধ হয়ে আসে আরো হাসপাতালটা।

যন্ত্রণায় শর্বরীর মুখের রেখাগুলো মাঝে মাঝে কুঞ্চিত হচ্ছে মাত্র, কোন যন্ত্রণার শব্দ নেই। শিয়রের কাছে বসে শৈবাল।

হঠাৎ একসময় চোখ মেলে তাকাল শর্বরী। চোখাচোখি হলো দুজনার।

বড্ড কষ্ট হচ্ছে শর্বরী, না? প্রশ্ন করে শৈবাল।

কোন জবাব দেয় না শর্বরী। কেবল দু চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দুটি ফোঁটা অশ্রু।

শৈবাল!

বল!

রাত কত হলো?

ভোর হতে আর বেশী দেরি নেই।

নেই!

না।

শেষ

॥ এই লেখকের অন্যান্য বই ॥

অস্তি ভাগীরথী তীরে		কালোভ্রমর (১ম-২য়)
তালপাতার পুঁথি		ঐ (৩য়-৪র্থ)
কৃষ্ণকলি নাম তার	পদাবলী কীর্তন	বিদ্রোহী ভারত
ময়ূরপঙ্খী নাও	অজ্ঞাতবাস	ইমন কল্যাণ
হীরা-চুনি-পান্না	রাতের গাড়ি	কালো হাত
আলোকলতা	রাতের রজনীগন্ধা	রুক্মিণীবাঈ
রাতের পাখী	অমৃত পাত্রখানি	ময়ূরমহল
রতিবিলাপ	অশান্ত ঘূর্ণি (১ম, ২য়, ৩য়)	রাণাবিল
বেলাভূমি	কলঙ্ককথা	মায়ামৃগ
নিশিপদ্ম	কোমল গান্ধার	ছিন্নপত্র
মধুমিতা	স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি	মুখোশ
বাদশা	সূর্যতপস্যা	অরণ্য
মল্লার	লালুভুলু	চক্র
বধূ	নিরালা প্রহর	উল্কা
ঝড়	রাত্রি-নিশীথে	নূপুর
শর্বরী	রূপ ও প্রসাধন	শ্রাবণী
স্বর্ণরেণু	কন্যা কেশবতী	কাচঘর
মৃত্যুবাণ	কনকপ্রদীপ	বিষকুম্ভ
কালনাগ	নটিনী	ঘুম নেই
বহ্নিশিখা	সূর্যমহল	নীলতারা
রাত্রিশেষ	ক্যামেলিয়া	অপারেশন
মঙ্গলসূত্র	হেমন্তিকা	কন্যাকুমারী
কিরীটী রায়	মন-ময়ূরী	পিয়ামুখচন্দা
উত্তরফাল্গুনী	পুষ্পধনু	বহুত মিনতি
হাড়ের পাশা	উর্বশী	গড়মান্দারণ
ধূসর গোধূলি	পিউ কাঁহা	কাগজের ফুল
সকলি গরল ভেল	রাজললতা	সেই মরুপ্রান্তে
কিরীটী অমনিবাস	অহল্যা ঘুম	কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী
বকুলগন্ধে বন্যা এলো	ইস্কাবনের টেক্কা	ভাগীরথী বহে চলে
রজনীশেষের শেষ তারা		পোড়ামাটি ভাঙাঘর
কিশোর সাহিত্য সমগ্র		মধুমতী থেকে ভাগীরথী